বাংলাদেশ রক্তের ঋণ

অ্যান্থনী মাসকারেণহাস

সত্য ঘটনা ঃ

কিভাবে মুজিব নিহত হয়েছিলেন

তাজউদ্দিন এবং অন্য ৩ নেতাকে জেলের ভেতরে কারা হত্যা করেছিল

জিয়াকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল

বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ

বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ

বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসি অব ব্লাড-এর ভাষান্তর

অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস

অনুবাদক : মোহাম্মদ শাহজাহান

হাক্কানী পাবলিশার্স

প্রকাশক
গোলাম মোস্তফা
হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা, বাড়ি নং-৭, সড়ক নং-৪
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৯৬৬১১৪১-৩
ফ্যাক্স : (৮৮ ০২) ৯৬৬২৮৪৪, ৮৬১০৭৭৪
E-mail : aahcl@bangla.net

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮
সপ্তম মুদ্রণ : মার্চ, ২০১২

প্রচ্ছদ
রইসুল ইসলাম

বর্ণবিন্যাস
কসমোপল কম্পিউটার
৮ হাটখোলা রোড (২য় তলা), ঢাকা

মুদ্রণে
ডট প্রিন্টার্স
১০, শুকলাল দাস লেন, কাগজীটোলা
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
পপুলার পাবলিশার্স
২০,প্যারীদাস রোড,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Bangladesh : Rakter Rin (A Bengali translation of Anhony Mascarenhas's A Legacy of Blood) by Md. Shajahan, Published by Golam Mustafa. Hakkani Publishers. Momtaz Plaza, Road No. 4, House No. 7, Dhanmondi, Dhaka-1205, First Edition : February 1988. 7th Prient : March 2012.

Price Tk. 200.00

ISBN : 984-433-066-1

সূচীপত্র

মুদ্রিত ছবি ও দলিল পত্রের তালিকা

ছবির নম্বর বর্ণনা

১। মেজরদের হাতে নিহত হবার পর শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঢাকাস্থ নিজ বাড়ীর সিঁড়ির গোড়ায় এলোপাতাড়িভাবে পড়ে আছেন। তখনও তার প্রিয় ধূমপানের পাইপটি শক্তভাবে ডান হাতে ধরে আছেন।

২। ঘাতকদের হাতে নিহত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

৩। মেজর ফারুক রহমান, বেঙ্গল ল্যান্সার্স-এর উপ-অধিনায়ক। তিনি মুজিব হত্যার কৌশলগত নক্শা তৈরী করেন।

৪। মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ অধিনায়ক/দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারী। তিনি মেজর ফারুকের ভায়রাভাই এবং মুজিব হত্যার সাথী বন্ধু।

৫। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো। এককালের আপোষহীন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। অখণ্ড পাকিস্তান খণ্ডিত হবার পর শেখ মুজিব হলেন বাংলাদেশের জাতির জনক আর ভুট্টো হলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।

৬। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষে শেখ মুজিব দেশে ফিরে এলে খন্দকার মোশতাক আহমেদ তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছেন। তিনি তাঁর গুপ্ত হত্যায় ইন্ধন যুগিয়েছিলেন এবং ১৯৭৫ সালে মাত্র ৮৩ দিনের জন্যে দেশের প্রেসিডেন্ট হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৭। অসাধারণ অনুগামীবৃন্দ ঃ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব, নৌবাহিনী প্রধান, অ্যাডমিরাল এম, এইচ, খান, এক স্বল্পস্থায়ী অভ্যুত্থানের নায়ক জেনারেল খালেদ মোশাররফকে পদভূষণ ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন। আর একদিন পর সিপাহী বিদ্রোহে খালেদ নিহত হলে ঐ দুই প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের আনুগত্য স্বীকার করেন।

৮। আন্ধা হাফিজ, চট্টগ্রামের এক অন্ধ দরবেশ। তিনিই শেখ মুজিবকে হত্যা করার জন্যে মেজর ফারুকের হাতে একটি কবচ তুলে দেন।

দলিল নম্বর

১। ক্ষতিপূরণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৫।

২। জেনারেল জিয়াউর রহমানর মরণোত্তর ক্ষতিপূরণ।

৩। মেজর জেনারেল এম. এ. মঞ্জুর-এর মরণোত্তর ক্ষতিপূরণ প্রতিবেদন।

৪। জেনারেল জিয়াউর রহমানের পদোন্নতি।

৫। জেনারেল জিয়াউর রহমানের ইস্তফা।

অনুবাদকের কথা

অ্যান্থনী ম্যাসকার্ণহাস সাংবাদিকতার জগতে আন্তর্জাতিকভাবে একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্বের নাম। তাঁর সৃষ্ট 'বাংলাদেশ ঃ লেগ্যাসি অব ব্লাড' এরই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি আজ ইহ-জগতে নেই ঠিকই, কিন্তু তাঁর এই সৃষ্টি তাঁকে ইতিহাস-পিপাসু মানুষের মনে বাঁচিয়ে রাখবে অনন্তকাল। মান্যবর প্রকাশকের সঙ্গে তাঁর ছিলো গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। জীবদ্দশায় তিনি বইটিকে বাংলায় ভাষান্তরিত দেখার জন্যে প্রকাশকের কাছে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তার সেই সাধ পূরণ না হতেই তিনি নিয়তির অমোঘ নির্দেশে পাড়ি জমালেন অনন্তের পথে। মরণের পরপারে বসেও তাঁর বিদেহী আত্মা আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে কিছুটা হলেও পরিতৃপ্তি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

বইটি বহু তথ্য সমৃদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। এই সকল তথ্যের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি যেন না ঘটে, ভাষান্তরের সময় সেদিকে সযত্নে নজর রাখা হয়েছে। অ্যান্থনী সাহেবের কথাগুলোই আমি আমার ভাষায় ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছি। তবে, অনুবাদ/ ভাষান্তর করতে গিয়ে বইটির কোন অধ্যায়েরই আসল রস এবং সুরের যেন একটুও পরিবর্তন না ঘটে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বইটিতে ব্যবহৃত অনেক ইংরেজী শব্দ, নাম ইত্যাদিকে আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ না করে, বইটির সহজবোধ্যতা এবং গতি ঠিক রাখার জন্যে সেগুলোর ইংরেজী উচ্চারণকেই বাংলায় লিখে দেয়া হয়েছে।

বইটির অনুবাদ করার সকল প্রয়াসে আমি ব্যক্তিগতভাবে জনাব এ. কে. এম. শফিকুল ইসলামের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি আমার এ কাজে সক্রিয় সহযোগিতা এবং প্রচুর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

আমার এ অনুবাদটি যদি পাঠকের একটুও তৃপ্তি দিতে পারে, আমি আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

মোহাম্মদ শাহজাহান

ভূমিকা

লেখকের কথা

এটি একটি সত্য কাহিনী। অনেক দিক থেকেই এটি স্থায়ী বিশ্বের মোহমুক্তির এক অনন্য পাঠ্যপুস্তক।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের পর পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হলো। ঐ সংগ্রামে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের দশ লক্ষাধিক বাঙ্গালী পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়। বিংশ শতাব্দীর বিরাট এক মানবসৃষ্ট দুর্যোগ হলেও, এরই মাধ্যমে জাতীয় স্বাধিকারের পথে মানবতার জন্যে এক সর্বোত্তম বিজয় অর্জিত হয়েছিল। চরম বিপর্যস্তকারী বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিজের ভাগ্যকে গড়ার প্রচেষ্টায় বাঙ্গালী জাতির সম্মিলিত আত্মদান বিশ্ববাসীর কল্পনাকে নাড়া দিতে পেরেছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাদের উপর বর্ষিত হলো অভূতপূর্ব সহানুভূতি আর সাহায্যের বন্যা। এ সাহায্য আর সহানুভূতিতে সক্রিয় রাজনৈতিক ও বাস্তব সমর্থন থেকে শুরু করে হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিগত বদান্যতা পর্যন্ত স্থান পেয়েছিল। ১৯৭১ সালে নিউইয়র্ক শহরে বাংলাদেশের সাহায্যার্থে পপ তারকাদের সঙ্গীতানুষ্ঠান, আফ্রিকার ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য ত্রাণ-তৎপরতার এক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালীদের অসংখ্য জীবন উৎসর্গের কোন তুলনা মেলে না। সুদীর্ঘ দিনের লালিত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এ উৎসর্গ সেদিন করতে হয়েছিল তাদেরকে। প্রতিটা বাঙ্গালীর হৃদয়ের প্রিয় অনুভূতিতে অনুরঞ্জিত সমতা, ন্যায় বিচার, সমাজিক ঐক্য আর সাংস্কৃতিক দীপ্তির উপর ভিত্তি করে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন-সাধ ছিল তাদের মনে। কিন্তু তা আর হলো না। সব উৎসর্গই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। স্বপ্ন পরিণত হলো দুঃস্বপ্নে। বাংলাদেশ আবদ্ধ হলো রক্তের ঋণে।

শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার মোশতাক আহমেদ আর জেনারেল জিয়াউর রহমান-এর মত বাংলাদেশের গোড়ার দিকের নেতৃবৃন্দ যে হারে তাদের জাতির প্রত্যাশায় কুঠারাঘাত করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির বিরল। তারা একের পর এক দেশটির ক্ষতিপূরণের চাইতে অধিকতর বিনাশের দিকে ঠেলে দিতে লাগলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের অতি প্রিয় একনাম, 'শেখ মুজিব' যে নামের যাদুস্পর্শে অনেক অসম্ভবও

সম্ভব হয়ে যেতো; সেই শেখ মুজিব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন বছরে মধ্যে সবচাইতে ঘৃণিত ব্যক্তি বলে পরিগণিত হলেন। তার ফলশ্রুতিতে একদিন সপরিবারে নিহত হলেন তিনি। কিন্তু প্রতিহিংসার আগুন যেন জ্বলতেই থাকল। মুজিব মৃত্যুর দশ বছর পরেও আত্মীয়-পরিজনদের মতানৈক্যের জন্যে তাদের গ্রামের বাড়ী টুঙ্গীপাড়ায় মুজিবের সমাধির উপর একটি সুযোগ্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে পারেননি বলে, তাঁর কন্যা হাসিনা, আমাকে জানান। 'আসলে ক্ষমতায় না থাকলে সকলেই এড়িয়ে চলে', কথাচ্ছলে হাসিনা বলছিলেন এবং মুজিব আর জেনারেল জিয়া উভয়ের সমাধি পাশে তা খোদাই করে রাখার যোগ্য। শেখ মুজিবের পরে ক্ষমতা দখলকারী মোশতাক আহমেদ-এর নাম বিশ্বাসঘাতকের প্রতিশব্দ হিসেবে প্রচলিত হয়ে যায়। তৎপরবর্তী জেনারেল জিয়া প্রথম দিক দিয়ে সেনাবাহিনীর ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করলেও পরে তার নিজরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, যার জন্যে পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি ২০টি বিদ্রোহ আর সামরিক অভ্যুত্থানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। একুশতম সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন।

এই বইটি বাংলাদেশের প্রথম দশ বছরের দুঃখজন কাহিনীগুলোকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। প্রধান নায়কদের সঙ্গে আমার নিবিড় ব্যক্তিগত জানাশুনা, নাটকীয় ঘটনা প্রবাহের সহিত জড়িতদের সঙ্গে পৃথকভাবে ১২০টিরও বেশী সাক্ষাৎকার এবং সরকারী ঐতিহাসিক নথিপত্র আর দলিল-দস্তাবেজ ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন সাপেক্ষে এর ভিত রচিত হয়েছে। মুদ্রিত কথোপকথনে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্যতা রক্ষিত হয়েছে। এভাবে মেজর ফারুক ও মেজর রশিদ শেখ মুজিবকে কেন এবং কিভাবে হত্যা করেছেন তার বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী বলেছেন; ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাজউদ্দিন এবং তার সঙ্গীতের হত্যা রহস্য পরিকল্পনাকারী ও নির্বাহকারীরা নিজেরাই বর্ণনা করেছেন। জেনারেল জিয়া সম্বন্ধে বলছেন, তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও সমালোচকগণ। তাঁর হত্যাকারীরা বলেছেন, কিভাবে তাকে হত্যা করা হয়। শহীদদের ঢেলে দেয়া রক্তের কাহিনীতে একটি শিক্ষাই বেরিয়ে আসছে যে, যখন প্রত্যাশার দীপশিখা নির্বাপিত হয়, বাধ্যবাধকতা পালনের দায়িত্ব যখন অস্বীকৃত হয়, জনগণের হারাবার যখন আর কিছুই বাকী না থাকে, তখন তারা তাদের ভুল সংশোধনের জন্যে আক্রমণের পন্থাই বেছে নেয়। শেকস্‌পিয়ার বলেছেন, "মানুষ যে অনিষ্টসাধন করে, তা তাদের মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে। আর সাধিত মঙ্গল প্রায়শঃই তাদের অস্থিমজ্জার সঙ্গেই কবরস্থ হয়ে যায়।" শেখ মুজিব আর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বেলায়ও তাই ঘটেছে। তাঁরা তাদের একগুয়ে কর্মকান্ড আর স্বার্থপর উচ্চাভিলাষের কারণে বাংলাদেশকে রক্তের ঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। এমতাবস্থায়, বইটি অনিবার্য কারণেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে ঐ নেতাদের কৃত ভুলের দিকে। আমি সেজন্যে কোন ক্ষমা প্রার্থনা করছি না। জনগণের তাদের নেতৃবৃন্দের ভুল সম্বন্ধে অবশ্যই জানা উচিত; আর আমরাও তাদের কৃত ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

নভেম্বর, ১৯৮৫ — এ্যান্থনী ম্যাসকার্ণহাস

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যার দায়ে সাধারণ (জেনারেল) কোর্ট মার্শাল-এ অভিযুক্ত হলে যাদের ফাঁসি দেয়া হয়, ঐ সকল অফিসারদের তালিকা :

১। বিএ-১৮৫ ব্রিগেডিয়ার মোহসিনউদ্দিন আহমেদ, কমান্ডার, ৬৯ পদাতিক ব্রিগেড।
২। বিএ-২০০ কর্ণেল মোহাম্মদ নোয়াজেশউদ্দিন , কমান্ডার, ৩০৫ পদাতিক ব্রিগেড।
৩। বিএ-২১২ কর্ণেল মোহাম্মদ আবদুর রশিদ, কমান্ডার, ৬৫ পদাতিক ব্রিগেড।
৪। বিএসএস-৬৭৫ লেঃ কর্নেল শাহ্ মোহাম্মদ ফজলে হোসেন, অধিনায়ক, ৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।
৫। বিএ-৩০১ লেঃ কর্ণেল এ, ওয়াই, এম মাহফুজুর রহমান সর্বাধিনায়কের সচিবালয় থেকে প্রেসিডেন্ট-এর একান্ত সচিব।
৬। বিএ-৪০০ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, সহকারী পরিচালক, অর্ডন্যান্স সার্ভিসেস ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম।
৭। বিএসএস-৭২২ মেজর গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, উপ-অধিনায়ক, ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।
৮। বিএসএস-৮৩৯ মেজর রওশন ইয়াজদানী ভূঁঞা ব্রিগেড মেজর, ৬৫ পদাতিক ডিভিশন।
৯। বিএ-১১৬৭ মেজর মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান অধিনায়ক, ১১২ সিগন্যাল কোঃ।
১০। বিএসএস-১০৭০ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার ৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।
১১। বিএসএস-৮৬২ মেজর. কাজী মুমিনুল হক উপ-অধিনায়ক, ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।
১২। বিএসএস-১৫২৬ ক্যাপ্টেন জামিল হক ২১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।
১৩। বিএসএস-১৭৪২ লেঃ মোহাম্মদ রফিকুল হাসান খান ৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

১

শেখ মুজিব আর মেজরবৃন্দ

দেশের জন্যে আমি যা করছি,
কেউ তা অনুধাবন করলো না।
—শেখ মুজিবুর রহমান

আমি ১৫ তারিখে তা ঘটাতে যাচ্ছি;
মুজিবকে আমি চিরতরে সরিয়ে দিচ্ছি।
—মেজর ফারুক রহমান

১৯৭৫ সালের ১২ই আগস্ট। রাত হয়ে এসেছে। মেজর ফারুক তখন বেঙ্গল ল্যান্সার্স-এর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক। ঢাকা গলফ ক্লাবে সেদিন এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান—মেজর ফারুক ও তার তরুণী সুন্দরী স্ত্রী ফরিদার তৃতীয় বিবাহ বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের (পার্টি) আয়োজন। আপ্যায়িত 'শ'খানেক অতিথির কারও এ অনুষ্ঠান ভুলে যাবার কথা নয়।

ফারুক আর ফরিদা একটি অতি জনপ্রিয় তরুণ দম্পতি। দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত, বিত্তশালী ও সভ্রান্ত পরিবারবর্গের সঙ্গে তাদের রয়েছে নিবিড় বন্ধন। ঐ সকল পরিবারের সদস্যরাই দখল করে আছেন সরকারী আমলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আর উচ্চ আদালতের বিচারকের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ। সুতরাং তাদের এ পার্টি ছিল সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের একটা অংশ বিশেষ। স্বর্গলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত ছিল আয়োজনের জৌলুস। কয়েক সপ্তাহ ধরে মৌসুমী বৃষ্টিতে সমস্ত শহরটি একেবারে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঐদিন চমৎকার সূর্যালোকের পর সুন্দর মনোরম মেঘমুক্ত রাতের আকাশ বিরাজ করছিল।

ফারুকের পূর্বপুরুষও সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তাই পার্টিটি ছিল সামরিক ঐতিহ্যে বলীয়ান। ডজন খানেক নিয়ন রঙ্গীন বাতি লনের উপর সবরতের গ্লাস হাতে দলে দলে জমাট বাধা অতিথিদের মাথার উপরে যেন এক চাঁদোয়ার সৃষ্টি করেছিল। সেনাবাহিনী সদর দফতরের ব্যান্ডে সঙ্গীতের মূর্ছনায় আকাশ-বাতাস

মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ক্লাব ঘরের ভেতরে প্রীতিভোজের টেবিলগুলোতে প্রভূতভাবে সাজানো ছিল—খাসির মাংসের বিরিয়ানী, কাবাব, মাংসের তরকারী/রিজালা আর পরিমাণমত ফলের সালাদ।

ফারুকের মামা জেনারেল স্টাফ প্রধান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আরও ছিলেন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মিলিটারী সেক্রেটারী, ব্রিগেডিয়ার মাসহুরুল হক। ফারুকের জোয়ানেরা দম্পতির জন্যে উপহার হিসেবে নিয়ে আসে বেডরুমের জন্যে পাটের তন্তুজাত এক চমৎকার গালিচা। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন নিয়ে আসে টেবিল ল্যাম্প, কারুকাজ করা পাত্র, হরেক রকম রঙ্গিন কাগজে মোড়া নগরীর অভিজাত বিপণীকেন্দ্রগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী। ব্রিগেডিয়ার হক এসেছিলেন শেষের দিকে। শেষে এলেও তিনি উপস্থিত সকলকে ছাড়িয়ে গেলেন। তিনি সঙ্গে এনেছিলেন 'গণভবন' (শেখ মুজিবের সরকারী বাসভবন)-এর প্রধান মালীর তৈরী মৌসুমী ফুলের এক বিরাট তোড়া। তিনি ফুলের তোড়াটি ফরিদাকে উপহার দিয়ে 'বাজিমাত' করে দেন।

তিনদিন পর উপস্থিত সকলেই হয়তো রাতের ঘটনা প্রবাহ থেকে কোন সূত্র খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পেলেন না কিছুই। এদিকে ব্রিগেডিয়ার হক নীরবে হয়তো তার বীরত্বের জন্যে তার ভাগ্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে থাকবেন। সেদিন ফরিদার জন্য আনীত ফুলের তোড়াটি হয়তো তার জীবন বাঁচিয়েছিল।

কিন্তু ঐ উৎসবের রাতে ফারুকের মনের গোপন চক্রান্তটি সম্বন্ধে কেউ একটু আন্দাজও করতে পারেননি। তার মনে পড়ছে, তিনি সেদিন অস্বাভাবিকভাবে প্রাণখোলা ছিলেন। 'আমি আমার স্বয়ংক্রিয় স্লাইড প্রজেক্টরটি মাত্র ৩,৫০০/- টাকায় বিক্রি করে ঐ পার্টিতে সমুদয় টাকা উড়িয়ে দিয়েছিলাম, তার জন্যে একটি ভয়ঙ্কর পরিণতি অপেক্ষা করছিল।'

তিনি যে কর্মে মনস্থির করে ফেলেছিলেন, তাতে হয় তিনি 'ফায়ারিং স্কোয়াডে' যাবেন, না হয় অমোচনীয়ভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর নাম অক্ষয় করে রাখবেন।

'আমি অনুষ্ঠানটা উপভোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ঐটিই আমার জীবনের শেষ অনুষ্ঠান হতে পারত।'

অতিথিদের সবাই চলে গেলে, পারিবারিক ছোট একটি দল লনে কফির সঙ্গে সামান্য নাস্তা নিয়ে আলাপচারিতার জন্যে মিলিত হলো। আপ্যায়নকারীরা অতিথি সেবায় এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, নিজেদের খাবারের সুযোগও হয়ে উঠেনি। দম্পতিটির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, ফারুকের মা-বাবা, চট্টলা থেকে আগত ফরিদার মা এবং ফরিদার বড় বোন জোবায়দা (ডাকনাম টিঙ্কু)। আরও ছিলেন, জোবায়দার স্বামী, মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ ঢাকায় অবস্থিত ২য় ফিল্ড আর্টিলারীর অধিনায়ক।

ফারুক তার ভায়রাভাইকে একদিকে সরিয়ে নিয়ে এলেন। তিনি রশিদকে জানালেন,

'আমি ১৫ তারিখেই তা ঘটাতে যাচ্ছি; শুক্রবার সকালেই আমি মুজিবকে জীবনের তরে সরিয়ে দিচ্ছি।'

রশিদ চমকে উঠলেন। সচকিতে রশিদ একবার চতুর্দিকে দেখে নিলেন, কেউ তো আবার ফারুকের গর্জন শুনে ফেলেনি! হঠাৎ যেন গোপন ষড়যন্ত্রের মাসগুলি উপসংহারের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হলো। কিন্তু রশিদ প্রস্তুত ছিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ থেকে ফিস ফিস করে তিনি বললেন, "তুমি কি পাগল হয়েছো?" এত তড়িঘড়িতে সব পন্ড হতে পারে। আমাদের তো সাথী অফিসার নেই। অস্ত্রশস্ত্রও নেই। আমরা কিভাবে তা সফল করব?

তেজোদ্দীপ্ত শানিত চোখে ফারুক অন্য মেজরটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটাই আমার সিদ্ধান্ত" রণ কৌশলের পরিকল্পনা আমার কাছে তৈরী করা আছে। আমি একা হয়ে গেলেও এগিয়ে যাব। তুমি ইচ্ছে করলে সরে দাঁড়াতে পার। তবে জেনে রেখো, 'আমি ব্যর্থ হলে শাসকচক্র তোমাকেও ফাঁসিতে লটকাবে।'

আবারও রশিদ অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মনে হচ্ছিল তিনি ফারুকের কথাগুলো হজম করছেন। অবশেষে হালকা-পাতলা, দীর্ঘদেহী আর্টিলারী অফিসার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফারুককে বললেন, "ঠিক আছে! যদি করতেই হয়, তবে কর। কিন্তু আমাদের এ নিয়ে আরও আলোচনা প্রয়োজন। আরও কিছু অফিসার আমাদের সঙ্গে রাখা উচিত।"

শহরের অন্য প্রান্তে শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবার-এর লোকজন নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ তাঁর নিজ বাড়ীতে নিশ্চিন্তে সময় কাটাচ্ছিলেন। ঐ বাড়ীটি তখনও দেশবাসীর চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। শেখ মুজিবের ছোট বোনের মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সকলে দু'দিন আগেই এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের অনেকেই তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন ও মহান নেতার আশীর্বাদ-এর জন্যে রয়ে গিয়েছিলেন। শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব শেষ হলে বেগম মুজিব ভদ্রভাবে তাদেরকে বিদায় দেন। অবশেষে কতিপয় বাছাই করা লোক শেখ মুজিবের সান্নিধ্যে থেকে যান। অন্যান্যের মধ্যে মুজিবের প্রিয় বোনের স্বামী, আবদুর রব সেরনিয়াবাত উপস্থিত ছিলেন। তিনি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। আর একজন ছিলেন সেরনিয়াবাত-এর ছেলে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি তিনদিন পরে অলৌকিকভাবে পারিবারিক ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

ঐ রাত্রের পারিবারিক আলাপচারিতা সরকারী বিষয়াদিকেও সমভাবে প্রভাবান্বিত করা বিচিত্র কিছুই ছিল না। শেখ মুজিব এ দু'টিকে কখনও আলাদা করে দেখেননি। তাঁর সন্দেহ আর চক্রান্তের জগতেও তার প্রিয়তম ও নিকটতম লোকজন অনায়াসে বিশ্বাসের স্থান দখল করে বসেছিল। তাঁর প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের যে কোনো বিষয়ে আলোচনার

সময়ে পরিবারের সকলকে তিনি ডেকে নিতেন। ঐ রাত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু।

আবুল হাসনাত সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বললেন, 'মামা সেদিন শরৎকালীন বন্যার সম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ঐ বন্যা ধানের প্রচন্ড ক্ষতিসাধন করে থাকে। তিনি আব্বাকে ভারত থেকে আমদানীতব্য ড্রেজারগুলো কালবিলম্ব না করে নদী খননের কাজে লাগাবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কৃষকের উপাখ্যান বর্ণনায় মুজিবের জুড়ি ছিল না। ক্ষণিকের মধ্যে, গ্রাম্য মোড়লের ন্যায়, এ দেশের মাটির সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে এমন এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে ঐ সময়ের সঙ্কটকে সাজিয়ে নিলেন। ততক্ষণে তাঁর তামাকের 'পাইপ' থেকে বেরিয়ে আসা সৌরভে সমস্ত ঘরটি মোহিত হয়ে উঠেছিল। শ্রোতাদের লক্ষ্য করে তিনি বলতে লাগলেন, "আমি তখন বেশ ছোট। ড্রেজার কোম্পানীতে চাকুরীরত বিলেতীদের সঙ্গে নদীর পাড়ে ফুটবল খেলতাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন এই উপমহাদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। কোম্পানী তখন এসব ড্রেজার বার্জ বানিয়ে বার্মায় সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্যে সরিয়ে নিয়ে গেল। আর কোনদিন এগুলো ফিরে এলো না। আমি যেখানে খেলতাম, সেখানে এখন আর কোন নদী নেই—কেবল চর আর চর। আর সে কারণেই আজ আমরা প্রতি বছরই বন্যার শিকার।"

এ সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি কি ভাবছেন কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করা হলে, পরিবারের সবাইকে উদ্দেশ্য করে মুজিব বললেন—'আমার তো বন্যা নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত অর্থ হাতে নেই, তবে ড্রেজারতো পাচ্ছি। তোমরা দেখবে আমি কিভাবে নদীগুলোকে আঁচড়িয়ে ঠিক করে দিই। আমার 'বাকশাল' ঠিকই তা করে দেবে।

তারপরই তাঁর মানসিকতায় এক পরিবর্তন দেখা গেল। ঔৎসুক্যে ভরা একটা মানুষ হঠাৎ যেন অসাড়তায় ছেয়ে গেলেন। হাসনাত তার মামার বলা শেষ শব্দগুলো স্মরণ রেখেছে—'দেশের জন্যে আমি যা করছি তা কেউ বুঝতে পারলো না।'

ঐ মন্তব্যটি শেখ মুজিবুর রহমানের অমিয়বাণী। তিনি ততক্ষণে তাঁর প্রাণপ্রিয় বাঙ্গালীদের সঙ্গে তাঁর সারাজনমের ভালবাসায় যবনিকাপাত ঘটার কাছাকাছি চলে এসেছেন। এটা ছিল, এক প্রচন্ড প্রেম-বিদ্বেষ সম্পর্ক যা কেবল একটি অতিমাত্রায় ভাবাতুর ও উদ্বেলিত জাতির পক্ষেই সম্ভব। তাঁরা তাকে 'বঙ্গবন্ধু' নামে আখ্যায়িত করে দেবতার ভাবমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দেবতুল্য মানব শেখ মুজিব তাঁর জাতির সঙ্গে তাদের আশা, আনন্দ, ক্ষোভ আর চক্রান্ত; তোষামোদ আর লোভ-লালসায় সমান প্রচণ্ডতায় একাত্ম হতেন। তিনি বলতেন, 'জনগণকে ভালবাসার মধ্যেই আমার শক্তি নিহিত।' আর আমার 'দুর্বলতা' হচ্ছে এই যে, 'আমি তাদেরকে অতিমাত্রায় ভালবাসি।'

সাড়ে তিন বছর আগে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই শেখ মুজিব তাদেরকে গুরুর

মত শাসন করে আসছিলেন। কিছু অসুবিধের মধ্যে হলেও তাঁকে হঠাৎ করেই দেশের সাধিত ক্ষতিপূরণের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। তিনি অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনায় কাজ করতে লাগলেন এবং মঙ্গল চিন্তায় সদিচ্ছায় ভরপুর তাঁর এক সচিবালয় রচিত হলো। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি 'সত্যের সঙ্গে রাজনীতিকে' গুলিয়ে ফেলেন। কেবল ড্রেজার দিয়ে যেমন করে তিনি বন্যা সমস্যার সমাধানের উচ্চাশা পোষণ করেছিলেন, তেমনি সব কিছুতেই তিনি সরলতার আশ্রয় নিতেন। অনিবার্য কারণেই যাদুর মত জনগণের ভালবাসা ম্লান হয়ে এলো আর তোষামোদের মধুর গুঞ্জন পরিণত হলো চরম তিক্ততায়।

এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এমনকি কট্টর সমালোচকবৃন্দ পর্যন্ত শেখ মুজিব কোনরকমে কার্যোদ্ধার করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। তাদের কাছে এমনকি অন্যান্য বাংলাদেশীদের কাছেও তাঁর অক্ষমতা ধারণাতীত বিষয় ছিল। কিন্তু ঐ আগস্টের রাতটিতে অসম্ভবটিই সম্ভবের ইতিহাস সৃষ্টি করলো। সাঁজোয়া বাহিনীর গাড়ী অগ্রসর হতে শুরু করল, মেজররা দৃপ্তপদে এগিয়ে চললো।

২

যাত্রায় ভুল

শেখ মুজিব আমাদেরকে ঘাস খেতে বললে, আমরা তাই খেতাম, খালি হাতে মাটি কাটতে বললে, আমরা তাই তাঁর জন্যে করতাম। কিন্তু চেয়ে দেখুন, তিনি কি আচরণটাই না করলেন আমাদের সঙ্গে।

—মেজর ফারুক রহমান

মধ্য লন্ডনের হোটেল ক্ল্যারিজেস-এর এক বিলাসবহুল স্যুট। তবুও পৃথিবীর একটি নবতম অথচ অষ্টম জনবহুল দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট-এর অভিষেক অনুষ্ঠান এ পরিবেশে বেমানান। তা সত্ত্বেও লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান, রেজাউল করিম, শীতের এ পাতাঝরা সকালে শেখ মুজিবুর রহমানকে চুপিচুপি তার প্রতি বিধাতার সুদৃষ্টির ইঙ্গিতটুকু জানিয়ে দিলেন।

১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারী। নয়টা গড়িয়ে গেছে। ঢাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানের ৯৩,০০০ সৈন্যের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঠিক ২৩ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে কেবল। জুলফিকার আলী ভুট্টো অল্প কয়েকদিন আগেই কেবল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। অপ্রত্যাশিতভাবেই সেদিন তিনি শেখ মুজিবকে তার তদানীন্তন সাংবিধান উপদেষ্টা, ডঃ কামাল হোসেনসহ পিআইএ'র একটি বোয়িং-এ করে গোপন ফ্লাইটে লন্ডন পাঠিয়ে দেন। তাকে লন্ডন কেন পাঠানো হয়েছিলো তার ইতিহাস তখন সঠিকভাবে কারও জানা নেই। কিন্তু সেদিন সকাল ৬-৩০ মিনিটে বিমানটি হিথ্রো বিমান বন্দর ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি শ্বাসরুদ্ধকর নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটলো। শেখ মুজিবের ভাগ্যের চরম অনিশ্চয়তাপূর্ণ নয়টি মাসের অবসান হলো।

দীর্ঘ ভ্রমণের পর শেখ মুজিবকে ক্লান্ত দেখালেও তিনি যে বেঁচে আছেন এবং গৌরবান্বিত বিজয়ীর ন্যায় বেঁচে আছেন তা তিনি নিজেই অনুভব করছিলেন, আর উৎফুল্ল জনতার ঢেউ তাকে ঘিরে ধরার জন্যে আনমনে অপেক্ষা করছিলো। তিনি ধীর ভঙ্গিতে এক রুম থেকে অন্য রুমে বিচরণ করতে লাগলেন, আর রেজাউল করিম তার পিছু পিছু

ছুটছিলেন। তিনি দৃশ্যমান ফুলের অকুণ্ঠ প্রশংসা করছিলেন। ক্ষণে ক্ষণে মোটা গদির সোফায় তিনি বসে পড়ছিলেন। মনে হচ্ছিল সোফায় বসা কত আরাম তা দেখে নিচ্ছেন। কিন্তু কাঁচের বড় জানালাগুলো তাকে সবচেয়ে বেশী আলোড়িত করেছিল। চঞ্চল শিশুটির ন্যায় তিনি ঐ বড় বড় জানালা দিয়ে মাথা বের করে বাইরের রাস্তায় চলমান যানবাহন অবলোকন করছিলেন। পাকিস্তানের কারাগারে ফাঁসির হাতছানিতে ভরপুর চরম দুর্বিষহ একাকিত্বের নয়টি মাস কাটিয়ে তিনি এই যেন প্রথম-বারের মত আত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তির সাথে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করছিলেন।

সানডে টাইমস-এর বিদেশ সংক্রান্ত উপ-সম্পাদক, নিকোলাস ক্যারোল আমাকে শেখ মুজিবের আগমন বার্তাটি শুনিয়েছিলেন। তিনি বিবিসি-র প্রচারিত খবর থেকে ঘটনাটি জানতে পেরেছিলেন। শেখ মুজিব আমার অনেক পুরনো বন্ধু। তাছাড়া, নিজ পেশার স্বার্থে আমি তার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হবার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলাম। তার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর করাচীস্থ্ বাসভবনে ১৯৫৬ সালে আমাদের প্রথম দেখা হয়। তিনি অবশ্য পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালের গ্রীষ্মকালে ওয়াশিংটন, আরিজোনা, সানফ্রানসিস্কো এবং লস এঞ্জেলস-এর হোটেলে প্রায় মাসখানেক একই রুমে থাকাকালীন আমদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। ঐটা ছিল যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণক্রমে একটি সরকারী ভ্রমণ। হলিউড-এর প্যারামাউন্ট স্টুডিওতে নেয়া আমাদের ছবিটি আমি এখনও রেখে দিয়েছি।

ঐ সময়টা ছিল বেশ আনন্দের। শেখ মুজিব তখন রাজনীতিতে বেশ নূতন। গ্রীষ্মকাল। তিনি নিজের দেশে থেকে অনেক দূরে। আমার মনে পড়ে, তাঁকে প্রায়ই এই বলে চটাতাম যে, 'আমি তাঁকে তার স্ত্রী চেয়ে বেশী জানি।' ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে গেলে, আমি আমার উদ্বিগ্ন বন্ধুটিকে বলেছিলাম, 'তুমি এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে পড় না কেন? তুমি তো তাস খেলেও এর চেয়ে ভাল জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করতে পার।' আসলেই তিনি তা পারতেন। আমি যদি ইন্দোনেশীয় ঐ তিনজন সাংবাদিককে খুঁজে বের করতে পারতাম, তাহলে আমার উক্তির প্রমাণ সহজ হতো।

আমরা গ্রান্ড ক্যানিয়ন থেকে ট্রেনে লস এঞ্জেলস যাচ্ছিলাম। সঙ্গে আমাদের ঐ তিনজন ইন্দোনেশীয় সাংবাদিক। রাতের ডিনার সেরে আমরা 'ফ্লাশ' খেলতে বসে পড়লাম। প্রথম দিকে হারজিতের তেমন একটা বালাই না থাকলেও পরক্ষণেই আমরা সাংঘাতিকভাবে হারতে শুরু করলাম। এ হারা থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্যে খেলা ঐদিনকার মত ওখানেই বন্ধ করতে মুজিবের নিকট আমি প্রস্তাব করলাম। তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে এটেন্‌ডেন্টকে একটি নূতন প্যাকেট আনতে বললেন। নূতন কার্ড এলে

তিনি কার্ডগুলোক মিলিয়ে নিয়ে বেটে দিলেন। খেলা জমে উঠল। অপ্রত্যাশিত গতিতে ভাগ্য ফিরে গেল। শত চেষ্টাতেও ইন্দোনেশীয়রা আর কুলাতে পারল না। পরদিন ভোরে আমরা যখন লস এঞ্জেলস পৌঁছাই, অবাক বিস্ময়ে দেখি, আমি আর মুজিব তিনশ' ছিয়াশি ডলার, একটি সোনার ক্যাপযুক্ত পার্কার-৫১ কলম আর একটি সর্পিল সোনার আংটি জিতে গেছি।

আমি মুজিবকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কিভাবে এটা সম্ভব করলেন। তার জবাব আজও আমার কানে বাজে। তিনি বলেছিলেন, "যখন তুমি কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে খেলবে, তখন তোমাকে ভদ্রলোকের মতই খেলতে হবে আর যখন তুমি কোন বদমাশের সঙ্গে খেলবে, তখন তোমাকেও এর চেয়ে বড় বদমাশ সাজতে হবে। তা না হলে তুমি হেরে যাবে।" তারপর হাসতে হাসতে তিনি আরও বললেন, "ভুলে যেয়ো না, আমার বেশ ভাল শিক্ষাগুরু রয়েছেন।" পরে যখন তিনি পত্র-পত্রিকায় 'হেডলাইন' হতে লাগলেন—ভাগ্যে যখন তার একাদশীর চাঁদ দেখা দিল, তখন তার ঐ কথাগুলো আমার মনে পড়ে গেল। আমার ভবিষ্যদ্বাণী করতে একটুও দ্বিধা হলো না যে, তিনি অমানিশার অন্ধকারেও তার সঠিক পথ বেছে নিতে পারবেন।

অনেকদিন পর লন্ডনে আবারও আমাদের দেখা হয়ে গেল। শেখ মুজিব তখন তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক খেলায় পা বাড়াতে যাচ্ছেন। তার সঙ্গে উঠা-বসায়, কথাবার্তায় একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবকিছু সম্বন্ধে এক অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে নূতন দেশটির উড্ডয়নের নেতৃত্ব নিতে যাচ্ছিলেন।

কেবল তাই নয়, তিনি অতি সংগোপনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে একটি পরীক্ষামূলক সমঝোতায় আসার মনোভাব পোষণ করছিলেন, যার বদৌলতে পাকিস্তান ও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের মধ্যে একটা যোগসূত্র সৃষ্টি করবে।

আমি এই দুঃখজনক পরিকল্পনার ইঙ্গিত পেয়ে মর্মাহত হলাম। কারণ তা ছিলো স্বাধীনচেতা বাংলাদেশীর মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ঐ ইঙ্গিতটি শেখ মুজিবের ভাষায়, "তোমার জন্যে একটা বিরাট খবর নিয়ে এসেছি। আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে একটা যোগসূত্র রাখতে চাচ্ছি। তবে এর বেশী কিছু তোমাকে এখনই বলতে পারছি না। অন্যান্যদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাক আলোচনা করে নিতে হবে। আর খোদার দোহাই, এ বিষয়ে তোমাকে বিস্তারিত বলার আগে কিছু লিখো না কিন্তু।"

স্পষ্টতঃই, রাওয়ালপিন্ডির শহরতলীতে অবস্থিত একটি সরকারী রেষ্ট হাউসে মুজিব-ভুট্টো দীর্ঘ গোপন আলোচনাটি তাঁকে লন্ডন পাঠানোর পূর্বক্ষণেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ আলোচনাতেই পাকিস্তানের সঙ্গে 'লিংক' রক্ষার ব্যাপারে রাজী করানো হয়। আর এভাবেই চতুর ভুট্টো শেখ মুজিবকে প্রলুব্ধ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নস্যাৎ করার

ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। সঠিক ফর্মূলাটা কি, শেখ মুজিব আমাকে বলেননি। তথাপি, আমি ভীত হয়ে পড়েছিলাম। আমি তাঁকে বললাম, "আপনি কি পাগল হয়েছেন? আপনি কি জানেন না, বাংলাদেশে কি ঘটে গেছে? এতকিছু ঘটে যাবার পর আপনি যদি পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের 'লিংক'-এর ব্যাপারে আর একটি শব্দ উচ্চারণ করেন, আপনি বঙ্গবন্ধু হউন আর যাই হউন, জনগণ আপনাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলবে।"

শেখ মুজিব আমার কথার জবাব দিতে পারলেন না। ভারতীয় হাই কমিশনার বি, কে, নেহেরুর উপস্থিতিতে আমদের আলাপচারিতা ঐ পর্যন্তই রয়ে গেল। তিনি তার সঙ্গে গোপন আলাপে বসতে চাইলেন। শেখ মুজিবের মগজ ধোলাই শুরু হয়ে গেলো।

পাকিস্তানে কারারুদ্ধ অবস্থায় শেখ মুজিবকে সম্পূর্ণভাবে বহির্বিশ্ব থেকে আলাদা করে রাখা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞের কিছুই তিনি জানতে পারেননি। কোন চিঠিপত্র বা খবরের কাগজ তার কাছে পৌছায়নি। কোনো রেডিও তাকে শুনতে দেয়া হয়নি। এমনকি তার জেলার-এর সঙ্গেও তার আলাপ নিষিদ্ধ ছিল। তিনি জানতে পারেননি, তার প্রিয় দেশটাকে কিভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে, কিভাবে বিশ লাখ লোক নিহত হয়েছে তাদের হাতে। পৃথিবী যেমন মুজিবের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা জানতে পারেনি, তেমনি তিনিও জানতে পারেননি তার সহধর্মিনী আর ছেলেমেয়েদের ভাগ্যের খবর।

পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বৃহত্তর দলের নেতা হিসেবে শেখ মুজিব তার প্রদেশের বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের জন্যে দাবী জানিয়েছিলেন। সেই সাহসিকতাপূর্ণ দাবীর জন্যেই তাকে জেলে যেতে হয়েছিল। তখনকার সেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীই বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বাস্তব রূপ লাভ করে।

কারামুক্তির পর শেখ মুজিব জাতীয় 'বীর' থেকে মানব দেবতায় পরিণত হন। কিন্তু নিহত হবার দিন পর্যন্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টে গিয়েছিল। সে যা হোক, পত্র-পত্রিকাগুলোর হেডলাইন গর্জে উঠল, 'মুজিব শব্দটি একটি যাদু'। মুজিব একটি অলৌকিক নাম।'

অন্ধকার থেকে আলোতে আসার অত্যন্ত কষ্টকর সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমণের প্রভাব তাঁর শরীরে পড়তে শুরু করেছিল। শেখ মুজিব আমাকে বললেন, "আমার কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন। আমি লন্ডনে কয়েকটা দিন আরাম করতে চাই। তারপর আমি আমার জনগণের মাঝে ফিরে যাবো। প্রত্যেকটা জেলায় ঘুরে ঘুরে আমার জনগণের সব কয়টা মুখ না দেখা পর্যন্ত আমি কোন কাজই করবো না।" এই ছিল শেখ মুজিবের পরিকল্পনা। এ কথাগুলো শেষ করতে না করতেই টেলিফোনগুলো বাজতে শুরু করল।

তখন সময় সকাল সাড়ে দশটা। কলকাতার বাংলাদেশ মিশন থেকে টেলিফোন এসেছে। টেলিফোনের অন্য প্রান্তের জবাবে মুজিব বলছিলেন, "চিন্তা করো না। আমি নিরাপদ। আমি সুস্থ শরীরেই বেঁচে আছি। ঢাকায় টেলিফোন করে সবাইকে জানিয়ে

দাও। কি ঘটেছে সবই বলবো। টিকে থাকবার জন্যেই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর কেউ তা আর পাল্টাতে পারবে না।" এছাড়া, ঐ স্যুটের বাকী তিনটি ফোনও একই সঙ্গে বেজে উঠলো। রেজাউল করিম এর একটা উঠিয়ে বললেন, 'স্যার, ঢাকা থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।" এভাবে ঢাকা ও কলকাতা থেকে আরও বেশ কিছু 'রিং' এলো। তারপর দিল্লী থেকে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এবং আর একটি ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট থেকে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ টেলিফোনে আলাপ করলেন। বেলা এগারোটা নাগাদ ক্ল্যারিজেস হোটেলের ১১২ নম্বর স্যুটটি বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানীতে পরিণত হলো।

এরই মধ্যে শেখ মুজিবের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, তিনি যদি শিগগির ঢাকায় না পৌছেন, তাহলে বাংলাদেশে নবগঠিত সরকার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যেতে পারে। এমনকি গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছিল না। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই-এর অবসান হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আওয়ামী লীগের ভেতরে অভ্যন্তীণ কোন্দল আর ক্ষমতার লড়াই বিপদজনক রূপ ধারণ করেছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবমূর্তি স্তিমিত হয়ে, বীতশ্রদ্ধার লক্ষণও দেখা দিতে শুরু করেছিল। ঐ মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত আওয়াী লীগ সরকারকে 'নামকাওয়াস্তে সরকার' ছাড়া আর কিছুই আখ্যা দেয়া যায় না। এই সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন না উঠলেও নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। মুজিবনগর সরকার এদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর গণহত্যা অভিযানের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাগরণ আর প্রতিরোধ গড়ে তোলার ছত্রছায়া হিসেবে কাজ করেছিল। আসলে মুজিবনগর বলে এমন কোন জায়গা ছিল না। বিদেশে গঠিত (ভারতে) বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার তাই প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত।

মুজিবনগর সরকারের ভূমিকার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে। সেদিন ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের সময়ে এ সরকারের কোন স্থানই ছিল না। তথাপি, তার কিছুদিন পরই আওয়ামী লীগারদেরকে ঢাকায় নূতন দেশের সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। এর বৈধতার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদই ওঠেনি সেদিন। কলকাতা থেকে মন্ত্রীবর্গ ঢাকায় এলে তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত অন্যান্য রাজনৈতিক্ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ন্যাপের প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ এবং কমিউনিস্ট পার্টির মনি সিংও উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ এক পর্যায়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কিন্তু নবগঠিত সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেন। সম্ভবতঃ এটাই ছিল ঐ সরকারের প্রথম এবং একমাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত।

আওয়ামী লীগে অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল আর মন্ত্রীদের মধ্যে বহিঃশক্তির প্রভাব দারুণভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অবশ্য 'সিংহাসনটি' তখনও খালি রাখা হয়েছিল।

এই সকল অভ্যন্তরীণ মতভেদ আর ক্ষমতার লড়াই-এর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি সামলানো সরকারের মুখ্য কর্মে পরিণত হলো। অথচ অন্যদিকে দেশের অতি জরুরী এবং পর্বতপ্রমাণ সমস্যার দিকে নজরই দেয়া হচ্ছিল না। পাকিস্তানী হায়েনাদের হিংস্র থাবার চরম আক্রোশে দেশটি একটি বধ্যভূমি আর ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছিল। দোকানপাটে ছিল না খাদ্যদ্রব্য কিংবা জীবন রক্ষাকারী কোন ওষুধ। দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাট আর চা শিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী দেশের এক কোটি শরণার্থী ফিরে আসিতে শুরু করল। তাছাড়া, দেশের ভেতরে প্রায় দু'কোটি লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। তাদের সকলের আশ্রয় আর খাদ্য-বস্ত্রের সংস্থান ঠিক ঐ মুহূর্তেই অতি জরুরী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যানবাহন, রাস্তাঘাট, ফেরী, সেতু ইত্যাদি চরমভাবে ধ্বংস করে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে বিকল ও স্থবির করে দেয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিক রিলিফ সামগ্রী জায়গামত পৌছানো এক অলৌকিক ব্যাপারে পরিণত হলো। ঐ ধ্বংসস্তূপের মাঝে জনগণকে বাঁচানো আর একটা আসন্ন দুর্ভিক্ষকে ঠেকানোর জন্যে বাংলাদেশের ২৫ লক্ষ টন খাদ্য সামগ্রী একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়লো। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এসব আসতে শুরু করল। দেশের ৬০,০০০ গ্রামে তা পৌছানো একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এদিকে ক্ষমতার লড়াই-এ খন্দকার মোশতাক আহমেদ গদিচ্যুত। মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় এসে দেখেন তারই জুনিয়র সহকর্মী, আবদুস সামাদ আজাদ তার গদি দখল করে বসে আছেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদই মোশতাক আহমেদকে সরিয়েছিলেন। কারণ, মোশতাক পাকিস্তানের ভাঙ্গন এড়ানোর জন্যে আমেরিকার সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌছানো। চীনদেশে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ঐতিহাসিক সফরের আয়োজন করছিলেন ডঃ হেনরী কিসিঞ্জার। পাকিস্তানকে রাজনৈতিক সমাধানে পৌছুতে সহায়তা করে, ঐ সফরের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যে পাকিস্তানকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমেরিকা খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হবার সলাপরামর্শ শুরু করেছিলেন। মোশতাকের এ রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত তার সহকর্মীরা ভুলতে পারেনি। ঐ কর্মের ফলশ্রুতিতেই তার গদিচ্যুতি ঘটেছিল।

খন্দকার মোশতাক এ অপমান কষ্টে হলেও হজম করে নিলেন। কিন্তু তা তিনি ভুলেননি। পরে যখন সুযোগ এলো, তিনি তার অপমানকারীদের উপর চরম প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে গেলো। সাড়ে তিন লাখেরও

বেশী আগ্নেয়াস্ত্র সাধারণ মানুষের হাতে রয়ে গেলো। বিভিন্ন ধরনের অভাব-অনটনে মানুষ হয়ে উঠলো অতিমাত্রায় বেপরোয়া। সর্বোপরি, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত 'গেরিলা বাহিনী' সরকারের অবাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাদের নেতৃত্বে ছিল শেখ মনি, নুরে আলম সিদ্দিকী, তোফায়েল আহমেদ, শাহজাহান সিরাজের মত ছাত্রনেতৃবৃন্দ। শেষ মুজিব ছাড়া অন্য কারও নির্দেশ শুনতে তারা অস্বীকৃতি জানালো। সুতরাং অবিলম্বে শেখ মুজিবের ঢাকায় প্রত্যাবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়লো।

শেখ মুজিবের ঢাকা ফেরার পালা। নয়া দিল্লীতে স্বল্পক্ষণের যাত্রাবিরতি করবেন বলে মুজিব মনস্থ করলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের জন্যে ভারতকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাই এ যাত্রাবিরতির উদ্দেশ্য। ২১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনার সূচনা করা হলো। নয়া দিল্লীতে আয়োজিত সেদিনের সেই লাল গালিচা সম্বর্ধনা উপস্থিত সকলকেই অভিভূত করেছিল। সেদিন ১০ই জানুয়ারী, ১৯৭২ সাল। ভোরবেলা। পালাম বিমান বন্দরে শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিবাদন জ্ঞাপনের জন্যে উপস্থিত হয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ডঃ ভি. ভি. গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিন প্রধান, কেবিনেট মন্ত্রীবর্গ আর কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ। সর্বোপরি, সর্বভারতীয় আপামর জনসাধারণের কণ্ঠস্বর, 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র মনমাতানো ধারা বিবরণী।

ঐ সকালে সমগ্র ভারতের প্রাণের স্পন্দন যেন নয়া দিল্লীতে অনুভূত হচ্ছিল। প্রাণঢালা সম্বর্ধনার কোন দিকই সেদিন বাদ পড়েনি। শেষ মুজিব অপ্রত্যাশিত এ সম্বর্ধনায় বিমোহিত হয়ে পড়েন।

এর কয়েক ঘণ্টা পরেই মুজিব ঢাকার মাটিতে পা রাখেন। ঢাকায় প্রদত্ত সম্বর্ধনায় তিনি আরও অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। সব মিলিয়ে তাকে মানব দেবতায় পরিণত করার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো।

লন্ডন থেকে ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিব আমাকে বলেছিলেন, "নিজ দেশে এবং আমার জনগণের মাঝে ফিরে আসতে পেরে আমার মন আনন্দে নেচে উঠেছিল। কিন্তু তারপরই আমাকে হতে হলো ইতিহাসের ভয়াবহতম মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মুখোমুখি। ওরা আমার তিরিশ লাখ লোক হত্যা করেছে। বর্বরেরা আমাদের মা-বোনদের ধর্ষণ করেছে। আর বাচ্চা ছেলেমেয়েদেরকে কতল করেছে। দেশের ঘব-বাড়ীর তিরিশ শতাংশেরও বেশী ধ্বংস করে দিয়েছে। বাংলাদেশকে ওরা নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা প্রকট। আমাদের সহায়তার প্রয়োজন।"

দেশের কারেন্সী, খাদ্য, শিল্প, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, প্রশাসন ইত্যাদি নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না। কিন্তু তা খুব স্বল্প সময়ের জন্যে। দ্রুতগতিতে আবার তাঁর মতিগতিতে

পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো। হাওয়া থেকে পাওয়া শক্তিতে তিনি যেন আবার আস্থা ফিরে পেলেন। তিনি আবারও মানব দেবতায় পরিণত হলেন।

শেখ মুজিবের ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের ফলে দেশের ভেতরে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দূরীভূত হলো এবং দেশের ভেতরে সরকারে কর্তৃত্বের যে প্রকট অভাব দেখা দিয়েছিল তাও এতক্ষণে স্তিমিত হয়ে গেল। কিন্তু এতে করে সশস্ত্র দলের অপারেশন, মন্ত্রী পরিষদের ভেতরে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সমূলে উৎপাটিত হলো না। মুজিবের উপস্থিতি কেবলই ঐ সবের উপরে একটি ক্ষণস্থায়ী আবরণের সৃষ্টি করেছিল।

শুরু হলো শেখ মুজিবের রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ। তিনি জাতির পিতা বা দেশের প্রেসিডেন্ট না হয়ে তিনি যেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট-এ পরিণত হলেন। তিনি তার রাজনৈতিক সমর্থকদের বিভিন্ন চক্রান্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। চক্রান্তকারীরা তার হাতে সর্বময় ক্ষমতা রাখার প্ররোচনা যোগাল। তাই তিনি দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট না হয়ে প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদটি বাছাই করে নিলেন।

আগেই বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট-এর পদটি শেখ মুজিবের জন্যে খালি রাখা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, লন্ডনে পৌঁছুলে তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসেবেই সম্বর্ধনা জানানো হয়। এবং সকলেরই এই ধারণা ছিল যে, তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবেই দেশের কার্যভার পরিচালনা করে যাবেন। কিন্তু ওয়েষ্টমিন্সটার স্টাইলের সরকার প্রধান শেখ মুজিব হলেন, দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীর উপর। তাহলে তাজউদ্দিন আহমেদ সে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন। মুজিবের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই সংকীর্ণ। ক্ষমতার ব্যাপারে তিনি সব সময়ই একমুখো ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং ক্ষমতার জন্যে প্রয়োজনবোধে তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন—এ আর বিচিত্র কি। সাংবিধানিক পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের সর্বময় ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে অর্পিত হলে, তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন। আর যদি পদ্ধতি অনুযায়ী সর্বময় ক্ষমতা 'প্রেসিডেন্ট'-এর হাতে অর্পিত হয়, তাহলে তিনি 'প্রেসিডেন্ট' পদটিই বেছে নেবেন। তাঁর পরিবারের লোকজন আর তাঁর নির্বোধ, চাটুকার উপদেষ্টাগণ তাকে দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণের জন্যেই প্ররোচিত করলেন। কারণ, যত বেশী ক্ষমতা তাঁর হাতে থাকবে, তত বেশী অনুগ্রহ আর সম্পদের ফোয়ারা বইতে থাকবে চাটুকারদের মাথার উপরে।

প্রশাসন পরিচালনার যথেষ্ট দক্ষতা তাজউদ্দিন আহমেদ-এর ছিলো। কিন্তু তার সিনিয়র সহকর্মীরা কখনই তা পুরোপুরি মেনে নেননি। এমনকি মুজিবনগর সরকারের দিনগুলোতেও তাজউদ্দিনকে ভারতীয় সহায়তায় উচ্চপদে আসীন করা হয়েছে বলে তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাজউদ্দিনের দক্ষতা থাকলেও তাঁরা তাকে 'ভূইফোঁড়' লোক বলে মনে করতেন। 'ভারতপন্থী' বলে একটি দুর্নাম তার নামের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে তার অবস্থানকে অসুন্দর করে তোলা হলো।

শেখ মুজিব ঠিকই তাজউদ্দিনকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজেই প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র প্রধানের পদটি যেন তাঁর জন্যে পথের কাঁটা না হয়, সে ব্যাপারেও তিনি নিশ্চিত হয়ে নিলেন। আর সে কারণে তিনি অতিশয় ভদ্র এবং চরমভাবে অনুগত একটি অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বাছাই করলেন। তিনি হলেন, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। জনাব চৌধুরী মুজিবনগর সরকারের আন্তর্জাতিক মুখপাত্র হিসেবে পৃথিবী জোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। প্রেসিডেন্ট চৌধুরী ছিলেন অতিমাত্রায় অনুগত। এবং তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে কোন রকম ভুল বুঝাবুঝি যাতে না হতে পারে, সে জন্যে তিনি তাঁর কোটের উপর একটা বড় মুজিব ব্যাজ ধারণ করতেন।

মুজিব শাসনের গোড়ার দিকে গণভবনের দৃশ্য ছিল মোগল শাসনের বিংশ শতাব্দীর নমুনা বিশেষ। সচিবালয়ে শেখ মুজিবের একটি অফিস থাকলেও তিনি খুব কম সময় সেখানে কাটাতেন। তাঁর সরকারি বাসভবন ছিল 'গণভবন'। ঐ গণভবনকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অফিসের মত ব্যবহার করতেন। তাঁর রুচি মাফিক ওখানে বিশ্রামের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ওখানে দলীয় লোকজন ও আবেদন-নিবেদনকারীরা দলে দলে ভিড় জমাতো। কেউ কেউ তাদের বঙ্গবন্ধুকে ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিতো, পা ধরে সালাম করতো, এমনকি কেউ বা তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে উচ্চস্বরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো। শেখ মুজিবও তাদের আবেগ উচ্ছ্বাস-এর সঙ্গে সজলচোখে একাত্ম হয়ে যেতেন। এরই ফাঁকে তিনি তাঁর কোন মন্ত্রীর সঙ্গে চুপিসারে আলাপ করে নিতেন। এমনকি রাষ্ট্রীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারী আমলাদেরকে নির্দেশও প্রদান করতেন। উপরন্তু, পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ রাষ্ট্রের মুকুটহীন রাজাকে দেখতে আসতো এমন সব রিপোর্টার কিংবা ভিআইপিদেরকে সেখানেই তিনি সাক্ষাৎ দান করতেন।

শেখ মুজিবের কাছে যারা আবেদন-নিবেদন কিংবা সাহায্যের প্রত্যাশা নিয়ে আসতো, তাদের কাউকে তিনি বিমুখ করতেন না। তাদের প্রত্যেককেই তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতেন, ঠিক আছে যা, আমি ব্যাপারটি দেখছি। কিন্তু ঐ দেখা, তাঁর খুব কমই হয়ে উঠতো। পরে, মুসা নামে আমার এক সাংবাদিক বন্ধু শেখ মুজিবের হত্যা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, তিনি সবকিছুই করে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করতেন এবং সব প্রতিজ্ঞাই বেমালুম ভঙ্গ করতেন।

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর এ দ্বিমুখী ভূমিকা পুরো ব্যবস্থাপনার মধ্যে অশুভ ফল দিতে শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে তাঁর সরকারের ভেতরে কঠোর শৃঙ্খলা/নিয়মতান্ত্রিকতা ঢুকিয়ে দেয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি তা করতে পারলেন না। তিনি বঙ্গবন্ধু। স্বভাবগত তিনি অত্যন্ত উদার আর দয়ালু। একই সঙ্গে তিনি বঙ্গবন্ধু এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী। দুই বিপরীত মেরুকে একত্রে মিলাতে গিয়েই অনিবার্যভাবে বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হতে লাগলেন।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেশের অবস্থা কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছিল তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ দিচ্ছি। ঈদুল আযহার অল্প কিছুদিন বাকী। আদমজী জুট মিলের কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা সুরাহাকল্পে প্রত্যেকের এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা তক্ষণই পরিশোধ করার জন্যে বঙ্গবন্ধু নির্দেশ প্রদান করলেন। পৃথিবীর বৃহত্তম জুটমিলের উপবাসী শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে গেছে।

পরদিন সকাল সাড়ে নয়টায় আমি মিলে পৌঁছলাম। কমপক্ষে তিন হাজার লোক গেটের বাইরে লাইন্ ধরে উৎফুল্লচিত্তে অপেক্ষা করছে। মিলের ভেতরে পে-মাস্টার সুসংগঠিত। কম্পাউন্ডে ডজনখানেক টেবিল সাজানো হয়েছে। প্রত্যেক টেবিলে একজন করে কেরানী, তার সামনে টালিবই, টিনের তৈরী টাকার বাক্স, কলম ও কালির দোয়াত। নাই কেবল টাকা। পে-মাস্টার বললেন, ঢাকা থেকে টাকা আসছে। আমরা টাকার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

তারা অপেক্ষা করছে তা করছেই। বেলা দুটো বেজে গেলো। টাকার কোন পাত্তা নেই। অপেক্ষারত কর্মচারীরা এক পর্যায়ে রোষে ফেটে পড়লো। দেয়ালের ওপাশ থেকে ইট-পাটকেল এসে পড়তে শুরু করলো। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত টাকা তারা পেতে চায়। পে-মাস্টার উপায়ান্তর না পেয়ে জেলা প্রশাসনকে খবর পাঠালেন। জেলা প্রশাসক পুলিশ পাহারাকে জোরদার করার জন্যে সেনাবাহিনীর একটি দলকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাবার আগেই তাদের একজন বঙ্গবন্ধুর কাছে খবর পাঠিয়ে দিলো। দু'ঘন্টা পরে আমরা গণভবনে পৌঁছে গেলাম। একজন তরুণ অফিসার তখন মুজিবকে আদমজী মিলে উদ্ভূত পরিস্থিতির বর্ণনা দিচ্ছে। শুনে মুজিব ক্ষেপে গেলেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তাঁর নির্দেশ পালিত হয়নি।

মুজিব জিজ্ঞেস করলেন, 'তাদের টাকা দেয়া হয়নি কেন?' আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম আজ সকালের মধ্যে তাদের টাকা মিটিয়ে দেয়ার জন্যে। এর জন্যে দায়ী কে?

শেখ মুজিব রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। ব্যক্তিগত সহকারী এবং সহকারী সচিববৃন্দ জনতার ভিড়ে এদিক-ওদিক কাউকে যেন খুঁজে ফিরছিলেন। অবশেষে খুঁজে বের করে অর্থমন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্মকর্তাকে মুজিবের সামনে নিয়ে আসা হলো। ঐ কর্মকর্তা জানালো যে, নতুন নিয়ম অনুযায়ী কোন মিল এক লক্ষ টাকার বেশী ড্র করতে পারবে না। সে বঙ্গবন্ধুর, বিশেষ অনুমোদন এবং স্বাক্ষরের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতে আসা অসংখ্য দর্শনার্থী, দলীয়কর্মী, পুরানো বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ে তাঁর এমনিতেই তখন দম বন্ধ হবার উপক্রম। মন্ত্রীবর্গ, উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারী এবং তাঁর দাফতরিক অভিভাবকবৃন্দ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সামনে এই ব্যাপারটিকে নিয়ে তাকে মাথা না ঘামাতে অনুরোধ জানালেন। মুজিব অবশেষে তাঁর এক সিনিয়র আওয়ামী

লীগারকে বললেন, 'তুমি এক্ষুণি নারায়ণগঞ্জে চলে যাও।' এবং কর্মচারীদের বল যে, ইন্‌শাল্লাহ, আগামীকাল তাদের পাওনা অবশ্যই মিটিয়ে দেয়া হবে।

মিলের ঐ তরুণ অফিসারটিকে বিলম্বিত লাঞ্চ-এ ডাকা হলে সে দুঃখ করে বলেছিল, 'বঙ্গবন্ধু বৃষ্টি হবার জন্যে নির্দেশ দিতে জানেন। কিন্তু বৃষ্টি কেন হয় না, তা তিনি বুঝতে চান না। খোদা আমাদের সহায় হোন।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, ফরিদপুর জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পরিবারের ছয় ভাই-বোনের একজন। পরিবারটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান স্থানীয় জেলা কোর্টে চাকুরী করতেন। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি হলে, বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে লেখাপড়া বাধাগ্রস্ত হয় এবং তা তাঁর চোখের দৃষ্টির স্থায়ীভাবে ক্ষতিসাধন করে। তিনি ২২ বছর বয়সে হাইস্কুলের পড়া শেষ করেন।

অল্প বয়সেই এমন সব গুণাবলী তাঁর চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়েছিল, যাতে করে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে তিনি যে একদিন কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। তাঁর একটা গুণ ছিল অতিমাত্রায় 'সমাজ সচেতনতা' আর ছিল রাজনীতির প্রতি অদম্য আগ্রহ। মাত্র দশ বছর বয়সে নিজের ঘর থেকে ক্ষেত মজুরদের চাল বিতরণ করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। জিজ্ঞেস করলে মুজিব তাঁর পিতাকে বললেন, তাদের তো খাবার কিছুই নেই। আমাদের এগুলোর সবই আছে। ১৯ বছর পরে মুজিব যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে মিনিয়্যাল স্টাফদের সমর্থন করতে গিয়ে আড়াই বছর কারাবরণ করেন। কিন্তু এর আগে, তার বয়স যখন ১৭, বৃটিশ বিরোধী এক বিক্ষোভ মিছিলের পুরোভাগ থেকে তাকে ধরে নিয়ে জেলে ঢুকানো হয়। জেল হয়েছিল ছয় দিনের। এই জেলের অভিজ্ঞতা তাকে রাজনীতির প্রতি আরও বেশী আকৃষ্ট করে তোলে।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের 'জাতির জনক' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তব্য শুনতে উপস্থিত হন পল্টন ময়দানে। বক্তৃতায় জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। তারা এ প্রতিবাদের ঝড় রাজপথে নিয়ে আসে। দেখতে দেখতে তা সারা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে।ঐ কারণে দলীয় নেতৃবৃন্দের একজন হিসেবে শেখ মুজিবকে জেলে ঢুকানো হলো। জেল দেয়া হলো সাত দিনের। ঐ ভাষা আন্দোলনই ক্রমান্বয়ে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

লন্ডন থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের দু'সপ্তাহ পরের কথা। শেখ মুজিবের অভিষেক পর্ব শেষ হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম লন্ডনে থাকতে দেশে ফিরে জনগণকে ঘুরে ঘুরে দেখার যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, তা তখনও তাঁর পরিকল্পনায় রয়েছে কিনা। আমার প্রশ্নে মুজিব অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। রুক্ষভাবে তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন,

'আমি এখন তা করি কিভাবে? তুমি কি দেখতে পারছ না, আমাকে দেশের জন্যে একটা প্রশাসন দাঁড় করাতে হচ্ছে? তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছামতই তা করছিলেন। এতে করে দেশের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন সব জায়গাতেই নিষ্কর্মা, চাটুকারদের দল ভারী হয়ে উঠতে লাগলো। দেশের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতি এক অতি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হলো।

প্রতিরক্ষা বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা নামে দু'টি শিবিরের সৃষ্টি হয়ে গেলো। ৩৫,০০০ অফিসার ও জোয়ান পাকিস্তানে দীর্ঘদিন আটক থাকার পর দেশে ফিরে এলে অবস্থা অধিকতর ঘোলাটে হয়ে উঠলো। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে 'মুক্তিযোদ্ধা' আর 'স্বদেশ প্রত্যাগত'- এই ভেদাভেদ সৃষ্টির কারণে রেষারেষি আর বিশৃঙ্খলা চরমে উঠলো। পরিণামে এটাই শেখ মুজিব, জেলে চারনেতা এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের গুপ্তহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুঃখজনকভাবে ঐ সকল হত্যাকাণ্ডের জন্যে মুক্তিযোদ্ধারাই এককভাবে দায়ী ছিলেন।

১৯৭২ সালের মার্চ মাস শেষ হয়ে এসেছে। ঢাকায় এক জমজমাট গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। অতিরিক্ত কাজের চাপে মুজিব অসুস্থ। তাই স্বাস্থ্য আর প্রশাসনিক প্রয়োজনে মুজিব পুনরায় তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করছেন। আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠনকল্পে মুজিব সরকারী দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। তাজউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি পরিষ্কারভাবে জানালেন, "কেউ আমার গলা কাটার চেষ্টা করছে।" এ ব্যাপারে মুজিবের প্রতিক্রিয়াও ঠিক সেই পরিমাণ তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি আমাক বললেন, 'তারা কি মনে করে যে, আমি সরকার পরিচালনায় অক্ষম?' সুস্পষ্টভাবেই স্বার্থান্বেষী মহলের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এ গুজব প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করেছিল। তারপর থেকেই মুজিব, তাজউদ্দিনকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলেন এবং তাকে সাবধানতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

শেখ মুজিব এক অব্যক্ত অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। তিনি যতটা খুশীর ভান করতেন, আসলে ততটা খুশী তাঁর মনের কোণে জমা ছিল না। তাঁর সারাটি জীবনই কেটেছে মাঠে-ময়দানে, সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হয়ে। আজ তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। প্রশাসকের আবরণটাই তাঁর জন্যে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাংলাদেশের পূর্ববর্তী ন'মাসের নাটকীয় ঘটনা প্রবাহ—আর যে চরম আত্মত্যাগ এবং দেশাত্মবোধের প্রমাণ দেখিয়েছিল এদেশের জনসাধারণ তা তাঁর বিবেকের মাঝে চিরদিনই একটা 'শূন্যস্থান' হিসেবে বিরাজ করার মত। কারাগারে চরম নিঃসঙ্গতার মাঝে সব কাটিয়ে ঐসব ঘটনা প্রবাহের কিছুই তিনি জানতে পারলেন না। সময় তাঁর জন্যে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। অথচ জাতি নূতন প্রত্যাশায় এক নবজীবনে পা বাড়ালো। সুতরাং যখন তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে আবির্ভূত হলেন, তখন সত্যিকার অর্থে মুজিব যে

স্থান থেকে ছিটকে পড়েছিলেন ঠিক সেই স্থান থেকেই আবার যাত্রা শুরু করলেন। সময়ের ব্যবধানে সৃষ্ট শূন্যতাকে পূরণ করার ক্ষমতা তার ছিল না। সে চেষ্টাও তিনি করেননি। তিনি ভয়ঙ্করভাবে ভুল করে যেতে লাগলেন। এভাবে বাংলাদেশের গঠনমূলক দিনগুলোতে বিকৃতির সূচনা হলো। ছয় মাসের মধ্যেই বিদ্রোহের বীজ রোপিত হয়ে গেলো।

মেজর ফারুক ঐ সমস্ত ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণ করে বলল, 'তিনি আমাদেরকে যদি ঘাস খেতে বলতেন, আমরা তাই খেতাম, যদি তিনি আমাদের খালি হাতে মাটি খুঁড়তে বলতেন, আমরা তাঁর জন্যে তাই করতাম। অথচ দেখুন, তিনি আমাদের সঙ্গে কি আচরণটাই না করলেন।

রিপভ্যান উইংকল বিছানার ভুল-পার্শ্ব থেকেই কেবল জাগলেন না, তিনি যাত্রাও শুরু করলেন ভুল পথে।

৩

মানব দেবতার পতন

সেনাবাহিনী জনগণের উপর গুলি চালাবে না। কিন্তু আপনি যদি তার উপর চাপের সৃষ্টি করেন, তাহলে সে আপনার এবং শাসকগোষ্ঠীর উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

—আবদুর রব

তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ সাল। স্থান ঃ ঢাকার পল্টন ময়দান। উদ্দেশ্য—শেখ মুজিবের শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ।

শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন মাত্র আট মাস আগে। এরই মধ্যে জনপ্রিয়তার স্রোত তাঁর কাছ থেকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। আন্দোলনের মহান নেতা, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠস্বর, প্রিয় বঙ্গবন্ধু ছিলেন সকল প্রশংসা দাবীদার। কিন্তু ততক্ষণে তিনি ক্রোধান্বিত জনতার সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে গেছেন।

লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ। আর একটি শক্তিশালী গণজাগরণের সম্ভাবনা। স্বাধীনতার পূর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতা আর বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তিক্ত প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। এ প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ছাত্রনেতা, প্রাক্তন মুক্তিসেনা এবং শেখ মুজিবের এককালের সবচাইতে বিশ্বস্ত অনুগামীদের একজন আ.স.ম. আবদুর রব। জনতার উদ্দেশ্যে রব বলছেন, 'দেশের স্বাধীনতার পর একটা লোককেও না খেয়ে মরতে দেয়া হবে না বলে শেখ মুজিব আশা দিয়েছিলেন। আজ খেতে না পেয়ে প্রচুর লোক মৃত্যুবরণ করছে?' রোষান্বিত জনতার আবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে রব তাদের অভিযাগের প্রতিধ্বনি তুলছিলো। ঐ অভিযোগমালার প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু ছিল-খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম জনগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, চতুর্দিকে কেবল ঘাটতি, বাজার সুবিধাভোগীদের হাতে, স্বজনপ্রীতি, সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি, বেকারত্বের পাহাড়, গুম, ধর-পাকড়, পুলিশের অত্যাচার, দায়িত্বহীন সরকার, সংবাদপত্রের মুখবন্ধ ইত্যাদি। রব ঘোষণা করলো,

'আওয়ামী লীগাররা পাকিস্তানীদের চাইতে অনেক বেশী জঘন্য আর দুর্নীতিবাজ।' মুজিবের উদ্দেশ্যে রব বলল, 'আপনি আমাদের বেপরোয়া ধর-পাকড় করছেন আর উৎপীড়ন-এর সকল যন্ত্রপাতি আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন। আপনি আপনার বক্তৃতায় অস্ত্রের কথা বলছেন। আপনি কি কোনদিন কোন বন্দুক চালিয়ে দেখেছেন? আমরা জানি সত্যিকার অস্ত্র কিভাবে চালাতে হয়। তারপর দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীপরিষদ আর সরকারী কর্মচারীদের বাতিল করে জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হয়। রব মুজিবের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলে, 'সেনাবাহিনী জনগণের উপর গুলি চালাবে না। কিন্তু আপনি যদি তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন, তাহলে তারা আপনার এবং আপনার শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।'

বাস্তবতার চাকা যেন উল্টো দিকে ঘুরে গেলো। যে মুজিব আঠারো মাস আগে পাকিস্তান সরকারের শোষণ আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিযোগের বাণ ছোড়েন, সে অভিযোগের বাণ আজ মুজিবের বিরুদ্ধে বুমেরং-এর মত ফিরে এলো। এবার জনতার হয়ে সেই সুর তুললো আবদুর রব।

শেখ মুজিবের জন্যে এ অবস্থা সত্যিই দুঃখজনক। লন্ডনে 'গল ব্লাডারে অপারেশন'-এর পর মুজিব আবার দেশে ফিরে এসেছেন। শারীরিক অবসাদ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। অথচ তার উপর পল্টনে প্রকাশ্যে ঐ মানবিক অশান্তির আয়োজন। সবমিলে তাঁর সত্তায় এক বিরাট ঝাঁকুনির সৃষ্টি করলো। কিন্তু মুজিবের মাঝে অনুশোচনার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নিজের উপর থেকে সকল দোষ তাঁর সহচরদের উপর ঠেলে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমি জনগণের সঙ্গে আছি।' প্রথমবারের মত পার্টির লোকদের উপর তিনি চড়াও হলেন। চোরাইকারবার, স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতির অভিযোগে ডিসমিস করলেন সংসদের ১৯ জন সদস্যকে।

শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের পরিশোধন প্রক্রিয়া জনগণের মনে আশার সঞ্চার করলো। মুজিব ঘোষণা দিলেন, 'আমি কাউকে ছাড়বো না। যে কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে আমি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।' মুজিবের মাঝে এ পুরনো গতিশীলতা দেখে সকলেই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করলো যে, এ সুযোগে মুজিব জনগণের বিশ্বাস আবারও ফিরে পাবে। একজন বাঙ্গালী সাংবাদিক আমাকে বললো, 'নেতা সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেলবেন। এবার তাহলে তামাশাটা দেখো।' এটা হবে তাঁর আর একটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। পরবর্তী ঘটনাবলীই মুজিব পতনের নব অধ্যায়ের সূচনা করলো। শুরু হলো রাজনৈতিক চমৎকারিত্ব প্রদর্শনের পালা। তিনি একের পর এক জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ খর্ব করতে শুরু করলেন। সাংবিধানিক নিয়ম-কানুন, আইনের শাসন, বাক-স্বাধীনতা, মতামতের অধিকার, সুযোগের সমতা, ইত্যাদি সবই বিলুপ্ত হয়ে গেলো। কায়েম হলো দুঃশাসনের চরম পরাকাষ্ঠা।

স্বাধীনতার পর জাতিসংঘের ঢাকাস্থ রিলিফ অপারেশনের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'আনরড'-এর পরিচালিত দেশব্যাপী সাহায্য কর্মসূচী দেশটিকে বাঁচিয়ে রাখতে অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করেছিল। 'আনরডের' খাদ্য সরবরাহ আর বিতরণ ব্যবস্থায় সুসংগঠিত পরিকল্পনার কারণে বাংলাদেশের মানুষ না খেয়ে মরতে পারেনি।

১৯৭২ সালের গ্রীষ্মকাল। শেখ মুজিবের সবকিছুই যেন উলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। চাল-ডালের দাম হঠাৎ করে দ্বিগুণ হয়ে গেলো। শেখ মুজিব যুদ্ধের ফলশ্রুতি বলে পরিস্থিতিকে ধামাচাপা দিতে চাইলেন। কিন্তু ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে তেল, নুন, সাবান থেকে শুরু করে সকল নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বুভুক্ষ মানুষের নাগালের বাইরের কথাতো আর এত সহজে চাপিয়ে রাখা যায় না। দেশটা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত হলো। আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতি জনমনে নিদারুণ বিভীষিকার ছায়াপাত করলো।

সশস্ত্র সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী দলের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড, হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদিতে চতুর্দিক থমথমে হয়ে উঠলো। মন্ত্রী পরিষদ আর সরকারী আমলাদের পরামর্শক্রমে প্রধানমন্ত্রী দশ দিনের মধ্যে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র সারেন্ডার করার নির্দেশ দিলেন। মানব দেবতার বৃষ্টি হবার নির্দেশ দানের মত এবারের বেআইনী অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশও দারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। সময়সীমা বাড়ানো হলো। টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী ও তার বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও মুজিবের আনুগত্য স্বীকার করলো। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিরিশ হাজার বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র জমা পড়লো। যদিও ধারণা করা হয়েছিল লক্ষাধিক অস্ত্রের। শেখ মুজিব এবং তার পরবর্তী খন্দকার মোশতাক আর জেনারেল জিয়াউর রহমান কেউই বাকী অস্ত্রের সন্ধান করতে পারেননি।

১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারী কোলাবরেটর আইন পাশ করা হলো। উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ চলাকালীন যারা তাদের সক্রিয় সহযোগিতার নামে দালালি করেছে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা। এ আইনও দেশে গোলযোগ আর গণমানুষের হয়রানির হাতিয়ারে পরিণত হলো। বহু সক্রিয় হানাদার বাহিনীর দালালও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দায়িত্ব পেল। অন্যদিকে বহু নির্দোষ ব্যক্তিও ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিগত রোষানলে পড়ে সর্বস্ব হারাতে হয়েছিল। এমনকি কোর্টে দালালির অভিযোগে রাজাকার, আল-বদর ইত্যাদিদের বিচার ও দণ্ডাদেশ প্রদান করা হতো, সে কোর্টের হাকিম নিয়োজিত হয়েছিলেন রাজাকার সর্দার।

সম্পূর্ণ বিষয়টি ন্যায় বিচারের অভিনয় বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকার শেষ পর্যন্ত এ অভিযানের সমাপ্তি টানলেন। কিন্তু ততক্ষণে দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছে গেছে।

এবার এলো মজুতদার আর চোরাচালানীদের বিরুদ্ধে অভিযান। ব্যবস্থা নেয়া হলো। বিভিন্ন ধরনের লোক-দেখানো গোছের। কাজ হলো না কিছুই। রুই-কাতলারা দিব্য রয়ে

গেলেন। কিছু চুনোপুটি কেবল আটকা পড়লো অভিযানের জালে। অবশ্য ঐ রুই-কাতলারাও শাসকচক্র, আওয়ামী লীগেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো। দুর্নীতি কেবল বাংলাদেশেই বিরাজমান—কথাটি ঠিক নয় তবে যে হারে এবং গতিতে দেশের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল, তা সত্যিই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল। দেশটির সবকিছুই নতুনভাবে শুরু হচ্ছিল বলে দুর্নীতির সুযোগও ছিল অপরিসীম।

ঐ সকল দুর্নীতির উদাহরণ দিতে গেলে প্রচুর বইয়ের সৃষ্টি হয়ে যাবে। ছোটখাট দোকানী থেকে "বিজনেস ম্যাগনেট" আর ছোট কর্মচারী থেকে সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি পর্যন্ত কেউ বাদ গেলো না। যে যেভাবে পারলো, লুটেপুটে রাতারাতি মহাসম্পদশালী হবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে গেলো। দুর্নীতি কেবল আওয়ামী লীগার, সরকারী আমলা আর কূটনীতিকদের মধ্যেই সীমিত রইল না, তারা সে জন্যে যার যার সুবিধেমতো নেটওয়ার্কও সৃষ্টি করে নিলো। কেউ তার আত্মীয়-স্বজনের নামে কার্যসিদ্ধি করছিলেন। কেউ বা আবার পরিষ্কার নিজের নামেই।

দেশটাকে শেখ মুজিব নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ বলে মনে করতেন। সুতরাং টাকা বানানো তাঁর দরকার ছিল না। তার লোভ ছিল ক্ষমতার প্রতি। তাঁর ছেলে, শেখ কামাল আর তাঁর ছোট ভাই টাকার ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলো না। বিনিয়োগবিহীন ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে শেখ কামাল বেশ এগিয়ে ছিলো। মুজিবের ছোট ভাই বহু সংখ্যক বার্জ ও অন্যান্য নৌযান-এর মাধ্যমে প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়ে গেলো।

এদিকে একদল জুটে গেলো যারা কেবল পরিচয় বিক্রি করে ভাল রোজগারে বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলো। তাদের কাজ ছিলো কোন একটা টুকিটাকি কাজ-কর্ম করিয়ে দেয়া কিংবা খদ্দেরকে শাসকচক্রের সঙ্গে বা চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। আমার এক বাঙ্গালী বন্ধু এখনও আমাকে বলে, 'তুমি যদি উন্নতির সিঁড়ি পেতে চাও, তাহলে তোমাকে দান-খয়রাত করতে হবে।'

সরকারী দুর্নীতির মধ্যে দেশের খাদ্যদ্রব্য আর পাট ভারতে পাচারকরণ ভয়ানক আকার ধারণ করেছিলো। এ ব্যবস্থাটি দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব থেকেই চলে আসছিলো। মুজিব হত্যার পরে সরকার নিজেই বলেছিলো যে, স্বাধীনতার গত সাড়ে তিন বছরে দেশের সীমান্ত দিয়ে কমপক্ষে ছয় হাজার কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী ভারতে পাচার হয়ে গেছে। দেশের পাচারকৃত ঐ দ্রব্যসমাগ্রীর মধ্যে পাট, খাদ্যশস্য এবং বিদেশ থেকে আমদানী করা মালামাল রয়েছে।

চোরাচালানকৃত সরকারী হিসেবের ছয় হাজার কোটি টাকার সঙ্গে অবশ্যই বৈদেশিক মুদ্রায় কালো বাজারের মাধ্যমে দেশের বাইরে চলে যাওয়া বিরাট অংকের টাকা এবং চাল, চিনি, সিমেন্ট ও অন্যান্য দ্রব্যের বড় বড় কেনাকাটার 'কমিশনের' টাকাও যোগ দিতে হবে। এভাবে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশে দুর্নীতির পমিন্ডলজ্ঞাতসারে সকল দেশের সবকিছুকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

একটি শিশু রাষ্ট্রের জন্মলগ্নে জাতীয় সম্পদের বিনাশ সাধন দেশটিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। বাংলাদেশেরও হয়েছিল ঠিক সেই মরণাপন্ন অবস্থা। দুইশত কোটি ডলার পরিমাণ আন্তর্জাতিক সাহায্য দেশে আসার পরও ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে দেশটি দেউলিয়া হয়ে গেলো। পরিতাপের বিষয় এই যে মুজিব হত্যার পরও কেউ এই রক্তক্ষরণরূপী সম্পদের বিনাশ সাধন রোধ করতে পারলো না।

শেখ মুজিবের নির্বোধ, ব্যক্তিত্বহীন চাটুকারের অভাব ছিল না। মুজিবের পরামর্শদাতা ও মন্ত্রীদের মধ্যেই জঘন্যতম চাটুকাররাও ছিলো। পরামর্শদাতাদের মধ্যে তোফায়েল আর শেখ ফজলুল হক মনি ছিল অগ্রগামী। মন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা ছিলো তাহেরউদ্দীন ঠাকুর। ঠাকুর 'ইনফরমেশন' মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো।

ঠাকুর কর্তৃক ঢাকা বিমান বন্দরে শেখ মুজিবের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ গ্রহণের দৃশ্য বাংলাদেশ টিভি দর্শকদের উপহার দেয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি, সেদিন অবাক বিস্ময়ে জাতি মন্ত্রীদের ব্যক্তিত্ব আর গদি-লিপ্সার কান্ডকারখানা অবলোকন করছিলো। অবশ্য মুজিব তা খুব পছন্দ করতেন, গর্বিতও হতেন বৈকি!

তাজউদ্দিন আহমেদ আর জেনারেল ওসমানী এ সকল অকর্মণ্যতা আর অব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল ছিলো না। তাজউদ্দিন তো এক পর্যায়ে প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা করেই ফেললেন। মন্ত্রীত্ব থেকে সরে পড়তে হলো তাকে। জেনারেল ওসমানীও সরে দাঁড়ালেন সরকারের মন্ত্রীত্ব থেকে। কিন্তু অন্যান্যরা শেখ মুজিবকে ছেড়ে গেলো না। অবশ্য পদোন্নতি আর গদির নেশা এর পেছনে কাজ করেছিলো।

মুজিব তাঁর পার্টি, আওয়ামী লীগের দ্বারাই কোণঠাসা হতে বাধ্য হলেন। ১৯৭২ সালে জানুয়ারীতে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে তিনি সব জায়গায় তার দলীয় লোকদেরকে বসিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল—তাদের মধ্যে দু'দিকের যোগাযোগই রক্ষা করা। কিন্তু তাদের অতিমাত্রায় মোসাহেবীতে যোগাযোগের একটি পন্থা অচল হয়ে গেলো। মুজিব চতুর্দিক থেকে কেবলই জনগণের দুর্দশার কথাই শুনছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁর চাটুকারেরা বেমালুম অস্বীকার করে বলতো, 'এ সবই দুষ্ট লোক আর রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের অংশবিশেষ।' এভাবে, পুরাকালের গ্রীক দেবতাদের মতো, ওরা তাকে পাগল বানিয়ে ধ্বংস করে দিলো।

৪

মুজিবের মিলিটারী ভীতি

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো আমরা একটা দানবের সৃষ্টি করতে চাই না।
—শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭৩ সাল। মুজিব শাসনের দ্বিতীয় বছর। শেখ মুজিবের জন্যে বেশ কিছু অশুভ লক্ষণ নিয়ে বছরটির যাত্রা শুরু। তাঁর শাসনের প্রথম বছরটি একটি মাত্র সোনালী সাফল্যের দাবীদার। আর তা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম 'সংবিধান'। বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে, শেখ মুজিবের চিন্তার ফসল এ মহত্তম জাতীয় দলিল জাতীয় সংসদে পাস হয়ে গেলো। সুনিপুণ হস্তলিখিত 'সংবিধানে' শেখ মুজিব সই করলেন ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। অনেক অশুভের মাঝে এ ছিল এক শুভ অবদান—গর্ব করার মতো এক জাতীয় দলিল।

নিজ হাতে সম্পন্ন এ মহৎ কর্মের জন্যে শেখ মুজিব অবশ্যই গর্বিত। পরবর্তী সাংবিধানিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ তারিখে নির্বাচনের দিন ধার্য করলেন। এটা বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ উভয়ের জন্যেই সুসময় হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন নববর্ষের শুভ দিনে ঢাকার রাজপথে এক অবিশ্বাস্য হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হলো। খুলনা আর বন্দরনগরী চট্টলাতেও উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-জনতা একই ঘটনা ঘটালো। ছাত্র-জনতা মিলে ঐ তিনটি প্রধান শহরে মুজিব শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লো।

ঘটনার সূত্রপাত হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের রক্তক্ষয়ী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। ঢাকার ছাত্ররা সেদিন হ্যানয় শহরে যুক্তরাষ্ট্রের বোমাবাজির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে। ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের ইনফরমেশন সেন্টার ও লাইব্রেরীর বাইরে এক বিরাট জনতার সমাবেশ। জনতা ক্রোধান্বিত হলেও শান্তিভঙ্গের কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়নি। সকলেই ভাবছিলো, ছাত্ররা তাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন শেষে সরে পড়বে। হঠাৎ করে কারও উস্কানিতে ছাত্ররা ঐ বিল্ডিংটি আক্রমণ করে আর মুহূর্তের মধ্যে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বেঁধে যায়। পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় দু'জন ছাত্র আর ছয়জন হয় আহত।

ঐ ঘটনাটি শেখ মুজিবের জন্যে বিপর্যয়ের বার্তা বয়ে আনে। ঐ তো সেদিন শেখ মুজিব নিজেও ছাত্রনেতা হিসেবে জনগণের মনের কথা নিজ কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত করে পাকিস্তানী মিলিটারী সরকারের তখ্‌ত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। পরিশেষে, ঐ সামরিক সরকারের হিংস্র থাবার নাগপাশ থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি এলো তাঁরই পিঠে ভর দিয়ে। অথচ কি আশ্চর্য, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এক বছর যেতে না যেতেই ঢাকায় শেখ মুজিবের পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হলো ছাত্রদের।

ঘটনাটি তাৎপর্য আর গুরুত্বে ভরে উঠে। স্বাধীনতার পর এ ধরনের রক্তক্ষয়ী ঘটনা আর এদেশে ঘটেনি। অবশ্য, বামপন্থী ছাত্রনেতা আবদুর রব মাত্র চার মাস আগে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছিলো। মুজিব সে অভিযোগ রাজনৈতিক চমক বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিদ্রোহ, রক্তপাত, রাজপথে গুলি-এসব ঘটনা তিনি কিভাবে উড়িয়ে দেবেন? বামপন্থী ছাত্রদল দেশব্যাপী হরতালের আহ্বান জানালো।

শেখ মুজিব হরতালের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। একদিকে, বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়ে ঐ রক্তপাতজনিত সমালোচনার পথ বন্ধ করলেন। অন্যদিকে, পরিষ্কার ভাষায় 'সোভিয়েত ইউনিয়নের চর' নামে আখ্যায়িত করে তাঁর দলীয় জনগণকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিলেন। ফল হলো বেশ চমৎকার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাঁশের খুঁটি আর কাস্তে হাতে লক্ষাধিক গ্রামবাসী আওয়ামী লীগারদের সাথে জড়ো হয়ে প্রথমে ছাত্রাবাস থেকে এবং পরে রাজপথ থেকে বামপন্থীদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিলো। হরতালের আয়োজন এমনভাবে বানচাল করে দেয়া হলো যে, শেষ নাগাদ বর্ষীয়ান জননেতা, মওলানা ভাসানী তাঁর আহুত প্রতিবাদ সভায় ভঙ্গ দিয়ে নিজ গ্রামের বাড়ীতে নিরাপদে পালিয়ে বাঁচেন।

দিনটির ঘটনাবলীর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। প্রথমটি—মুজিবের প্রতিপক্ষের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সম্মুখ সমরে তাকে পরাভূত করা কখনও সম্ভব নয়। এ ধরনের ধারণা অবশ্য শেখ মুজিবের জন্যে মারাত্মক ফলশ্রুতির ইঙ্গিতবহ ছিল। শেষ মুজিবকে গদিচ্যুত না করে হত্যা করা হলো কেন? প্রশ্ন করা হলে মেজর রশিদ বললো, 'অন্য কোন পন্থা খোলা ছিল না। তিনি ছিলেন অঘটন-ঘটন পটীয়সী'। সুযোগ দেয়া হলেই বিপদের ঘনঘটা আমাদের উপরই নিপতিত হতো।'

দ্বিতীয়টি ছিল শেখ মুজিবের জন্যে অত্যন্ত সুখকর। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে তিন মাস পরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বিরাট বিজয় লাভ করেন। তার আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদের ৩১৫টি আসনের মধ্যে ৩০৭টি আসন লাভ করে। অবশ্য নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারী দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগও হয়েছে অনেক। সুবিধেবাদী, চতুর রাজনীতিবিদ, মওলানা ভাসানী প্রথমে শেখ মুজিবের বিরোধিতা করলেও নির্বাচনের পর চুপিসারে সরকারের পিছু নেন এবং নির্বাচনের ফলাফলের উপর মন্তব্য

করতে গিয়ে বলেন, 'নির্বাচনের ফলাফল বাংলাদেশে অবিমিশ্র সমাজতন্ত্র কায়েমের ইঙ্গিতবহ।'

সম্ভবতঃ শেখ মুজিব নির্বাচনের ফলাফলকে তাঁর নিজের বিজয় এবং তাঁর নীতির প্রতি জনগণের সমর্থন বলে মনে করলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মুজিব বলেছিলেন, 'নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে যে, আমি আমার জনগণকে যতটা ভালবাসি, তারাও আমাকে ততটাই ভালবাসে।' সুতরাং দেশ পুনর্গঠনের প্রশ্নে আর আওয়ামী লীগারদের মনে কাঁটা হয়ে রইলো না। বরং শেখ মুজিব আর তাঁর আওয়ামী লীগারগণ নির্বাচনে বিজয়ের মাঝে যেন তারা তাদের পূর্বকর্মে ফিরে যাবার 'লাইসেন্স' পেলেন। শুরু হলো পূর্ব নৃত্যের তালে তালে ভুখা-নাংগা মানুষের শ্রুতিকটু নূপুরের ঝংকার।

নির্বাচনের অনেকগুলো দিকের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সেনাবাহিনীর ভোটদানের নমুনা জরিপ। অবশ্য তা প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু শেখ মুজিব আর তাঁর উপদেষ্টাগণ সযত্নে তা লক্ষ্য করেন। বিষয়টি আওয়ামী লীগ সরকারকে বিব্রত করে তোলে। এ কারণে যে, মিলিটারী ক্যান্টনমেন্টগুলোতে রক্ষিত হিসেবে দেখা যায়, মুজিবের আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। মুজিব হত্যার পর জেনারেল জিয়া আর ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর আমাকে বলেছিলেন যে, সৈন্যেরা নির্বাচনে ৮০% এরও কিছু বেশী ভোট আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রদান করেছিলো।

ঐ সকল সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সারির বীর সেনা। সে সময় মুজিব ছিলেন দেশ ও জাতির জনক—আর তাদের অনুপ্রেরণার উৎস। মাত্র ১৫ মাসের ব্যবধানে তারা আজ মুজিবের বিরুদ্ধে বৃহত্তম একক সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠেছে। পরে আমি এ বিদ্রোহের কারণগুলো মেজর ফারুক, মেজর রশিদ, ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর, জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং আরও কিছু অফিসার ও জোয়ান-এর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম। শেখ মুজিবের হত্যার পর ১১ই ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে ঢাকায় এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল জিয়া আমাকে বলেছিলেন, 'আমরা সত্যিকার অর্থে কোন সেনাবাহিনী ছিলাম না।' কাগজে-পত্রে আমাদের কোন অস্তিত্বই ছিলো না। সেনাবাহিনীর জন্যে আইনগত কোন ভিত্তি ছিলো না। 'টেব্‌ল অব অর্গানাইজেশন এন্ড এস্টাব্লিশমেন্ট' বলে কোন জিনিস ছিল না। সবই ছিলো 'এডহক'। সেনাবাহিনী বেতন পেত। কারণ, শেখ মুজিব তা দিতে বলেছিলেন। মুজিবের মুখের কথার উপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিলো। আমাদের ছেলেরা নরকের যাতনায় ভুগছিলো, কিন্তু মুখ ফুটে কোন অভিযোগ করেনি। কারণ, এরা দেশের সেবায় নিয়োজিত ছিল। এবং এরা প্রয়োজনে যে কোন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিলো।

একই দিনে ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর, জিয়ার চীফ অব জেনারেল স্টাফ আমাকে বলেছিল, 'এ দেশের সেনাবাহিনী একটা স্বেচ্ছাসেবক দলের মতো। আমাদের অফিসার এবং

জোয়ানেরা সৈনিক হিসেবে তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে চায় বলে তাদেরকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেই কাজ করতে হচ্ছে। বিনিময়ে তারা কি পেয়েছে? প্রত্যেকেই এরা হতভাগ্য, এদের খাবার নেই, তাদের কোন প্রশাসন নেই, অস্ত্রশস্ত্র নেই। তুমি অবাক হবে, তাদের জার্সী নেই, গায়ের কোট নেই, পায়ে দেয়ার বুট পর্যন্ত নেই। শীতের রাতে তাদেরকে কম্বল গায়ে দিয়ে পাহারা দিতে হয়। আমাদের অনেক সিপাহী এখনো লুঙ্গি পরে কাজ করছে। তাদের কোনো ইউনিফর্ম নেই। তদুপরি, তাদের উপর হয়রানি। মঞ্জুর দুঃখ করে বললো, 'পুলিশ আমাদের লোকদেরকে পিটাতো। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সরকারী আমলারা সেনাবাহিনীকে ঘৃণার চোখে দেখতো। একবার আমাদের কিছু ছেলেকে মেরে ফেলা হলো। আমরা মুজিবের কাছে গেলাম। মুজিব কথা দিলেন, তিনি ব্যাপারটি দেখবেন। পরে তিনি আমাদের জানালেন যে, আমাদের ছেলেরা "কোলাবরেটর" ছিল বলে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে।

মঞ্জুরের মতে, সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে মুজিব সকল পন্থাই ব্যবহার করেছিলেন। তিনি কাউকে তার জীবনের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন সন্দেহ হলেই সেখানে ভাঙ্গন ধরিয়ে দিতেন। একমাত্র মুজিবই সেনাবাহিনীতে ভাঙ্গন ধরিয়ে একে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন।

জেনারেল জিয়া, মঞ্জুর এবং আরো অনেক অফিসারের সঙ্গে আলাপ করে আমার ধারণা জন্মালো যে, শেখ মুজিব তার দ্বিতীয় ছেলে, জামালকে সেনাবাহিনীর উচ্চপদের জন্যে তৈরী করছিলেন। মঞ্জুর জানালেন যে, মুজিব জামালকে আর্মিতে ঢুকিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্যে ইয়োগোশ্লাভ মিলিটারী একাডেমীতে পাঠিয়ে দেন। জামাল ওখানকার পড়াশুনায় সম্ভবতঃ কুলিয়ে উঠতে না পেরে মুজিবকে দারুণভাবে হতাশ করে ঢাকায় ফিরে আসে। এরপর, মুজিব তাকে বিলেতের স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারী একাডেমীতে পাঠাতে চাইলেন। তিনি তখন সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল শফিউল্লাহকে টেলিফোনে বললেন, তিনি যেন জামালকে স্যান্ডহার্স্ট-এ ক্যাডেট হিসেবে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এতে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

প্রথম কারণ, স্যান্ডহার্স্টের ক্যাডেটদের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নিয়ম-কানুন পালন সাপেক্ষে বাছাই করা হয়। আর সেখানে জামালের চাইতে অনেক মেধাবী ও অধিকতর যোগ্য প্রার্থীও ছিল। ফলে এটা ধারণা করা হয়েছিল যে, বৃটেনের প্রিমিয়ার মিলিটারী একাডেমী জামালকে যোগ্য বলে বিবেচনা করবে না। কিন্তু একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ বিবেচনা করে তারা ৬,০০০ পাউন্ড প্রশিক্ষণ ফীসহ বিশেষ ব্যবস্থায় জামালকে গ্রহণ করতে রাজী হলো। মঞ্জুর মতে ঐ টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অজ্ঞাতে বিশেষ আর্মি চ্যানেলে গোপনীয়ভাবে স্যান্ডহার্স্টে পাঠানো হয়েছিলো।

জামাল ছিল একজন সম্ভ্রমশীল ভদ্র ও সুশীল তরুণ। তার ব্যক্তিত্ব ছিল পছন্দ করার

মতো। মাত্র কিছুদিন হলো সে স্যান্ডহার্স্ট থেকে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরেছে। এরই মধ্যে বিয়েটাও সম্পন্ন হয়ে গেছে। বিয়ের মাত্র এক মাসের মধ্যে শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে জামালও মেজরদের বন্দুকের শিকার হলো।

মিলিটারীর সব কিছুতেই শেখ মুজিবের দারুণ ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। তিনি দুই মিলিটারী একনায়ক কর্তৃক চরমভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। তারা হচ্ছেন—ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ও জেনারেল ইয়াহিয়া খান। আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর ক্ষমতা দখল করেন এবং ঐ একই দিনে শেখ মুজিবকেও গ্রেফতার করেন। আইয়ুবের পরবর্তী সাড়ে দশ বছরব্যাপী একনায়কতন্ত্রের পুরো সময়টা মুজিব জেলের নির্জন প্রকোষ্ঠে কাটিয়ে দিলেন। পরে ১৯৬৮ সালে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যে পুনরায় মুজিবকে 'ডিটেনশন' দেয়া হয় এবং ঢাকায় কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাকে প্রধান আসামীর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের সঙ্গে একীভূত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। এ অভিযোগ ছিল মৃত্যুদণ্ডের অভিযোগ। কিন্তু আইয়ুবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থানের প্রচন্ড চাপের কারণে মুজিব ঐ যাত্রায় ফাঁসি থেকে রেহাই পেলেন। ১৯৬৮ সালে আইয়ুব বাধ্য হলেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ স্থগিত রাখতে। মুজিবকে ডেকে নিলেন কনফারেন্স টেবিলে।

১৯৭১ সাল। ভয়ঙ্কর মুক্তির লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ইয়াহিয়া খান মুজিবকে বন্দী করে নিয়ে গেলো তার দেশে। মুজিব প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে চললেন। একটি বিশেষ সামরিক আদালতে তাকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করে। মুজিবের 'প্রিজন-সেল' এর পাশেই একটা কবর খনন করা হলো। মুজিব কবর দেখে দেখে জীবনের শেষ মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছেন।

পরম সৌভাগ্যের খবর। ঐ রাতেই যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলো। মুজিবের প্রতি জেলার-এর মায়া হলো। জেলার জানতে পারলো যে, ইয়াহিয়া খানের পদত্যাগ অত্যাসন্ন। দেরী না করে চুপিচুপি মুজিবকে তার ব্যক্তিগত কোয়ার্টারে নিয়ে গেলো। মুজিবকে সেই মায়াময় জেলার তার নিজ ঘরে দু'দিন লুকিয়ে রাখলো। অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের স্থলাভিষিক্ত হলেন। ভুট্টোকে শেখ মুজিবের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করতে অনুরোধ করা হলে, তিনি তা অস্বীকার করলেন। দু'সপ্তাহ পরেই মুজিব মুক্তি পেয়ে লন্ডন হয়ে দেশে ফিরে এলেন। যে তাকে জীবনে বাঁচিয়েছিলো সে জেলারকে মুজিব কখনও ভুলেননি। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে ভুট্টো ঢাকায় এলে মুজিব ঐ লোকটিকে তাঁর ব্যক্তিগত অতিথি হিসেবে দাওয়াত করেছিলেন।

মুজিব সেনাবাহিনীর প্রতি ঘৃণা নিয়েই কবরে গেলেন। শেখ মুজিবের মন্ত্রীবর্গ ও অন্যান্য সিনিয়র আওয়ামী লীগাররাও সেনাবাহিনীর প্রতি একই ধারণা পোষণ করতো।

এই সেনাবাহিনীর লোকেরা নিজের জীবন বিপন্ন করে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত, তখন আওয়ামী লীগাররা নিরাপদে কলকাতায় বসে দিন কাটাচ্ছিলো। মুজিবের বুঝা উচিত ছিল যে, এই সেনাবাহিনীই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এই নূতন দেশ জন্মের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু সেনাবাহিনী অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায় ক্ষমতা চায়নি। মুজিবের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যও তারা দেখিয়ে আসছিল।

মুজিব আর তার মন্ত্রীবর্গ সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েন। দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার নেয়ার পর একমাস যেতে না যেতেই তিনি ভারতের সঙ্গে পঁচিশ বছর মেয়াদী এক মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে ভারতের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছিল। সুতরাং ঐ চুক্তির মাধ্যমে দেশের জন্যে একটা কার্যকরী সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা নেই বলেই ধরা হলো। সেনাবাহিনীকে কমিয়ে ফেলা হলো এবং প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রশিক্ষণ সংক্ষিপ্ত করা হলো। সেনাবাহিনী কেবল রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার বাহন হিসেবে পরিগণিত হলো।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মুজিব নিজেই আমাকে বলেছিলেন যে, 'তিনি একটা শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের বিরুদ্ধে। আমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মত একটা দানব সৃষ্টি করতে চাই না।'

শেখ মুজিব চেয়েছিলেন সেনাবাহিনীকে নিঃশেষ করে দিতে—কিন্তু ঘটনাচক্রে তা আর হয়ে উঠলো না।

একটা ঘটনার কথা বলি।

১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাস। আরব-ইসরাইল যুদ্ধ চলছে। আরবদের পক্ষে সমর্থনের নির্দশন স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার কিছু একটা দেখানোর জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। সিদ্ধান্ত হলো, মিশরে চা পাঠানো হবে। যুদ্ধের সময় অর্থ ও অস্ত্রের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী হলেও বাংলাদেশের পক্ষে তা উপহার দেয়া সম্ভব নয় বিধায় মুজিব বিমান-ভর্তি উৎকৃষ্টমানের বাংলাদেশী চা মিশরে পাঠিয়ে দিলেন। মিশর এ উপহার অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলো।

কেবল শেখ মুজিবই নন, অন্য কেউই চিন্তাও করতে পারেনি যে, এই উপহার প্রদানের ঘটনাটি পরোক্ষভাবে তার জীবনে বিয়োগান্ত নাটকের অবতারণা করবে।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত বাংলাদেশের আন্তরিক উপহার-এর কথা ভুলেননি। এর পরিবর্তে তিনিও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে একটা চমৎকার উপহার প্রদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি জানতেন, বাংলাদেশের তেমন উল্লেখযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র নেই। ঐ সময় কায়রোর কাছাকাছি মরুভূমিতে বহুসংখ্যক টি-৫৪ ট্যাংক বহর সাজানো ছিল। প্রেসিডেন্ট সাদাত তা থেকে তিরিশটি ট্যাংক বাংলাদেশে উপহার পাঠাবেন বলে স্থির করলেন। ১৯৭৪ সালের বসন্তকালে ঐ প্রস্তাব শেখ মুজিবকে জানানো হলো।

এই প্রস্তাব তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার করলো। তিনি ট্যাংক বহর উপহার হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহ দেখাতে পারলেন না। সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তাঁর চিন্তা-ভাবনায় এ উপহারকে এক কটাক্ষ বলে মুজিব মনে করলেন। অবশেষে পররাষ্ট্র দপ্তর ও তাঁর মন্ত্রীবর্গ তাকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, আনোয়ার সাদাত-এর এই শুভেচ্ছা উপহার কোন বিবেচনাতেই তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন না।

১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে তিরিশটি টি-৫৪ ট্যাংক এবং ৪০০ রাউন্ড ট্যাংক-এর গোলা বাংলাদেশে এসে পৌছায়। ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার্স—বাংলাদেশের একমাত্র সাঁজোয়া রেজিমেন্ট। ঐ রেজিমেন্টের মেজর ফারুক রহমান ট্যাংকগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। মেজর ফারুক তখন সরকারীভাবে রেজিমেন্ট-এর উপ-অধিনায়ক। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে তার চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ অন্য কোন অফিসার ঐ রেজিমেন্টে ছিল না। সুতরাং ট্যাংকগুলো কার্যকরীভাবে তার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে এলো। এক বছর পর ফারুক এই ট্যাংকই মুজিবের বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে—পাল্টে দেয় বাংলাদেশের গতিধারা।

কিন্তু তার আগে শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর বিকল্প হিসেবে 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী' নামে একটা 'প্যারা-মিলিটারী বাহিনী' গঠন করলেন। ঐ বাহিনীর সকল সদস্যই মুজিবের ব্যক্তিগত আনুগত্য স্বীকার করে শপথ গ্রহণ করতো। এই বাহিনীর নামটা খুব শ্রুতিমধুর হলেও, আসলে এই বাহিনী ছিল এক ধরনের প্রাইভেট আর্মির মত এবং হিটলারের নাৎসী বাহিনীর সঙ্গে খুব একটা তফাত ছিল না এদের। প্রাথমিকভাবে রক্ষীবাহিনীকে পুলিশের সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে গঠন করা হয়। মুক্তিবাহিনীর পুরনো সদস্যদের মধ্য থেকে বাছাই করা ৮,০০০ লোক নিয়ে রক্ষীবাহিনীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। মুজিবের বিরোধিতা দিন দিন বাড়তে থাকলে, তিনি সেনাবাহিনীর সঠিক বিকল্প হিসেবে রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়ে ২৫,০০০ সদস্যে উন্নীত করেন। তাদেরকে মিলিটারী ট্রেনিং, আর্মি স্টাইলে পোশাক, স্টীল হেলমেট এবং আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। এর অফিসারবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিল রাজনৈতিকভাবে একই মতাদর্শের সমর্থক। এই বাহিনীকে খোলাখুলিভাবে মুজিব আর আওয়ামী লীগের শত্রু এমনকি সমালোচকদের নিধনকর্মে ব্যবহার করা হচ্ছিল। এক সময়ে রক্ষীবাহিনী জনসাধারণের মনে প্রকম্পিত সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

রক্ষীবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যা, খুন আর নির্যাতনের বহু প্রমাণ রয়েছে। ১৯৭৪ সালের মে মাসে ১৭ বছরের এক দামাল ছেলের উপর রক্ষীবাহিনী চরম নির্যাতন চালায়। চারদিন নির্যাতনের পর ছেলেটি 'লাপাত্তা' হয়ে যায়। 'আইনের আওতা বহির্ভূত' কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট 'রক্ষীবাহিনী'কে দোষী বলে চরম তিরস্কার করে। সুপ্রীম কোর্ট দেখতে পায় যে, রক্ষীবাহিনী কোন আইন-কানুন, নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি

কিছুই মেনে চলতো না। এমনকি গ্রেফতার কিংবা জিজ্ঞাসাবাদের কোন রেজিস্টারও তাদের ছিলো না। কোর্টের তিরস্কারের জবাবে মুজিব এদের 'ঐ সকল কাজে' হস্তক্ষেপ না করার জন্যে সুপ্রীম কোর্ট-এর ক্ষমতা খর্ব করলেন।

১৯৭৩ সাল। স্বাধীনতার দ্বিতীয় বছর। আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, কালোবাজারী, চোরাচালান আর রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষ, রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো। মুজিব তাঁর রক্ষীবাহিনী আর সশস্ত্র রাজনৈতিক কর্মীদের দিয়ে তা প্রতিহত করছিলেন। পক্ষে-বিপক্ষে চতুর্দিকে কেবল অস্ত্র আর অস্ত্রের ঝন্-ঝনানি। সাধারণ মানুষের মাঝে করুণ নিরাপত্তাহীনতা। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর তখন যশোহর ব্রিগেড কমান্ডার। তার মতে, সে প্রায় ৩৩,০০০ অস্ত্র এবং প্রায় ৩৮ লাখ গোলা তার অধীনস্থ ৬টি জেলা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলো। ১৯৭৩ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে কেবল রাজনৈতিক হত্যার সংখ্যা ২,০০০ অতিক্রম করে।

শেখ মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামাল ছিল অত্যন্ত বদ মেজাজী। বাবার মতো সেও বাংলাদেশকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করতো। তার পরিবার বা দলের সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচরণকে কামাল রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে মনে করতো। শেখ মুজিব হয়তো তার ছেলের কিছুকিছু কাণ্ডকীর্তি পছন্দ করতেন না—কিন্তু তবুও তিনি তাকে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে বাংলার আকাশে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন। 'মাও' পন্থী সর্বহারা পার্টির নেতা, সিরাজ শিকদার ছিলো কামালের জন্যে এক বিষধর সাপ। উল্লেখযোগ্য যে, এই সিরাজ শিকদার তার দলবল নিয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছে ১৯৭১ সালে। কিন্তু স্বাধীন দেশে নীতির প্রশ্নে সিরাজ শিকদার হয়ে গেলো শেখ মুজিবের ঘোরতর শত্রু। ১৯৭২ সালে সিরাজ শিকদার আর তার অনুসারীরা মিলে মুজিব বিরোধী পোস্টার দিয়ে ঢাকা শহরকে ছেয়ে ফেলে। এ বছর স্বাধীনতা দিবসেও তা করা হবে বলে গোয়েন্দা বিভাগ খবর দিলো। কামাল তা প্রতিহত করবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ সাল। রাত গভীর হয়ে আসছে। শেখ কামাল তার সঙ্গী-সামন্ত নিয়ে একটি মাইক্রোবাসে করে সিরাজ শিকদারের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। হাতে তাদের স্টেনগান আর রাইফেল। ঢাকা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ সুপার মাহবুবের অধীনে একই কাজের জন্যে উপর থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছিলো। কামালেরা তা জানতো না। শিকার খোঁজের পালায় পথিমধ্যে দু'দল সামনা-সামনি হয়ে গেলো। ঐ পুলিশের স্কোয়াডটি সার্জেন্ট কিবরিয়ার নেতৃত্বে একটা টয়োটা গাড়ীতে সিরাজ শিকদারের তল্লাশী চালাচ্ছিলো। মাইক্রোবাসে অস্ত্রধারী দল দেখতে পেয়ে পুলিশ কারটি তাদের অনুসরণ করতে লাগলো। কিবরিয়া ভাবলো সে শিকদার গ্যাং-এর সন্ধান পেয়েছে। অন্যদিকে মাইক্রোবাসের কামাল ভাবলো শিকদারের লোকেরা ঐ টয়োটাতে রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে এসে একদল অন্যদলের উপর চড়াও হলো। গুলি বিনিময়ের পালায় শেখ কামালের গলায় গুলি বিদ্ধ হলো। সামান্যের জন্যে তার শ্বাসনালী রক্ষা পেলো। গলার ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলে কামাল মাইক্রোবাস থেকে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করে বলতে থাকলো, আর গুলি ছুঁড়োনা। আমি কামাল! আমি কামাল! তাদের ভুল বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ কামালকে পিজি হাসপাতালে নিয়ে গেলো। আতঙ্কিত সার্জেন্ট কিবরিয়া এরই মধ্যে ঢাকার ডেপুটি কমিশনার, আবুল হায়াতের বাসায় চলে এসেছে। সে ডেপুটি কমিশনারকে বললো, 'আমরা এক মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি। স্বর্গকে আামদের মাথার উপর এনে দাঁড় করিয়েছি।'

হায়াত অত্যন্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অফিসার। অবস্থাদৃষ্টে সে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না ঘটিয়ে সোজা বঙ্গভবনে বঙ্গবন্ধুর নিকট চলে গেলো। অবশ্য এর আগে সে নিশ্চিত হয়ে নিলো যে, কামাল তখনও বেঁচে আছে। ঘটনায় মুজিবের প্রতিক্রিয়া শুনে ডেপুটি কমিশনার আশ্চর্য হলো। পরিষ্কার প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, আবারও নিজ হাতে আইন তুলে নেয়ার জন্যে কামালের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বললেন, 'তাকে মরতে দাও।' পুলিশদের ব্যাপারে কি করা উচিত জিজ্ঞেস করলে মুজিব তাকে তাদের কাজে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও বললেন, 'তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।' আর যাই ঘটুক, অন্ততঃ সেই ঘটনায় তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। ডেপুটি কমিশনার থেকে প্রাপ্ত খবরের সূত্র ধরে আমার বন্ধু জাকারিয়া চৌধুরী আমাকে জানিয়েছিলেন যে, শেখ মুজিব তারপরও দু'দিন পর্যন্ত তাঁর ছেলে, কামালকে হাসপাতালে দেখতে যাননি।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুই মেজাজী যুবক—মেজর ফারুক আর মেজর রশিদ। তারা তাদের নিজেদের পেশাগত দক্ষতার জন্যে একটু দাম্ভিকও ছিলো বটে। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি মুজিবের অনীহার কারণে, তাদের ভবিষ্যৎ শিকেয় উঠার ধারণা তাদের মনে বাসা বেঁধে ফেলেছিলো। ফারুক ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার্স-এর উপ-অধিনায়ক। বেঙ্গল ল্যান্সার্স দেশের একমাত্র ট্যাংক রেজিমেন্ট। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি নাগাদ এই রেজিমেন্টের সাঁজোয়া বহরে মাত্র তিনটি সেকেলে ধরনের ট্যাংক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর মেজর রশিদ ঢাকায় অবস্থানরত দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারীর অধিনায়ক।

ফারুক এবং রশিদ উভয়েই ১৯৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করে। ওরা দু'জন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ভায়রাভাই। দু'জন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি এস, এইচ খানের দুই কন্যাকে বিয়ে করে (এস, এইচ খানের বড় ভাই এ, কে খান পাকিস্তান সরকারের আমলে শিল্পমন্ত্রী ছিলেন)। ওরা থাকতো ঢাকা সেনানিবাসের দুই পাশাপাশি বাংলোয়। বিকেলে একত্রে সকলে বসে সময় কাটানোর জন্যে গাল-গল্প করতো। বন্ধুত্ব আর পারিবারিক ঐ রকম বন্ধনের জন্যেই ওরা তাদের বিদ্রোহের ব্যাপারে একজন আর একজনকে এমনভাবে

বিশ্বাস করতো। অথচ ব্যক্তিত্বের দিক থেকে দুই মেজর দুই মেরুতে অবস্থান করতো। পারিবারিক ঐতিহ্যও দু'জনের দু'রকম।

ফারুকের পুরো নাম দেওয়ান ইশরাতুল্লাহ সৈয়দ ফারুক রহমান। বাঙ্গালী সমাজের উচ্চস্তরের পরিবার। তার পূর্বসুরিও সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলো। রাজশাহীর বিশিষ্ট পীর বংশে তার জন্ম। ফারুক তার বাপের দিক থেকে আরব সৈয়দ বংশের এবং মায়ের দিক থেকে ময়মনসিংহের জামালপুর অঞ্চলের এক জমিদার বংশের বলে দাবী করে। ডঃ এ, আর মল্লিক (তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর), সৈয়দ নজরুল ইসলাম (মুজিব জেলে থাকাকালীন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট), সৈয়দ আতাউর রহমান খান (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের চীফ মিনিস্টার এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী) এবং মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

ফারুকের পিতা, মেজর সৈয়দ আতাউর রহমান, সেনাবাহিনীর ডাক্তার ছিলেন। ফারুক তার বাবা-মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। বিমান চালনায় তার আগ্রহ ছিল প্রচণ্ড। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে সে ফ্লাইং ক্লাবের বিমান চালনার লাইসেন্স পায়। কিন্তু পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করতে ব্যর্থ হয়ে সে ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হয়। কিন্তু ১৯৬৬ সালে বিলেতে যাত্রার আগে, ১৯৬৫ সালের বসন্তকালে কচ্ছের রান এলাকা নিয়ে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের শত্রুতা শুরু হয়ে যায়। পরিণামে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সেই সময় সে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যাগ দেয়। রিসালপুরস্থ পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে যোগ দেয়ার পূর্বে তার মায়ের দিক থেকে অসম্মতি থাকলেও পরে পিতার সম্মতিক্রমে যে যোগ দেয় সেনাবাহিনীতে। রিসালপুর মিলিটারী একাডেমী থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় ফারুক ৩০০ ক্যাডেটের মধ্যে ৪র্থ স্থান লাভ করে স্নাতক হন। ঐ সময় পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর প্রশিক্ষক ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর খালেদ মোশাররফ। তাঁদের উভয়ে তাকে বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিতে বললেও সে শেষ পর্যন্ত ল্যান্সার্স রেজিমেন্টে যোগদান করে।

পরবর্তীতে ফারুক শিয়ালকোটে অবস্থানরত ৩১তম ক্যাভালরিতে বদলি হয়ে আসে। ১৯৭০ সালে ফারুক ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়। তার বয়স তখন ২৪ বছর। ঐ সময়ে কৌশলগত সাঁজোয়া কোর্সে ফারুক বি+ পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। এতে তার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার-এ গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির পথ খুলে যায়।

১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে ক্যাপ্টেন ফারুক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হয়ে তেলে সমৃদ্ধ দেশ, আবুধাবীতে সেকেন্ডমেন্টে যায় এবং তথায় আর্মড রেজিমেন্টে স্কোয়াড্রন কমান্ডার হিসেবে যোগ দেয়। আবুধাবীর সশস্ত্রবাহিনী প্রশিক্ষণের কাজে পাকিস্তান চুক্তিবদ্ধ ছিল।

যুবক ট্যাংক কমান্ডার-এর জন্যে এই সময়টা ছিল অত্যন্ত আনন্দের। সরকারী কাজের পরে তার হাতে প্রচুর সময় থেকে যেতো। ঐ সময়টা সে স্টেরিওতে গান শুনে আর মরুভূমির ফাঁকা রাস্তায় নিজের কেনা গাড়ী চালিয়ে কাটিয়ে দিতো।

১৯৭১ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি। ফারুক ব্রিটিশ অফিসার্স মেসে অবস্থান করছে। ব্রিটিশ খবরের কাগজের একটা বান্ডিল তার হাতের কাছে পেয়ে গেলো। এর মধ্যে *সানডে টাইমস* পত্রিকাটিও ছিলো। ঐ পত্রিকাটিতে বাংলাদেশে সংঘটিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার উপর আমার লেখা একটা পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। এটাই তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো।

তার চাচা, নূরুল কাদেরের কাছ থেকে পাকিস্তান বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ সম্বলিত চিঠিটি পেয়ে সে বাংলাদেশের চরম দুর্যোগময় পরিস্থিতির সত্যতা উপলব্ধি করলো। ফারুক জাতীয়তাবাদী চেতনায় এক নিষ্ঠাবান যুবক। পরিস্থিতির উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ফারুক সিদ্ধান্ত নিলো সে আর এক মুহূর্তও পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকুরী করবে না।

১৯৭১ সালের ১২ই নভেম্বর। একটা মাত্র ব্যাগে তার প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র ঢুকিয়ে তার নিজ গাড়ীতে চড়ে সোজা একেবারে দুবাই বিমান বন্দরে চলে এলো। নিজের শখ করে কেনা গাড়ীটা ছেড়ে সে বৈরুতের পথে প্রথম ফ্লাইট ধরে বসলো। তারপর লন্ডন হয়ে বাংলাদেশে।

চট্টগ্রামের কাপ্তাই হ্রদ (লেক)। মনোরম দৃশ্যের লীলাভূমি এই কাপ্তাই-হ্রদের পাড়ে সবুজের সমারোহে বনভোজনের আনন্দে মেতে আছে একটি দম্পতি মেজর রশিদ আর তার স্ত্রী, টিঙ্কু। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়েছে এক ডানাকাটা পরী, দম্পতিটির আনন্দরসকে আরো গাঢ় করে তুলছিলো। সেই অসম সুন্দরী তরুণী উর্মির নাম ফরিদা—রশিদের শ্যালিকা। এই প্রথম ফরিদা ফারুকের নজরে পড়লো। ফরিদার সৌন্দর্য, শিষ্টাচার আর নীরব মোহিনী শক্তিতে ফারুক মোহিত ও অভিভূত হয়ে পড়লো। ফারুক নিজস্ব ভঙ্গিতে রশিদকে জানালো, আমি ফরিদাকে বিয়ে করতে চাই। তোমাকে অবশ্যই এর ব্যবস্থা করতে হবে। রশিদ তাই করলো। ১৯৭২ সালের ১২ই আগস্ট ফারুক-ফরিদার বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের পরে ফারুক আর রশিদের সম্পর্ক যেন আরও নিবিড় হয়ে উঠলো। একজন যেন আর একজনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো।

দুই মেজরের পরিচয় রিসালপুরের পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে। ফারুক ছিলো এক ব্যাচ সিনিয়র। তবু দু'জনে ক্যাফেটেরিয়ায় বসে প্রচুর গাল-গল্পে মেতে থাকতো। কারণ, প্রচুর পাঞ্জাবী আর পাঠান অফিসার ক্যাডেট-এর মাঝে এরা ছিলো বাঙ্গালী। রশিদ খুব বেশী কথা বলতো আর ফারুক ছিলো একজন ভাল শ্রোতা।

কুমিল্লা-দাউদকান্দি সড়কের মাঝামাঝি অবস্থিত ছোট একটি গ্রাম—ছয়ফরিয়ায় রশিদের জন্ম। তার পিতা ছিলেন একজন প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক।

রশিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ বেঁধে

যায়। দেশাত্মবোধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সে যোগদান করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে। পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর ট্রেনিং শেষে রশিদ বেঙ্গল রেজিমেণ্টে পোস্টিং চাইলে তাকে দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারীতে কমিশন দেয়া হয়। ঐ রেজিমেণ্ট তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বানুতে অবস্থানরত ছিল।

১৯৬৮ সালে রশিদ ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়ে স্বল্পকালীন ছুটি নিয়ে ঢাকায় বেড়াতে আসে। সেই সময়ে তার এক চাচার সহযোগিতায় চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি এস, এইচ খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা জোবায়দাকে (টিঙ্কু) বিয়ে করে। বিয়ের পর রশিদ তার স্ত্রীকে নিয়ে বানুতে চলে যায় এবং সেখানেই তার দুই কন্যার প্রথমটি জন্মগ্রহণ করে।

১৯৭০ সালে অল্পদিনের জন্যে রশিদ খুলনায় অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এ বদলি হয়ে আসে। ঐ সময় এক লক্ষ টাকাসহ একজন সিপাইকে (পাঞ্জাবী) চোরাচালানীদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণের সন্দেহে গ্রেফতার এবং অন্য এক চোরাচালানীকে হাতেনাতে ধরে ফেলার পরপরই তাকে আবারও তার ঐ আর্টিলারী ইউনিটে ফেরত পাঠানো হয়।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে রশিদের আর্টিলারী ইউনিট কাশ্মীরের হাজিরায় অবস্থান করছিলো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত রেডিওর খবরে পূর্ব পাকিস্তানের ভয়াবহ চিত্র তার মনে সাংঘাতিক রেখাপাত করে। রশিদ সিদ্ধান্ত নিলো, সে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে চলে যাবে।

রশিদ পিতামাতার অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ১০ দিনের ছুটি চেয়ে এক দরখাস্ত পেশ করে। অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে ২রা অক্টোবর, ১৯৭১ সালে তার ছুটি মঞ্জুর হয়। স্ত্রী, কন্যাকে নিয়ে সে ঢাকায় চলে আসে। স্ত্রী, কন্যাকে চট্টগ্রামে শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে সে ২৯শে অক্টোবর ভারতের আগরতলায় চলে যায়।

জিয়াউর রহমানের জেড ফোর্সের সঙ্গে সংযুক্ত একটি মুক্তিবাহিনী দলের সঙ্গে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে সিলেট সীমান্ত দিয়ে পুনরায় সে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ঐ দলটির নাম দেয়া হয়েছিলো মুক্তিবাহিনী হাউইটজার ব্যাটারী। স্বাধীনতার পর এই ব্যাটারীকেই দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেণ্ট হিসেবে উন্নীত করা হয়। আর মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ হলো তার কমান্ডিং অফিসার।

ফারুক আর রশিদ অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসারদের মতো স্বাধীন দেশের উপর অনেক উচ্চাশা পোষণ করতো। ওরা চরম জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী ছিলো এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার গর্ববোধ করতো। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম কয়েক বছরে তাদের কার্যকলাপে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, তাদের কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই। অথচ শেখ মুজিব তা ঐভাবে দেখলেন না। পাকিস্তানী জেলের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তার মনে সেনাবাহিনীর প্রতি সন্দেহ আর ভীতির বীজ উপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো একটা দানব যেন পুনঃ সৃষ্টি না হতে পারে তার সকল ব্যবস্থাই তিনি করছিলেন। আর শেষ পর্যন্ত সেই ভীতিই তাঁর ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করেছিলো।

৫

দুঃসময়

সর্বত্রই কেবল সঙ্কট বিরাজ করছিলো।

—শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৪ সাল। গ্রীষ্ম থেকে শরৎকাল পর্যন্ত সময়টা বাংলাদেশের অনেকের কাছেই তাদের জীবিতকালের স্মৃতির পাতায় একটা জঘন্যতম অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ১৯৭১-এ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যার তান্ডবলীলার স্মৃতি প্রত্যক্ষদর্শীর শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চালন আজও থামিয়ে দেয়। কিন্তু সবাই স্বীকার করে নিয়েছে যে, ঐ দামেই স্বাধীনতাকে কিনতে হয়েছিলো। মুক্তি সংগ্রামের অন্ধকার ঘুটঘুটে দিনগুলোতেও প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর অন্তরে এক নূতন জীবনের প্রত্যাশার আলো ধিকিধিকি করে জ্বলছিলো। কিন্তু স্বাধীনতার তৃতীয় বছরে পা দিতে না দিতেই ঐ প্রত্যাশার আলো দপ্ করে নিভে গেলো।

আমদানী আর বিতরণ প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি স্তরে দুর্নীতি, কালোবাজারী, চোরাচালানী ইত্যাদির বদৌলতে খাদ্য সরবরাহ অবনতির দিকে ধাবিত হতে লাগলো। চালের দাম অস্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেলো। তারপরই দেশের প্রায় অর্ধেক এলাকা প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ডুবিয়ে দিলো। মানুষ-খেকো বাঘের মতো দুর্ভিক্ষ সদর্পে সারাদেশ ছেয়ে গেলো। গ্রামগুলোতে মশা-মাছির মতো মানুষ মরতে শুরু করলো।

শেখ মুজিব নিজেই সরকারীভাবে পরে স্বীকার করেছিলেন যে, খেতে না পেয়ে প্রায় ২৭,০০০ লোক মরে গেছে। ঐ হিসেবটা আসলে যথেষ্ট কম ছিল। শুধু উপোস করাই নয়, তার ফলশ্রুতিতে পুষ্টিহীনতা, টিকে থাকার ক্ষমতা হ্রাস, রোগ ইত্যাদিতে মরেছে তারও বেশী। কমপক্ষে ৩০ লক্ষ লোক উপোস সীমার নীচে বসবাস করছিলো। সুতরাং ঐ হিসেবে দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা লক্ষের ঘরেই হয়ে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী নিজেই ঐ হিসেবের অন্তর্ভুক্ত হবার পর শেখ মুজিব জেনারেল এ্যাসেম্বলিতে ভাষণ দেয়ার জন্যে নিউইয়র্ক যাচ্ছিলেন। বিমানে উঠার পূর্ব মুহূর্তে তিনি তার মন্ত্রীদেরকে দেশের

৪,৩০০টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে লঙ্গরখানা খোলার জন্যে নির্দেশ প্রদান করলেন। শেষ পর্যন্ত ৫,৭০০ লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিলো। ঐগুলোতে প্রতিদিন তিরিশ-চল্লিশ লাখ 'না-খাওয়া' মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য কেবল একবেলা সামান্য কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

লাখে লাখে মানুষ গ্রাম ছেড়ে খাবারের সন্ধানে শহরের দিকে ধাবিত হতে থাকে। হাজার হাজার লোক রাজধানী ঢাকার দিকে ছুটে আসে এই প্রত্যাশায় যে, বঙ্গবন্ধু তাদের জন্যে অন্ততঃ দু'মুঠো ভাতের সংস্থান করে দেবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাদের পেটের আগুন নিভানোর কোন ব্যবস্থাই করতে পারলেন না।

হাজার হাজার ছিন্নমূল জনতা আর ভিক্ষুকের দল ঢাকায় চলে এলে, সরকার বিব্রত হয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ৩রা জানুয়ারী 'ঢাকার শহর পরিচ্ছন্ন' করার জন্যে এক ব্যাপক অভিযান চালিয়ে প্রায় দুই লক্ষ ছিন্নমূল আর বস্তিবাসী জনতাকে জোর করে, হয় তাদের গ্রামের বাড়ীতে, না হয় শহর থেকে বেশ দূরে সরকার সৃষ্ট 'ক্যাম্পে' যেতে বাধ্য করা হয়। তিনটি ঐ ধরনের ক্যাম্পের মধ্যে ডেমরায় অবস্থিত ক্যাম্পের অবস্থা ছিলো জঘন্যতম। *গার্ডিয়ান* পত্রিকা (১৮/২/৭৫ইং) ঐ ক্যাম্পটিকে 'মুজিবের লোকদের সৃষ্ট দুর্যোগ এলাকা' নামে আখ্যায়িত করেছিলো। ক্যাম্পটির অবস্থা ছিলো সত্যিই হৃদয় বিদারক। ঐ ক্যাম্পটিতে ৫০ হাজারেরও বেশী লোককে জড়ো করা হয়েছিলো। চতুর্দিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রক্ষীবাহিনী দ্বারা পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এতগুলো লোকের জন্যে কয়েকটা পায়খানা আর সামান্য কয়টা টিউবওয়েলের বন্দোবস্ত রাখা হয়েছিলো। ঔষধের কোন সরবরাহ ছিলো না। নামেমাত্র কিছু রেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। ঐ ক্যাম্পের অবস্থা এতই অমানবিক ছিলো যে, সেখানে একজন সাংবাদিক দেখতে গেলে, এক হতভাগ্য ছিন্নমূল ক্যাম্পবাসী বুড়ো বলেছিলো, 'আমাদেরকে খাইতে দেন, আর না হয় গুলি কইরা মারেন।'

শেখ মুজিব সুকৌশলে ঐসবের জন্যে তাঁর পার্টির লোকদেরকে এবং মন্ত্রীবর্গকে দোষারোপ করে যাচ্ছিলেন। জনগণও তাই করছিলো। জনগণ ভাবছিলো অন্ততঃ শেখ মুজিব তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। এম, আর, আখতার মুকুল, শেখ মুজিবের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মানুষ ছিলেন। মুকুল আমাকে একটা মজার গল্প শুনিয়েছিলেন। সময়টা ছিলো ১৯৭৫ সালের মার্চ মাস। শেখ মুজিব, বিরোধী দল জাসদ-এর কিছু নেতৃবর্গের সঙ্গে গোপনে সম্পর্কে রাখছিলেন। জাসদ সিদ্ধান্ত নিলো, ১৭ই মার্চ তারা এক বিরাট জনসভা করবে পল্টনে। সেখানে থেকে সরকারের বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বঙ্গভবনে আক্রমণ চালাবে। শেখ মুজিব গোপন সম্পর্কের মাধ্যমে তাদেরকে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসভবনের দিকে লেলিয়ে দিলেন। মন্ত্রী অবশ্য পরিবার-পরিজন নিয়ে কিছুদিনের জন্যে শহরের বাইরে ছিলো। উচ্ছৃঙ্খল জনতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ীতে আক্রমণ চালালো। রক্ষীবাহিনী সময়মতো গুলি চালিয়ে এগারোজনকে হত্যা করলো। এভাবে তিনি চমৎকারভাবে তার নিজের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ প্রতিহত করলেন। উল্লেখযোগ্য, সেদিন তার ৫৩তম জন্মবার্ষিকী ছিলো।

রক্তপাত ক্রমাগতভাবে বেড়েই চললো। মুজিব নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, রাতের অন্ধকারে বিরোধীদের আক্রমণে প্রায় ৪,০০০ আওয়ামী লীগ পার্টির কর্মী নিহত হয়েছিলো। এর মধ্যে পাঁচজন সংসদ সদস্যও ছিলো। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর জানিয়েছিলো যে, ঐ সকল হত্যাকান্ডের অধিকাংশের কারণই ছিলো আন্তঃদলীয় কলহ। খন্দকার মোশতাক আহমেদ জানালেন যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর নির্দেশে, রক্ষীবাহিনী যখন গভীর রাতে হানা দিয়ে বাড়ী থেকে জোর করে লোকজনকে ধরে নিয়ে যেতো, তখন তাদের স্ত্রী, মা-বোনের আর্ত-চিৎকারে পুরনো ঢাকার আকাশ ভারী হয়ে উঠতো। রক্ষীবাহিনীর নিয়ে যাওয়া ঐ লোকজন আর কোনদিন ফিরে আসতো না।

অব্যবস্থা আর দুর্নীতির কারণে দিন দিন দুর্যোগের মাত্রা কেবল বেড়েই চলেছিলো। এসবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, শেখ মুজিব বলেছিলেন যে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থতার কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন না। এ কারণে তিনি নয়জন মন্ত্রীকে তাঁর পরিষদ থেকে বাদ দিলেন। কিন্তু ক্ষুদ্র কর্মচারী আর দলীয় লোককে শাস্তি প্রদান করলেন। এবং চোরাচালানী আর মজুতদার পাকড়াও করার জন্যে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন। শেষের কাজটিই ছিলো বহু মারাত্মক ভুলের অন্যতম, যা তাঁর পতনকে তরান্বিত করেছিলো।

এতদিন ধরে সেনাবাহিনী দূরে বসে কেবল লক্ষ্য করেছিলো, বাঙ্গালী জাতির সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন কিভাবে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছিলো। এতদিনে তারা ঐ দুঃখজনক বাস্তবতার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। তারা তা করতে চায়নি। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রাজনীতিকদের একগুঁয়েমী থেকে অনিবার্য কারণেই দেশকে রক্ষা করাকে দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব বলে মনে করলো। এভাবেই সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে টেনে আনা হলো যার ফলশ্রুতিতে ঘনিয়ে এলো মুজিবের ধ্বংসের প্রহর।

প্রধানমন্ত্রীত্বের বিরাট দায়িত্বে থেকেও তাঁর ক্ষমতার মোহ কাটেনি। আরও বেশী ক্ষমতা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার পরিকল্পনায় মুজিব মত্ত হয়ে উঠলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ফ্রান্স/আমেরিকান কায়দায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রবর্তন করবেন, তিনি তাই করলেন এবং ভয়ানক পন্থায়।

প্রথমে, তিনি দেশব্যাপী 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করলেন ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪ইং তারিখে। জনগণকে সকল মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। তাঁর কোন কাজে যেন কোর্ট বাদ সাধতে না পারে, সেজন্যে তিনি কোর্টের সকল ক্ষমতা খর্ব করলেন। তারপর তিনি জাতীয় সংসদে তার সর্বময় ক্ষমতার পক্ষে সকল আইন পাস করিয়ে নিলেন। জাতীয় সংসদকে দিলেন কেবলই একটা উপদেষ্টার মর্যাদা আর তার হাতে 'সকল ক্ষমতার উৎস' হিসেবে বিরাজ করার বিষয়টি আইনসিদ্ধ করে নিলেন।

এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ সকল পরিবর্তনে রাবার স্ট্যাম্প প্রদানের কাজ শেষ করলো। বন্দী সংবাদপত্রের দল তাঁর অনুমোদনের জয়গানে তাল মিলালো। চাটুকারের দল খুশীর চিৎকারে ফেটে পড়লো। শেখ মুজিব তাঁর এ কর্মকে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যা দিলেন। তাঁর মতে, 'এ বিপ্লব শোষণ আর অন্যায় থেকে দুঃখী মানুষের মুক্তি বয়ে আনবে।' তিনি ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হলেন।' মাত্র তিন বছরের মধ্যে একজন মহান পার্লামেন্টারিয়ান প্রবল পরাক্রমশালী একনায়কে রূপান্তরিত হলেন। সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করে, সর্বসাধারণের সকল সমালোচনা আর বিরোধিতাও যেন নিজের উপর টেনে নিয়ে এলেন। এক্ষণে আর মন্ত্রী, সরকারী কর্মচারী আর দলীয় লোকদের উপর নিজের দোষ 'ট্রান্সফার' করার সুযোগ রইলো না। এত বড় একজন চতুর রাজনীতিবিদের জন্যে এটা ছিলো এক মারাত্মক ভুল।

১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে কয়েকজন যুব আর্মি অফিসার এমন এক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে যা, পরবর্তীতে শেখ মুজিবের হত্যাকান্ডকে সরাসরি প্রভাবান্বিত করেছিলো। ঢাকা লেডিজ ক্লাবে একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে মেজর ডালিম আর তার সুন্দরী সহধর্মিণীকে নিয়ে ঐ ঘটনার সূত্রপাত। শেখ মুজিবের ডান হাত এবং রেডক্রসের চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফার ভাই, মিসেস ডালিমের উপর কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করে। বাদানুবাদের এক পর্যায়ে গাজীর ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনী যোগ দেয় এবং দম্পতিটিকে বেইজ্জতি করে। এমন কি, ঐ ঠগিদের দল তাদেরকে (দম্পতি) 'কিডন্যাপ' করার প্রচেষ্টা চালায়। ঘটনা শুনে ডালিমের সহকর্মী আর্মি বন্ধুরা এর একটা দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বিলম্ব না করে তাদের সৈন্য-সামন্তের একটা দল সঙ্গে নিয়ে ওরা দু'টি ট্রাকে ভর্তি করে ঐ গুন্ডাবাহিনীর তালাশে বেরিয়ে পড়ে এবং সবশেষে গাজী গোলাম মোস্তফার বাংলো তছনছ করে তাদের অপারেশনের সমাপ্তি টানে।

উভয় পক্ষ থেকেই শেখ মুজিবের কাছে বিচার যায়। শেখ মুজিব একটি মিলিটারী

পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করে অফিসারদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার জন্যে বিচারের ব্যবস্থা করে। এতে ২২ জন যুবা অফিসারকে চাকুরীচ্যুত করা হয় কিংবা জোরপূর্বক অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়। এদের মধ্যে মেজর ডালিম, মেজর নূর আর মেজর হুদাও ছিলো। এতে করে যুবা অফিসারদের মধ্যে শেখ মুজিবের উপর একটা দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, যার পরিণাম হয়েছিল অত্যন্ত মারাত্মক।

কিন্তু ঐ সময়ে মুজিবের জীবনের উপর যে গুরুত্বপূর্ণ হুমকিটা ঝুলছিলো তা ঠিক সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে নয়। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা দিক থেকে তার পরিষ্কার আভাষ ভেসে আসছিলো।

ঘটনাচক্রে মাও পন্থী সিরাজ শিকাদার ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে চট্টগ্রামের কাছাকাছি একটা এলাকা থেকে শেষ পর্যন্ত পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হলেন।

জাকারিয়া চৌধুরীর মতে, তাকে পাহারা দিয়ে ঢাকায় নিয়ে আসা হলো শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করানোর জন্যে। শেখ মুজিব তাকে তাঁর আয়ত্তে আনতে চাইলেন। কিন্তু শিকদার কোন রকম আপোষ-রফায় রাজী না হলে, মুজিব পুলিশকে 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা' গ্রহণ করতে বলে দিলেন।

জাকারিয়া বললো, সিরাজ শিকদারকে হাতকড়া লাগিয়ে চোখ-বাঁধা অবস্থায় রমনা রেসকোর্সের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে আসা হয়। তারপর গভীর রাতে এক নির্জন রাস্তায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঐ সময়ে সরকারী প্রেসনোটে বলা হয় যে, 'পালানোর চেষ্টা কালে' সিরাজ শিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। শিকদারের বোন, জাকারিয়ার স্ত্রী শামীম জানায় যে, সিরাজের দেহের গুলির চিহ্ন পরিষ্কার প্রমাণ করে যে, স্টেনগান দিয়ে তার বুকে ছয়টি গুলি করে তাকে মারা হয়েছিলো। সিরাজ শিকদারকে, শেখ মুজিবের নির্দেশেই হত্যা করা হয়েছে বলে সারা শহরে রটে গেলো। ১৯ বছরের যুবতী শামীম, তাঁর ভাই-এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। সে আমাকে বলেছিলো, 'আমি সর্বহারা পার্টির কাছ থেকে একটা রিভলভার পেয়েছিলাম এবং এই হত্যাকারীকে হত্যা করার সুযোগের সন্ধান করছিলাম।' শামীম বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের একজন। গত বছরই কেবল সে তার ভাস্কর্যের জন্যে 'প্রেসিডেন্ট পুরস্কার' লাভ করে। তার ধারণা, সে নিশ্চয়ই মুজিবকে গুলি করার দূরত্বে পেয়ে যাবে।

শামীম মুজিবের সঙ্গে দেখা করার জন্য বহুবার আর্জি পেশ করেছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সে। তারপর সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে তার এক প্রদর্শনীতে শেখ মুজিবকে আমন্ত্রণ জানালো। মুজিব আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলেন। সে স্মৃতিচারণ করে বললো,

'আমি ভয়ানক বেপরোয়া হয়ে উঠছিলাম।' 'আমি শত চেষ্টা করেও তাঁকে আমার গুলির দূরত্বের ভেতরে আনতে পারলাম না।' ভাগ্যই মুজিবকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো। শামীম জাকারিয়ার প্রেমে পড়ে যায়। শেষে তাদের বিয়ে হলে স্বামীর সঙ্গে শামীম বিদেশ চলে যায়।

১৯৭৪ সালের জুলাই মাস। মেজর ফারুক ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার্স-এর ব্র্যাভো স্কোয়াড্রন নিয়ে ডেমরায় চলে আসে। শেখ মুজিবের নির্দেশক্রমে এক নাটকীয় 'পরিচ্ছন্ন অভিযান'-এর অংশ হিসেবে ফারুকের পোস্টিং হলো সেখানে। কয়েকদিনের মধ্যেই ফারুক ডাকাত দলের 'আড্ডাখানা' বলে পরিচিত নারায়ণগঞ্জ রোডের আশপাশের এলাকা একেবারে পরিচ্ছন্ন করে ফেলে। ঐ এলাকার ত্রাস সৃষ্টিকারী 'ডাকাত সর্দার' এক বিশ বছরের যুবক। নিজেকে সে একজন আওয়ামী লীগার বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। ফারুক তাকে গ্রেফতার করলে, সে পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করে যে, এ যাবত সে মাত্র ২১ (একুশ) জনকে নিজ হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় করে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। ফারুক পরে আমাকে বলেছিলো, 'আমি তাকে এ কাজ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে, সে তার 'ওস্তাদের' নির্দেশে তা করেছে বলে জানায়।' 'ঐ বদমায়েশের ওস্তাদ স্বয়ং শেখ মুজিব। সুতরাং তার কীইবা আমি করতে পারতাম?' যুবকের ঘটনাটি মেজরকে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দেয়। 'আওয়ামী লীগারদের যথেচ্ছা কর্মকাণ্ডে যে কোন রকমের 'এ্যাকশান' নিতে গেলেই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো। সেনাবাহিনী বিভিন্ন জায়গা থেকে চোরাচালান, মজুতদারী, হত্যা ইত্যাদির অভিযোগে শত শত লোককে গ্রেফতার করে। কিন্তু ঢাকা থেকে একটা টেলিফোনেই ঐ সকল লোকজন 'বেকসুর খালাস' হয়ে যেতো।

ফারুক জানালো, সে একটা লিখিত নির্দেশ পায়। ঐ নির্দেশে বলা হয় যে, সে কাউকে গ্রেফতার করলে, তার নিজ দায়িত্বেই তা করতে হবে। কোন অঘটন ঘটে গেলে, তার জন্যে তার রেজিমেন্টাল কমান্ডার কিংবা ব্রিগেড কমান্ডার কেউই দায়ী হবে না। ফারুক বললো, 'এর অর্থ ছিল এ রকম যে, আমাদেরকে অনাচার, দুর্নীতি দূর করতে হবে।' কিন্তু আওয়ামী লীগ দেখলেই থমকে দাঁড়াতে হবে। পুরো ব্যাপারটাই এক দুঃখজনক ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছিলো।

ঠিক ঐ সময়েই সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হলো—নক্সালদের মূল উৎপাটনের জন্যে। শেখ মুজিব নিজেই এই নির্দেশ প্রদান করেন। আসলে মুজিব চেয়েছিলেন, নক্সালদের নামে সিরাজ শিকদার আর কর্ণেল জিয়াউদ্দিনকে খতম করতে। ফারুক এ নির্দেশ পালনে উৎসাহী হতে পারলো না। সে ঐ ধরনের নির্দেশ পালন না করার সিদ্ধান্ত

নিলো। সে বললো, 'আমি মার্কসবাদীদের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিলাম না।' কিন্তু যে জিনিসটা আমাকে অনুপ্রাণিত করছিলো তা হচ্ছে যে, ঐ ছেলেরা তো দেশের জন্যে যথেষ্ট করেছে। আদর্শগতভাবে তারা হয়তো ভুল পথে যেতে পারে—কিন্তু তারাতো দেশের কোন ক্ষতি করেনি। সুতরাং যখনই ফারুক তাদের কাউকে ধরতে পারতো, চুপিচুপি সে নিজেই তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিতো।

একবার টঙ্গীতে মেজর নাসের তিন ব্যক্তিকে আটক করে। এরা তিনটি খুনের আসামী ছিলো। নব বিবাহিত এক দম্পতি তাদের গাড়ীতে টঙ্গী যাবার পথে মোজাম্মেল নামে এক দুর্ধর্ষ আওয়ামী লীগার ও তার সহকর্মীরা তাদের উপর হামলা চালায়। গাড়ীর ড্রাইভার আর আরোহীকে (স্বামী) খুন করে তারা মেয়েটির উপর ধর্ষণ চালায়। তিনদিন পর মেয়েটির রক্তাক্ত লাশ একটা পুলের কাছে রাস্তায় উপর পাওয়া যায়।

মেজরের হাতে ধৃত এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মোজাম্মেল, মেজর নাসেরকে তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলো। মোজাম্মেলের ভাষায়, 'ব্যাপারটিকে সরকারী পর্যায়ে নেয়ার ব্যবস্থা করবেন না। আজ হোক, কাল হোক, আমাকে আপনার ছেড়ে দিতেই হবে। সুতরাং টাকা নিয়ে ছেড়ে দিতে আপনার আপত্তি কেন?' নাসের এতে **ক্ষিপ্ত হয়ে** তাকে ফাঁসিতে ঝুলাবে মনে করে কোর্টে সোপর্দ করে। কিছুদিন পরই ঐ তিনটি নৃশংস খুনের আসামী মোজাম্মেলকে জনসম্মুখে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখে সকলেই বিস্মিত হয়ে যায়। সেনাবাহিনীতে ঘটনাটি আরও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এ কান্ডটি শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপেই সম্ভব হয়েছিলো।

ঐ ঘটনাটি ফারুক আর তার সহকর্মীদেরকে চমকিয়ে দেয়। টঙ্গী তাদের জীবন নদীর বাঁক ঘুরিয়ে দেয়। ফারুক বললো, 'আমরা এমন এক সমাজে বসবাস করছিলাম, যেখানে অপরাধীরা নেতৃত্বে দিচ্ছিলো। বাংলাদেশ যেন 'মাফিয়ার' কর্তৃত্বাধীনে চলে গেলো। আমরা সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠলাম। এখানে এমন এক সরকার কায়েম হয়েছিলো যে সরকার খুনের মতো জঘন্য কাজে শক্তি যোগাতো। আর এমন সব চরম কর্মকান্ড ঘটাতো যেগুলো থেকে ঐ সরকার, জনগণকে বাঁচানোর কথা ছিলো। তা আর চলতে দেয়া যাচ্ছিলো না। আমরা তাঁকে খতম করার সিদ্ধান্ত নিলাম।'

ঐ দিনই মেজর ফারুক শেখ মুজিবকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। সে স্মৃতিচারণ করে বললো, "আমি সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ক্যাপ্টেন শরফুল হোসেনকে বলেছিলাম, 'শরফুল' এভাবে বেঁচে থাকা একেবারেই অর্থহীন। চলো, আমরা শেখ মুজিবকে এক্ষুণি খতম করে দিই।"

ফারুক তার মনের কথা ব্যাখ্যা করে চললো, "তোমার কি মনে পড়ে, শেখ মুজিবের

ফিরে আসার খবর শুনে আমরা কিভাবে কান্নায় (খুশিতে) ভেঙ্গে পড়েছিলাম? তোমার কি মনে আছে, সমস্তটা দেশ, সবগুলো মানুষ খুশিতে পাগল হয়ে উঠেছিলো। এই মানুষটাকে প্রায় দেবতার আসনে বসানো হয়েছিলো।" ১৯৭২ সালে তিনি যদি আমাদেরকে বলতেন, 'ঠিক আছে, তোমরা আওয়ামী লীগারদেরকে কিংবা ব্রিগেড কমান্ডারদেরকে ঘিরে ফেলো। আর তাদেরকে বেঁধে নদীতে ফেলে দাও।' আমরা ঠিক তাই করতাম। কেন করতাম? কারণ, শেখ মুজিব তা করতে বলেছেন। কি জন্য করতে বলেছেন? এ প্রশ্নটি হয়তো কেউ করতো না। আমিও করতাম না। আমরা ভাবতাম, আমরা একটা দেশ পেয়েছি, একজন নেতা পেয়েছি। আমরা যে কোন কাজই করতে প্রস্তুত। কোন সমস্যাকেই আমাদের সমস্যা মনে হতো না। অথচ শেখ মুজিব জনগণের এ ধরনের অনুভূতিকে ধ্বংস করে দিয়ে শতাব্দীর সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ-এর জন্য দিলেন।

ফারুক বললো যে, টঙ্গীর ঐ ঘটনাটি তাকে বিদ্রোহী বানিয়েছিলো। সে বললো, 'এরপর থেকে প্রমোশন, কোর্স, ক্যারিয়ার ইত্যাদির প্রতি আমার আর কোন মোহ রইলো না। আমি কেবল একটা জিনিসই সারাক্ষণ ভাবতাম—কিভাবে 'এ সরকারের পতন ঘটানো যায়।'

এই সময়ে ফারুক তার ভায়রাভাই, মেজর খন্দকার আবদুর রশিদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত ছিল। মেজর রশিদ তখন বোম্বের নিকটবর্তী দেওলালীতে চৌদ্দ মাসের একটি গানারী স্টাফ কোর্সে অংশগ্রহণ করছিলো। রশিদের অবর্তমানে ফারুক অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলো। ফারুক তার নাম উল্লেখ করেছিলো—কর্ণেল আমিন আহম্মেদ, মেজর হাফিজ, মেজর সেলিম, মেজর নাসির, মেজর গাফফার, স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত প্রমুখ। তাদের সকলেরই পরিকল্পনা ছিলো দীর্ঘমেয়াদী। কিন্তু ফারুক খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলতে উদগ্রীব ছিলো। কিন্তু রাজনীতির জন্যে সে নিজেকে অনেক কাঁচা বলে মনে করলো। সে ভাবলো, তার অনেক কিছু জানা প্রয়োজন। সে জন্যে তার অনেক পড়াশুনা করা প্রয়োজন বলে সে ঠিক করলো।

১৯৭৪ সালে শরৎকালে ফারুক কয়েক ডজন বই পড়া শেষ করলো। ঐগুলির মধ্যে চেগুয়েভেরার ডায়েরী, চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর কিছু বই, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক সমস্যার উপর একটি থিসিস গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদী চিন্তাধারায় সে প্রভাবান্বিত হতে পারলো না। মার্কসবাদ বাংলাদেশের জন্যে কোন সমাধান দিতে পারবে বলে তার মনে হলো না। বাংলাদেশের অবস্থার সঙ্গে কোন বইয়েরই সে মিল খুঁজে পাচ্ছিলো না।

ঐ সময় সে ইন্দোনেশিয়ার শোকার্নো উৎখাতের পরিকল্পনার কিছু রচনা পড়ার

সুযোগ পায়। শোকার্নোর সঙ্গে মুজিব উৎখাতের পরিকল্পনার কিছু মিল খুঁজে পেয়ে ফারুক মুজিব হত্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সে স্মৃতিচারণ করে বললো, 'আমি আমাকে জিজ্ঞেস করলাম, যদি মুজিবকে শোকার্নোর মত গদিচ্যুত করে একটি প্রাসাদে আটকে রাখা হয়? বক্তব্যটার উপর আমি নিজে নিজেই অনেকক্ষণ বিতর্ক করলাম। পুরো সেনাবাহিনী কিংবা দেশের সব মানুষ যদি আমাদের সঙ্গে থাকতো তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতে পারতো। কিন্তু সংখ্যায় আমরা ছিলাম খুবই নগণ্য। আমরা যদি তাকে বন্দী করতাম, তাহলে তাঁর নামে অন্য একটা পাল্টা শক্তি আমাদেরকে সরিয়ে দিতো। আমি তাও জানতাম যে,তিনি ভারতের উপর সাংঘাতিকভাবে নির্ভরশীল। সব সময়ই একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছিল যে, কেউ ভারতীয়দেরকে শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে ডেকে নিয়ে আসতো কিংবা ভারতীয়রা মুজিবের উৎখাতের ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাতো, এমনকি তাকে সহায়তা করার জন্য তাদের সেনাবাহিনীকেই পাঠিয়ে দিতো। ঐ পরিস্থিতিতে তাকে মেরে ফেললেও কোন ফায়দা হতো না। কেননা, ইতিমধ্যেই দেশটা ভারতের অধীনে চলে যেতো।

ফারুক আরো বললো, 'আমার তখন মনে হয়েছিলো, শেখ মুজিব মারা গেলে, দেশের ভেতরে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না।' অন্ততঃ ভারতের পতাকা উড়িয়ে দেশের ভেতরে প্রবেশ করার কোন হেতু থাকবে না। এক অর্থে, শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর নিজ মৃত্যুর পরোয়ানাতেই যেন স্বাক্ষর দান করেছিলেন। আমরা তাকে শোকার্নোর মতো সরিয়ে রাখতে পারলাম না। আমার শুধু এটাই মনে হলো যে, এর কোন বিকল্প নেই। মুজিবকে মরতেই হবে।

মুজিব প্রায়ই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেড়াতে যেতেন। আর এই ভ্রমণের জন্যে তিনি হেলিকপ্টারকেই পছন্দ করতেন। ফারুক প্রথমে মুজিবকে হেলিকপ্টারে মারার পরিকল্পনা করেছিলো। স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত তখন ফ্লাইট কন্ট্রোল অফিসার। ফারুক লিয়াকতকে অনুরোধ করেছিলো যে, যখন মুজিবকে নিয়ে হেলিকপ্টার আকাশে উড়বে, তার আগেই পিস্তলসহ সে সঙ্গে থাকবে। তারপর রেডিও যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ে মুজিবকে গুলি করে মারা হবে এবং মুজিবের মৃতদেহ সুবিধেজনক একটা নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তারপর তারা গন্তব্যস্থলের দিকে যেতে থাকবে যেন কিছুই ঘটেনি। ইতিমধ্যে ফারুক এবং অন্যান্যরা নীচে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ফারুক নিজেও একজন শৌখিন পাইলট। মুজিবকে হত্যা করার জন্যে এটাই সবচেয়ে সুবিধেজনক পরিকল্পনা বলে তার কাছে মনে হলো। কিন্তু পরে এই পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়েছিলো। ইতিমধ্যেই ঢাকায় একটি গুজব বেশ রমরমা হয়ে উঠলো। শেখ মুজিব

সংবিধান কিছু রদবদল করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হবেন। এবং দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবেন। অন্যান্যদেরকে না জানিয়ে ফারুক নিজে নিজে একটা বিরাট 'অভিযান পরিকল্পনা' তৈরী করতে লাগলো। তখন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ১৯৭৪ সাল। মাত্র কিছুদিন আগে তারা মুজিবের হেলিকপ্টার হাইজ্যাক করার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে।

ফারুক সামরিক কায়দায় অগ্রসর হলো। প্রথমেই লক্ষ্যবস্তু সনাক্ত করে নিলো। অবশ্য, মুজিবই প্রথম লক্ষ্যবস্তু। তার জন্যে পরে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কিছু নাম সে ঐ তালিকায় সংযোজন করে নিলো। এদের মধ্যে ছিলেন—ফারুকের চাচা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ ও মনসুর আলী। অন্যদিকে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। যথেষ্ট অনুসন্ধান এবং তাদের উপর লক্ষ্য রাখার পর ফারুক ঐ তালিকা আরও কমিয়ে নিয়ে আসে। শত্রুর পাতায় সে মাত্র তিনজনের নাম লিখে রাখলো। মুজিব, তাঁর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি, আর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত। ওরা ছিলো শেখ মুজিবের সবচেয়ে কাছের এবং প্রভাবশালী লোক। ফারুকের শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো—এই তিনজনকেই মরতে হবে।

ঢাকার অভিজাত ধানমন্ডি এলাকাবাসীরা সাধারণতঃ রাত দশটায় আনন্দ-উল্লাস আর সম্ভোগে মেতে উঠে। তখন শীতকাল। প্রতিদিনই রাত দশটার কাছাকাছি সময়ে ময়মনসিংহ রোডের উপর একটি রিক্সা থেকে একজন বিষণ্ন চেহারার লোক বেরিয়ে আসতো। লেকের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে ৩২নং রোডের ভেতরে ঢুকে পড়তো। লোকটার গায়ে বুশ-শার্ট, পরনে লুঙ্গি আর পায়ে চপ্পল। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ঠান্ডা বাতাসে বিশ্রামরত ঐ এলাকার গৃহভৃত্যদের থেকে লোকটাকে খুব একটা আলাদা মনে হতো না। একটামাত্র পার্থক্য ছিলো এই যে, ওরা ছিলো প্রাণ বাঁচানোর কর্মে ব্যস্ত আর এই বিষণ্ন লোকটা ছিলো 'মৃত্যুর দূত।' বিষণ্ন মানুষের বেশে মেজর ফারুক রহমান 'দোযখের শিকারী কুকুরের' ন্যায় শেখ মুজিবের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।

ফারুক কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। সেজন্যে সে নিজেই শেখ মুজিবের গতিবিধি, তাঁর অভ্যাস, তাঁর কাজ, তাঁর খাবার জায়গা ইত্যাদি লক্ষ্য রাখছিলো। যাতে করে চূড়ান্ত মুহূর্তে সামান্য ভুলের প্রশ্নও না উঠে।

ফারুক যে আর্টিলারী ব্যবহার করার চিন্তা করেছিলো, তা নিয়ে সে বিরাট মুশকিল পড়ে গেলো। আর্টিলারী ব্যবহার করার 'কৌশলগত পরিকল্পনা মানচিত্র' তার কাছে

ছিলো না। একটা মাত্র ঐ ধরনের মানচিত্র ছিলো সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে। ঐ মানচিত্র চেয়ে নেয়া, এমনকি ঐটার উপর এক পলকের দৃষ্টি ফেলাও যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে। এই ভেবে ফারুক বাংলাদেশ পর্যটন ব্যুরো থেকে একটা 'গাইড বই' নিয়ে, তাতে রক্ষিত শহরের ছোট একটা মানচিত্রকে কেন্দ্র করে নিজের পায়ে হেঁটে পদক্ষেপ মেপে মেপে দূরত্ব নিরূপণ করলো এবং আর্টিলারীর পজিশন নিজ পরিকল্পনায় স্থির করে নিলো। এতসব পরিশ্রম আর দারুণ দুশ্চিন্তার মাঝে তার দিন কটছিলো। অন্ততঃ দৈনিক তিনটা ভ্যালিয়াম-৫ না খেয়ে সে ঘুমুতে পারছিলো না। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি ঠিকই তার সকল কৌশলগত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়ে গেলো। সে ক্যু-এর জন্যে তখন প্রস্তুত।

মেজর রশিদ তার গানারী স্টাফ কোর্স শেষ করে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া যাবার জন্যে আবেদন পেশ করে। ফারুক সঙ্গে সঙ্গেই রশিদকে লিখে পাঠালো, 'ঢাকায় কি ঘটছে তুমি জান না' এখনই তোমাকে আমার প্রয়োজন।

কোর্স শেষ করে রশিদ কাল বিলম্ব না করে মার্চের মাঝামাঝি ঢাকায় এসে পৌঁছালো। ফারুক রশিদকে তার পরিকল্পনা খুলে বললো। রশিদ তাতে তার সম্মতি জ্ঞাপন করলো। দুই বন্ধুতে মিলে শেখ মুজিবকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনায় ডুবে গেলো।

একটা প্রশ্ন আমার মাথায় হঠাৎ উঁকি দিয়ে উঠলো, তারা ক্ষমতা দখল করার পর দেশের শাসনভার কিভাবে ভাগাভাগি করবে। এ ব্যাপারে রশিদকে জিজ্ঞেস করলে সে জবার দিলো, 'যদি আমরা ক্ষমতায় যেতাম তাহলে, একজন অত্যন্ত ভালো সৈনিক হিসেবে ফারুক সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হতো'। এমনকি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও তার অধীনে রাখা হতো। আমি বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব ভার নিতাম।

'তাহলে শাসন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কে হতো?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। 'আমরা ঠিক ক্ষমতায় যাবার জন্যে এটা করিনি। তাছাড়া, আমরা তা করলেও ঠিক হতো না।' দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে রশিদ জবাব দিচ্ছিলেন।

'তার মানে দেশ চালানোর যোগ্যতা তোমাদের কারুরই ছিলো না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আসলে তা নয়, যথেষ্ট জনসমর্থনের দরকার ছিল আমাদের।'

দুই মেজর প্রকৃতপক্ষে, এমন একজন লোককে খুঁজছিলো যে, শেখ মুজিবের না করা কাজগুলো করতে সক্ষম হবে। এই লক্ষ্যে তারা দু'জনেই শেখ মুজিবের চেয়ে যোগ্যতর একজন লোকের সন্ধান করছিলো।

এ প্রসঙ্গে ফারুক জানালো। আমাদের প্রথম পছন্দ ছিলো জেনারেল জিয়া। কারণ

একমাত্র তাঁর উপর আমাদের মোটামুটি কিছুটা আস্থা ছিলো। এ ব্যাপারে অনেক জুনিয়র অফিসার জেনারেল জিয়ার সঙ্গে আলাপ করে দেখতে চাইলেও কেউ তাকে প্রস্তাব দিতে সাহস পায়নি। ফারুকই শেষ চেষ্টা করে দেখতে মনস্থ করলো।

জেনারেল জিয়া ছিলেন ফারুকের দশ বৎসরের সিনিয়র। পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর প্রশিক্ষক থাকাকালীন ফারুক তাকে দেখেছে। যথেষ্ট সুখ্যাতির অধিকারী জিয়া সেনাবাহিনীতেও খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা ছিলো সকলেরই। ১৯৬৫ সালে তিনি দ্বিতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টে কমিশনপ্রাপ্ত হন। পরে তাকে ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সরিয়ে দেয়া হয়। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে তিনি কাজ করেছেন পাঁচ বছর। ১৯৬৬ সালে বেঙ্গল রেজিমেন্টে ফিরে এসে, রাইনের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতেও জিয়া তিন মাস কাজ করেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাঙ্গালীদের উপর চড়াও হলে, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করে জেনারেল জিয়া প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। পরে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন 'জেড' ফোর্স গঠন করে আরো বেশী খ্যাতির অধিকারী হন। সে কারণেই দেশ স্বাধীন হবার পর তাঁর দ্রুত পদোন্নতি ঘটে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীতে কর্ণেল, ১৯৭৩-এর মাঝামাঝি ব্রিগেডিয়ার এবং একই বছর অক্টোবর তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন।

ফারুক বলে, 'ঐ সময় জেনারেল জিয়ার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধাবোধ ছিলো। আমার ইচ্ছে ছিলো, সেনাবাহিনীর সহায়তায় তাকে দেশের শাসনভার তুলে নেয়ার অনুরোধ জানাবো।'

দেশের এই দুঃসময়ে জিয়ার মতো একজন নেতার দরকার বলে ফারুকের মনে হলো। তাই সে বহু চেষ্টায় জিয়ার সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করে নিলো।

ফারুকের ভাষায়, 'আমি সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান এবং একজন মেজর জেনারেল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলাম।' আমি যদি তাকে সোজাসুজি বলতাম, 'আমরা দেশের প্রেসিডেন্টকে উৎখাত করতে চাই, তাহলে হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে তাঁর পাহারাদার দিয়ে গ্রেফতার করে জেলে পুরতেন। আমাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ঐ ব্যাপারটির দিকে আসতে হয়েছিলো।

ফারুক বলে চললোঃ প্রকৃতপক্ষে আমরা দেশের দুর্নীতি, খুন-রাহাজানি ইত্যাদি দিয়ে আলাপ করতে করতে ঐ পর্যন্ত পৌছালাম। আমি বললাম, দেশে একটা পরিবর্তন প্রয়োজন। জিয়া বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলি।" আমরা আপনার সমর্থন ও নেতৃত্ব কামনা করি।

ফারুকের মতে, জেনারেল জিয়ার উত্তর ছিলোঃ 'আমি দুঃখিত। আমি এ ধরনের

কাজে নিজেকে জড়াতে চাই না। তোমরা জুনিয়র অফিসাররা যদি কিছু একটা করতে চাও, তাহলে তোমাদের নিজেদেরই তা করা উচিত। আমাকে এ সবের মধ্যে টেনো না।'

১৯৭৬ সালের জুলাই মাস। লন্ডনে মুজিব হত্যার উপর একটা টিভি অনুষ্ঠান করছিলাম। ফারুকের বলা কথা নিয়ে জেনারেল জিয়াকে সামনাসামনি জিজ্ঞেস করলাম। জিয়া তা অস্বীকারও করলেন না—আবার স্বীকারও করলেন না। পরিবর্তে তিনি কোন প্রশ্নের জবাব দেয়া থেকে বিরত রইলেন। আমি পুনরায় জবাব পাবার প্রচেষ্টা চালালে, তিনি আমাকে বহু বছর ধরে দেশের বাইরে রাখার ব্যবস্থা করলেন।

১৯৭৫ সালের মার্চ মাসেই ফারুক তার পরিকল্পনা কার্যকর করবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো। এ সিদ্ধান্তের পেছনে তেমন কোন বিশেষ কারণ জড়িত ছিলো না। জেনারেল জিয়াকে ঐ অভ্যুত্থানে শরীক করতে না পারায় ফারুক ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছিলো। সে পরে স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকতকে অনুরোধ জানায়, যাতে সে কয়েকটি মিগ-এর সাহায্যে মুজিবের বাড়ীকে সন্ত্রস্ত করে রাখে। ফারুক বললো, 'আমি বাড়ীটা ঘিরে রাখবো আর তুমি তোমার মিগ দিয়ে পুরো ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।' লিয়াকত অনেকটা নিরাসক্তভাবে বলেছিলো, 'ঠিক আছে, তাই হবে।' ফারুক স্থির করলো সে মার্চের তিরিশ তারিখেই অভিযান পরিচালনা করবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপের জন্যে তৈরী হলো ফারুক। সে ভেবেছিলো যে, সবাই তার দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে যোগ দেবে। কিন্তু না। সে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, সে ছাড়া বাকী সবাই নিষ্ক্রিয়। ফারুক বললো, আমি আমার জীবনের প্রতি সবচেয়ে বেশী বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। মেজর হাফিজ, কর্ণেল আমিন এবং আহমেদ চৌধুরীর মতো আরো অনেকে শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিলো। ওরা সবাই খুব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলো, রাতভর আলোচনা করে 'এটা করবো ওটা করবো' ইত্যাদি মন্তব্য করলো। কিন্তু যখন কাজের সত্যিকার সময় এলো, কেউই আর এগিয়ে এলো না। ঐ দিন অবশ্য শেখ মুজিবও দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। সেদিন তার পিতা মারা যান।

ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা ফারুককে মুজিব হত্যার ব্যাপারে অধিকতর সংকল্পবদ্ধ করে তুললো। শেখ মুজিবকে হত্যার পরিকল্পনা এখন থেকে ফারুকের নিজস্ব বিষয়ে রূপ নিলো। সেও বুঝে নিলো যে, কাজটা তাকে একাই করতে হবে। কিন্তু প্রথমদিকে তার উপর থেকে সন্দেহটা কাটিয়ে উঠতে তাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছিলো। ফারুক বললো, 'যাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ হচ্ছিলো, তাদের সবাই বলতে লাগলাম ব্যাপারটা ভুলে যেতে।' তারা যেন ভাবে আমি ঠান্ডা হয়ে গেছি। সে জন্যে এ প্রসঙ্গে যাবতীয় আলাপ-আলোচনা আমি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে যে আমি আর কিছু ভাবছি না এটা

লোকজনকে বুঝাবার জন্যে ফরিদাকে নিয়ে প্রতিটা সামাজিক অনুষ্ঠানে, বনভোজনে এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে যেতে শুরু করলাম।

বাংলাদেশের অবস্থা টল-টলায়মান। অথচ মুহূর্তের জন্যে হলেও ফারুক দম্পতি যেন ওসবের কোন খবরই রাখে না। ওরা যেন ঝামেলাবিহীন, এক সুখী দম্পতি। ইতিমধ্যেই ফারুক গোপনে মুজিবের চতুর্দিকে মাকড়সার জাল বোনা অব্যাহত রেখেছিলো।

এই কৌশলগত পরিকল্পনার জন্যে তার ৮০০ লোকের প্রয়োজন ছিলো। কারণ, রক্ষীবাহিনীকে ঠেকানো সহ অন্যান্য পথ বন্ধ করার জন্যে এই পরিমাণ সৈন্য তাকে সঙ্গে রাখতেই হবে। ফারুক অবশ্য চায়নি অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত হোক। কিন্তু কিছু যাচাই-বাছাই করে সে ভেবে দেখলো অন্ততঃ ৩০০ লোক হলেও উদ্দেশ্য সাধনে তেমন কোন বেগ পেতে হবে না। ঐ পরিমাণ সৈন্য তার নিজের অধীনেই বর্তমান ছিলো। ১৯৭২ সালে ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার্স-এর সংখ্যা সে নিজেই বাড়িয়েছিলো। পরে, সে ঐ সৈন্যদের মধ্য থেকে বাছাই করে কিছুসংখ্যক সৈন্য কমান্ডো স্টাইলে ট্রেনিং প্রদান করে। সেগুলোকে সে 'হান্টার কিলার টিম' বলে ডাকতো। ওরা ছিল অত্যন্ত বিশ্বাসী, স্থায়ী এবং নীরব ধরনের। ফারুকের এ ধরনের ১৫০টি টিম ছিলো, যাদের উপর সে সব সময় নিশ্চিতভাবে নির্ভর করতে পারতো। এই সময়ে মেজর রশিদ এক বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হলো। ভারতের গানারী স্টাফ কোর্স সমাপনান্তে সঙ্গত কারণেই তাকে যশোহরের গানারী স্কুল বদলি করে দেয়া হলো। এতে করে সৈন্যদের উপর তার কমান্ড কার্যকরী না হবার পন্থায় পড়ে গেলো সে। তবু, শেষনাগাদ এক মাসের ছুটি নিয়ে রশিদ তাদের পরিকল্পনার উপর কাজ করার জন্যে ঢাকায় রয়ে গেলো।

সে সেনানিবাসে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় যোগ দিলো। রশিদ এক পর্যায়ে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার, কর্ণেল শাফাত জামিলের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ তুলে দিলো। বাংলাদেশে কি পরিমাণ নৈরাজ্য বিরাজ করছিলো তা নিয়ে কথা হতে হতে শাফাত জামিল রশিদকে জিজ্ঞেস করে বসলোঃ 'হ্যাঁ, তা তো বুঝলাম, আমরা কি করবো?' রশিদ মুহূর্তের মধ্যে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে নিয়ে কর্ণেলকে বললো, 'না স্যার, আমি তা বলছি না।' আপনার নির্দেশ ছাড়া কি আমি কিছু করতে পারবো। আর যাই হোক, 'আপনি আমার ব্রিগেড কমান্ডার।' রশিদের টনক নড়লো। সে তৎক্ষণাৎ ফারুককে সতর্ক করে দিয়ে বললো, 'সাবধান, কোন অফিসারকে বিশ্বাস করো না। এখানে এমন অনেকে রয়েছে যারা দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। তখন আমাদের বিপদ হয়ে যাবে।'

ঐ সময়ে রশিদ কর্ণেল জামিলের সঙ্গে তার বদলির ব্যাপারে আলাপ করছিলো।

কর্ণেল নিজ থেকেই রশিদকে ঢাকায় থেকে যেতে বলেছিলো। কিন্তু রশিদ তা বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু ঠিকই কর্ণেল শাফাত জামিলের অপ্রত্যাশিত সহায়তায় মেজর রশিদ আবার ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারীর কমান্ডিং অফিসার হিসেবে বদলি হয়ে এলো।

ফারুক অত্যন্ত আনন্দিত হলো। দুই ভায়রাভাই মিলে অন্যান্যদের সাহায্য ছাড়াই তাদের পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে পারবে। ২য় ফিল্ড আর্টিলারীর ছিল ৬টি ইতালীয় হাউইটজার, ১২টি যুগোশ্লাভীয় ১০৫ মিঃ মিঃ হাউইটজার এবং ৬০০ সৈন্য। ফারুকের ছিল ৩০টি টি-৫৪ ট্যাংক এবং ৮০০ সৈন্য। রশিদের আর্টিলারী এবং তার ল্যান্সার দিয়ে রক্ষীবাহিনী এবং শেখ মুজিবকে সাহায্যকারী যে কোন পদাতিক বাহিনীকে প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে ফারুকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো। এখন কেবল একটা সমস্যাই রয়ে গেলো। তা হলো কারো মনে সন্দেহ না জাগিয়ে এই দুটো শক্তিকে একত্রিত করতে হবে। রশিদ এর সমাধান নিয়ে এলো।

সেনাবাহিনীর সদর দফতরের নিয়ম অনুযায়ী বেঙ্গল ল্যান্সার্স মাসে দু'বার ট্রেনিং এক্সারসাইজ পরিচালনা করতে পারে। এই এক্সারসাইজের উদ্দেশ্য ছিল—অন্ধকারে সৈন্যদের নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র বেছে নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত হবার কৌশল সম্বন্ধে সম্যক অবগত করা। ছয়মাস ধরে তাদের এই দুই বাহিনীর রাত্রিকালীন মহড়ায় মহল্লার সকলেরই ট্যাংক ও অন্যান্য ভারী অস্ত্রের গুলির আওয়াজ সহ্য হয়ে যাবে। কাজেই বেঙ্গল ল্যান্সার রাতের অন্ধকারে অগ্রসর হলে কেউ সেটাকে সন্দেহের চোখে দেখার অবকাশ আর থাকবে না। মেজর রশিদ তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পেশ করে যে, তার আর্টিলারী ও বেঙ্গল ল্যান্সারের একত্রে ট্রেনিং-এর সুযোগ করে দেয়া প্রয়োজন। এতে করে দু'পক্ষই অনেক কিছু শিখতে পারবে। সেনাসদর এই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত মনে করে অনুমতি দিলো। ফলে, ফারুকের ট্যাংক আর রশিদের আর্টিলারী একত্রিত হলো।

এই সময় ফারুক তার ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্যের উপর স্বর্গীয় মঞ্জুরী সিদ্ধান্ত নিলো। ফারুক তাই চট্টগ্রামের হালিশহরে এক বিহারী পীরের নিকট উপস্থিত হলো। মুজিব হত্যার ব্যাপারে তার ভূমিকাও কম ছিলো না।

চট্টলার ঐ পাহাড়ী পীরের নাম আন্ধা হাফিজ। আন্ধা হাফিজ জন্মলগ্ন থেকেই অন্ধ। তিনি তাঁর ধর্মপরায়ণতা আর অতীন্দ্রিয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার দুর্লভ ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তার বহু ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল না প্রমাণের কারণে তার ভক্ত অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছিলো। ফারুকের শ্বশুর পক্ষও

অন্ধ পীরের ভক্ত। ফারুক তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সিদ্ধান্ত নিলো। সুযোগও মিলে গেলো অচিরেই। ঐ সময়ে বেঙ্গল ল্যান্সারের জন্যে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর অদূরে দু'দিনের 'রেঞ্জ ফায়ারিং'-এর সিডিউল পড়লো। ফারুক ২রা এপ্রিলেই আন্ধা হাফিজের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলো।

ফারুকের হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে অন্ধ পীর অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলেন। ফারুক কি যেন একটা কাঁপুনী তার হাতে অনুভব করতে পারছিলো। ফারুকের মনের কথা পীরকে বলার আগেই আন্ধা হাফিজ বলে উঠলেন, 'আমি জানি, তুমি ভয়ঙ্কর একটা কিছু করতে যাচ্ছ। করতে চাও কর, তবে মনে রেখো আমি তোমাকে যে নীতি অনুসরণ করতে বলছি, তা যদি তুমি পালন না কর, তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।' তিনি তারপর, ফারুককে বিশ্বস্ততার সঙ্গে অবশ্যই তিনটা নীতি মেনে চলতে নির্দেশ দিলেনঃ (১) আল্লাহ আর ইসলামের জন্যে ছাড়া ব্যক্তিগত লাভের জন্যে কিছু করবে না। (২) শক্তি অর্জন কর। (৩) সঠিক সময় বেছে নাও। তিনি মেজরকে আরও তিনমাস অপেক্ষা করার পরামর্শ দিলেন।

ফারুক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলো। স্বর্গীয় ইঙ্গিতের সঙ্গে যেন তার ধারণা অলৌকিকভাবে মিলে গেলো। আন্ধা হাফিজের নির্দেশিত তিনমাস অপেক্ষার পর যে সময় আসছে তা ফারুকের নিজের নির্ধারিত 'অভ্যুত্থানের উৎকৃষ্ট সময় ' এর সঙ্গে টায়টায় মিলে গেলো। তার মন বলছিলো, ঐ সময়ে কাজ করতে গিয়ে সে ব্যর্থ হতে পারে না।

৭ই জুন, ১৯৭৫ সাল। শেখ মুজিব কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করলেন। তিনি মনে করলেন দেশের প্রশাসনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট বিজয় লাভ করেছেন। এই ব্যবস্থা বাস্তবে বাংলাদেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করে এবং দেশের রাজনৈতিক আর প্রশাসনিক সর্বময় ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ন্যস্ত হয়। তিনি ১৯৭২ সালে অভিষিক্ত প্রধানমন্ত্রিত্বের ক্ষমতার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান হয়েছিলেন একথা ঠিক জোর দিয়ে বলা যায় না। তখনও অবশ্য তার প্রতিটি কথাই আইন আর প্রতিটি ইচ্ছাই নির্দেশে পরিণত হয়েছিলো। অদ্ভুত ঘটনাবহুল তাঁর সাড়ে তিন বছর শাসনমলে জনপ্রিয়তা দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছিল। যার কারণে তিনি অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে একনায়কতন্ত্র কায়েমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

ফাঁকা বুলি উড়িয়ে তিনি এবং তাঁর শাসনযন্ত্র—এ পরিবর্তনকে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করলেন। প্রকৃতপক্ষে, এটা ছিলো এক ধরনের "প্রাসাদ ষড়যন্ত্র" যা দেশ থেকে মূল্যবোধ, গণতন্ত্র, ন্যায় বিচার আর গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গলাটিপে হত্যা করেছিলো।

মুজিব শুরু করলেন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় তাঁর নিজের মাঝে ক্ষমতার ফোয়ারা সৃষ্টির কাজ। ঐ বছরই জানুয়ারী মাসে জাতীয় সংসদে পাস হয়ে গেলো সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী। এই সংশোধনীর বলে মুজিব পার্লামেন্টের উপর ক্ষমতাসীন হলেন আর দেশে একনায়কতন্ত্রই কেবল নাজিল করলেন না, তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে একটি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েমেরও ক্ষমতা পেয়ে গেলেন।

শেখ মুজিবের উক্ত ব্যবস্থার ফলে সকল বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের দরজা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেলো। বাকশালের সদস্য না হয়ে কারও পক্ষে কোন ধরনের রাজনীতি করার আর সুযোগ রইলো না।

১৯৭৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে বাকশাল-এর শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবার কথা ছিলো। ইতিমধ্যেই শেখ মুজিব একেবারে সর্বনিম্ন স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত দলীয় কাঠামো এবং বিভিন্ন স্তরের নির্বাহী ও কার্যকরী কমিটিসমূহ গঠনের কাজও সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। শেখ মুজিব নিজেই প্রেসিডেন্ট ও দলীয় চেয়ারম্যান রয়ে গেলেন। রাজনৈতিক দিকের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাঁর নিকটতম লোকদের নিয়ে একটি ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি গঠন করেন। সেখানে ক্ষমতাশালী তিনজন পার্টি সেক্রেটারির মধ্যে শেখ ফজলুল হক মনিও ছিলো।

তারপরের পর্যায়ে ছিলো ১১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কমিটি। তার নীচে ছিলো ২১ থেকে ৩২ সদস্য বিশিষ্ট ৫টি কমিটি যা শ্রমিক, কৃষক, যুবক, ছাত্র আর মহিলাদের নিয়ে কাজ করার কথা। সবগুলি কমিটির প্রত্যেকটি সদস্যই স্বয়ং শেখ মুজিব কর্তৃক নিয়োজিত। এইভাবে ৬১টা জেলার জন্যেও ৬১ জন গভর্ণর মুজিব নিয়োগ করলেন। জেলা গভর্ণরগণ বাংলাদেশ রাইফেলস, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ এবং ঐ এলাকায় অবস্থিত সেনাবাহিনী ইউনিটের নিয়ন্ত্রণ করার কথা ছিলো।

এ সবই প্রমাণ করে যে বাকশাল ছিলো শেখ মুজিবের আর এক রাজনৈতিক খেলার চমক—এতে দেশ পুনর্গঠনের কোন উদ্দেশ্যই নিহিত ছিলো না। 'বাকশাল' সৃষ্টিই হয়েছিলো মুজিবের সকল বিরোধিতার অবসান ঘটাতে। হচ্ছিলোও তাই। ধারালো নখর সমৃদ্ধ প্রসারিত বাঘের ভয়াল থাবার মতো বাকশাল এদেশের প্রতিটি মানুষের মাথার উপর এক বিভীষিকার মতো বিরাজ করছিলো। সেই বাঘের ঘাড়ে চড়ে বসেছিলেন শেখ মুজিব। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর ঐ ভয়ঙ্কর ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ১৯৭৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পূর্ণ হতো। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, গণতন্ত্রের সমূলে ধ্বংস সাধন আর এক ব্যক্তির শাসনের বিরুদ্ধেও কোন রকম গুরুত্বপূর্ণ গণপ্রতিবাদ-এর সূচনা হলো না। চতুর্দিকে তাঁর চাটুকারের দল এই 'দ্বিতীয় বিপ্লবকে' স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির এক বিরাট পদক্ষেপ

বলে মাঠে-ময়দানে চমৎকার বক্তৃতা দিতে থাকে। এমনকি পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দও মন্তব্য করে, 'বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাকশালের সদস্য হয়ে কাজ করার সুযোগ পেলে, আমরা গর্বিত বোধ করবো।' শেখ মুজিব এতে খুশী না হয়ে পারেন কি করে?

২১শে জুলাই ১৯৭৫ সাল। ঢাকায় আয়োজিত এক সভায় শেখ মুজিব মনোনীত জেলা গভর্ণরদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন।

স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি তাদের উদ্দেশ্যে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'আজ বাকশাল সদস্যদের সতর্ক থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশের জনগণ খুব বেশী প্রতিক্রিয়াশীল। তারা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। এই কথা তোমাদের মনে রাখা ভালো। তোমরা সারা জীবনভর নিবেদিত প্রাণ কাজ করে যাবে। যদি তোমরা একটা ভুল কর, তাহলে তোমরা বাংলাদেশের মাটি থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এইটা বাংলাদেশের আইন।' দুর্ভাগ্যক্রমে, শেখ মুজিব নিজেই তাঁর সতর্কবাণী কর্ণপাত করলেন না। এরই মধ্যে তাঁর ভ্রান্তির পাহাড় সৃষ্টি হয়ে গেলো।

৬

মোশতাক রাজী

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম (মোশতাককে), দেশের পরিস্থিতিতে এ কেউ যদি শেখ মুজিবকে জোরপূর্বক সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে, তা কি ঠিক হবে? তিনি বলেছিলেনঃ 'সম্ভবতঃ দেশের মঙ্গলের জন্যে এটি একটি ভাল কাজ হবে।'

–মেজর আবদুর রশিদ

৩রা জুলাই, ১৯৭৫ সাল।

ফারুক তার পকেট ডায়েরীর ঐ দিনের পাতায় লাল কালির বড় বড় হরফে লিখে রেখেছিলো—কাজ শুরু। সে আমাকে বলেছিলো, "এরই মধ্যে আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম, মুজিবের মৃত্যু অনিবার্য। আজ হোক, কাল হোক কিংবা পরশু। এটা কোন ব্যাপারই না। আমার রণকৌশলের পরিকল্পনা তৈরী সম্পন্ন। আমার সৈন্য-সামন্তও প্রস্তুত।"

সে বলে চললো, "যে-কোন পরিস্থিতিতেই হোক, আমি ৩রা জুলাই থেকেই চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত ছিলাম। আমার জীবন থেকে অতীত, বর্তমান সবই আমি মুছে ফেলেছিলাম। আমার সামনে তখন একটাই উদ্দেশ্য, মুজিবকে খতম করতেই হবে। এবং সে উদ্দেশ্য সাধনে আমি কোনক্রমেই ১৫ই আগস্টের বেশী দেরি করতে পারবো না বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম।"

ফারুকের ডায়েরী তাকে স্মরণ করিয়ে দিলো যে, ১৫ই আগস্ট রাতে বেঙ্গল ল্যান্সার্স এবং দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারীর পরবর্তী ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হবে। দিনটি ছিলো শুক্রবার। দিনটি ফারুকের জন্যে অত্যন্ত তাৎপর্যমন্ডিত। কারণ তার জন্ম হয়েছিলো শুক্রবারে। তার জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে ঐ দিনে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যাবার দিনটি ছিলো শুক্রবার। ফরিদার সঙ্গে তার বিয়েও হয়েছিল শুক্রবারে। ধর্মীয় দিক থেকেও দিনটি ছিলো গুরুত্ববহ। কারণ, শুক্রবার মুসলমানদের জন্যে একটি পবিত্র দিন। ফারুক ভাবলো, শুক্রবার এবারও তার জন্যে শুভ হবে। কারণ তার ধারণা,

সে ইসলাম আর দেশের স্বার্থে এ কাজ করতে যাচ্ছে। সে রশিদকে জানায়নি যে, কাজটি সে শুক্রবারেই করতে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে যেন আর পিছিয়ে আসতে না হয়, সেটাই হয়তো সে নিশ্চিত করতে চাচ্ছিলো। ১লা সেপ্টেম্বর 'বাকশাল' পদ্ধতি কার্যকরী হবার কথা। ওরা দু'জনে সম্মিলিতভাবে স্থির করে নিয়েছিলো যে, আঘাতটা তার আগেই হানতে হবে। ঐ তারিখের আগেই রক্ষীবাহিনী আর সেনাবাহিনী ইউনিট নিয়ে জেলা গভর্ণরগণ ৬১টি জেলার যার যার অবস্থান সুদৃঢ় করে ফেলবে। ঐ অবস্থায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা মোটেই সহজ হবে না বলে রশিদ মনে করলো।

রশিদ ফারুকের পরিকল্পিত রণকৌশলের ব্যাপারে অবহিত ছিলো না। রাজনীতির প্রতি রশিদের যথেষ্ট ঘৃণাবোধ জন্মেছিলো। জেনারেল জিয়াকে দলে ভিড়াতে না পেরে ফারুক সম্ভাব্য অন্যান্য রাজনীতিকদের মধ্য থেকে শেখ মুজিবের উত্তরসুরি বাছাই করার দায়িত্ব দিলো রশিদের উপর। এ ব্যাপারে মেজর রশিদ তার মেধার পরিচয় দিয়েছিলো।

রশিদ ভাল করেই জানতো যে, মুজিবের হত্যার পর একটা বিরাটাকারের স্বতঃস্ফূর্ত আক্রমণাত্মক বিরোধিতার সৃষ্টি হতে পারে। ঐ বিরোধিতা ঠেকানোর মত যথেষ্ট শক্তি তাদের ছিলো না। সুতরাং রশিদ কেবল একজন যোগ্যতর রাজনৈতিক নেতাকেই খুঁজছিলো না, সে মুজিবের জায়গায় এমন একজনকে বসানোর চিন্তা করছিলো যার উপস্থিতি ঐ বিরোধিতার ঝড়কেও অনেকাংশে স্তিমিত করতে সক্ষম হবে।

রশিদ ধারণা করছিলো যে, চারটা ভিন্ন দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ঐ চারটা বিপত্তিই এড়িয়ে যেতে হবে। তার মতে, এর প্রথমটা ছিলো আওয়ামী লীগ; সারা দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের ছাত্র ও তরুণ সমর্থকদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশের যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ছিলো। ওরা এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়টি ছিলো রক্ষীবাহিনী। শেখ মুজিবের ২৫,০০০ আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সৈনিক সম্বলিত ঝঞ্ঝাবাহিনী আসলেই মুজিবের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলো। এই অংশটির মধ্যে হয় ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না হয় তারা ১৯৭১-এর মতো ভারতীয় হস্তক্ষেপ কামনা করবে। তৃতীয় বিপত্তিটি যা তার মনে এসেছিলো তা হলো, মুজিব নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ পরায়ণ লোকেরা আওয়ামী লীগারদের নির্বিচারে হত্যা শুরু করতে পারে। সে ক্ষেত্রে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

আমরা আর একটা শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি করতে চাইনি, রশিদ বলছিলো। 'তাহলে ১৯৭১-এর মতো আরেকটি নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারতো। আর তাতে করে ভারত এ ভূখন্ডে ঢুকে পড়তে পারতো। ওটাতে সম্পূর্ণভাবে আমাদেরই পরাজয় হতো। সুতরাং রশিদ বলছিলো, "আমাদের চতুর্থ বিবেচ্য বিষয় ছিলো, ভারতীয় হস্তক্ষেপের সকল সম্ভাবনা ছিন্ন করে দেয়া।"

রশিদ চাচ্ছিলো এমন একজন লোককে যার উপস্থিতি জনগণকে কি অবস্থায় দাঁড়

করিয়ে দেবে। দেখি এর পর কি ঘটে। "একবার যদি জনগণ পরবর্তী ঘটনাটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, তাহলে আমাদের আর কোন ভয় নেই।" রশিদ বললো।

রশিদ সিদ্ধান্ত নিলো, সে আওয়ামী লীগ থেকেই শেখ মুজিবের উত্তরসুরি বাছাই করে নেবে। তার মতে, এতে করে মুজিববাদী দল আর রক্ষীবাহিনী বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। রশিদের ভাষায়, 'শেখ মুজিবের জায়গায় অন্য একজন আওয়ামী লীগারকে দেখে জনগণের মনে প্রতিশোধ নেয়ার সাহস ক্ষণিকের জন্যে হলেও দমে যাবে। কোন শরণার্থীরও সৃষ্টি হবে না। আর ভারতীয় হস্তক্ষেপেরও কোন সম্ভাবনা থাকবে না।'

অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় আর একজন ঘৃণিত আওয়ামী লীগারকে শেখ মুজিবের জায়গায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত রশিদের জন্যে খুব একটা কঠিন কিছু ছিলো না। কারণ, সে মনে মনে স্থির করে রেখেছিলো যে, এটা একটা নিতান্তই সাময়িক পদক্ষেপ। রশিদের ভাষায়, 'আমরা জানতাম, ওরা (মুজিবের সাথীবৃন্দ) কি জিনিস।' 'আমরা জানতাম, ওরা সব ধরনের ভন্ডামি, কুৎসিত কর্মকান্ড ইত্যাদি করবেই। তারা এগুলো থেকে কখনই দূরে থাকতে পারে না। কিন্তু এরই মধ্যে যদি আমরা আমাদের অবস্থা দৃঢ়তর করতে পারি, তাহলে যে-কোন মুহূর্তে আমরা তাদেরকে ছাঁটাই করে দিতে পারব।' ফারুক রশিদকে পূর্ব থেকেই পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলো, 'মুজিব হত্যার পর যদি কোন আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া না যায় তাহলে আমি কাউকেই সহ্য করবো না।'

বড় বড় বুলি আওড়ালেও দুই মেজরের পক্ষে শেখ মুজিবের বিকল্প খুঁজে বের করা সহজ ছিলো না। রাষ্ট্রনায়কত্ব আর সততার কথাতো রইলোই। তাছাড়া, শেখ মুজিব যা দিতে পারেননি, তা দিতে পারবে এমন লোক রশিদের নজরে পড়ছিলো না। তবু এরই মধ্য থেকে শেখ মুজিবের উত্তরসুরি হিসেবে শেষ পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক আহমেদকেই সে বাছাই করেছিলো। রশিদের এই পছন্দের পেছনে কারণটি ছিলো এই যে, তাকে নিতান্তই একটা পুতুলের মতো যথেচ্ছা ব্যবহার করা যাবে এবং তাদের সুবিধেমত যে-কোন মুহূর্তে সরিয়ে দেয়াও সহজ হবে। দেখতে দেখতে চলে এলো ১৯৭৫-এর বসন্তকাল। বাংলাদেশে সবুজের সমারোহ আর বিচিত্র ফুলের বাহার নিয়ে আসে বসন্তকাল। দুঃখজনকভাবে ঐ বসন্তই যেন বেদনার বসন্তে পরিণত হলো। ফারুক আর রশিদের ষড়যন্ত্র অভ্যুত্থানে রূপ না নিয়ে, রূপ নিলো গুপ্ত হত্যায়। দেশকে বাঁচানোর নামে এ যেন এক বর্বর হত্যাকাণ্ডে পরিচালিত হলো। ওরা কি করেছিলো তা অনুধাবন করার জ্ঞান কিংবা পরিপক্বতা কোনটাই তাদের ছিলো না। দুই মেজর মিলে সেনাবাহিনীর গর্বিত নামকে মলিন কর্দমাক্ত করে দিলো এবং দেশের শিরা-উপশিরায় এমন এক "কালো বাহিনী" প্রবিষ্ট করিয়ে দিলো যা 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্যে শেখ মুজিবের চাইতে অনেক বেশী ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হলো। কিন্তু তারা তাদের জঘন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এত

বেশী নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করেছিলো যে, তার ভয়ানক পরিণতির প্রতি তাদের দৃষ্টি নিপতিত হবার কোন অবকাশ ছিলো না।

সবকিছুই ঠিক পরিকল্পনা মত চলছিলো। এমনি সময়ে রশিদ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা আঘাত পেলো।

ফারুকের বোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাবার পথে রশিদের বাসায় ঢুকলো। রশিদকে সে জানালো যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে একটি গুঞ্জন শুনে এসেছে। দেশে নাকি খুব শিগগিরই একটা সামরিক অভ্যুত্থান হতে যাচ্ছে, অন্যান্যের মধ্যে যার নেতৃত্বে রয়েছে মেজর রশিদ। তার বুঝতে বাকী রইলো না যে, তরুণ অফিসারদের সঙ্গে অলক্ষ্যে আলাপের ফাঁকেই এ রকম তথ্য ফাঁস হয়ে পড়েছে। আর এ গুজব যদি সত্যিই ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পৌঁছে থাকে, তাহলে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মাধ্যমে এটা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই শেখ মুজিবের কানে পৌঁছে গেছে। শেখ মুজিবের গোয়েন্দা বিভাগ সবই খুঁটিয়ে বের করে ছাড়বে।

রশিদকে ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডারের অফিসে ডেকে পাঠানো হলে সে আরও বেশী ভয় পেয়ে যায়। ডেকে পাঠিয়েছিলো কর্ণেল শাফাত জামিল। ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার, শাফাত জামিলের সঙ্গে মাত্র অল্প কয়েকদিন আগেই সে দেশের রাজনৈতিক সমস্যাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলো। কর্ণেল জামিল তাকে জানালো যে, তার নাম জড়িয়ে ঢাকায় একটি সম্ভাব্য অভুত্থানের কথা শোনা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তার উপর একটা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা কর্ণেল তাকে জানায়।

অবস্থাদৃষ্টে রশিদ দারুণভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠে।

স্মৃতিচারণ করে রশিদ বললো, 'আমি শাফাত জামিলকে বললাম, যদি আমার উপরে কোন কিছু চাপানো হয়, তাহলে আপনাকেও আমি ছাড়ছি না। আমি আপনাকে আমাদের দলনেতা বলে জড়িয়ে দেবো। আমি বলবো যে, আমি যা কিছুই করেছি সবই আপনার নির্দেশানুযায়ী করেছি। আমার কাছে প্রমাণও রয়েছে। আমি বলবো কিভাবে আপনি আমাকে ঢাকায় দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারীতে বদলি করে পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন। কারণ, আমারতো যশোরের গানারী স্কুলে বদলি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। আপনার কাজের সুবিধের জন্যেই আপনি আমাকে যশোরের বদলি বাতিল করিয়ে ঢাকায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

রশিদ কি বুঝাতে চাচ্ছিলো কর্ণেল শাফাত জামিল তা বুঝতে মুহূর্ত দেরি করলো না। সুতরাং কর্ণেল জামিল রশিদের সঙ্গে এ নিয়ে আর বাড়াবাড়িতে গেলো না। কিন্তু রশিদ যেন বিপদ সঙ্কেত খুব কাছাকাছিই দেখতে পাচ্ছিলো। এতে করে রশিদও ফারুকের মতো মুজিব হত্যার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। সে আমাকে বলেছিলো, 'আমাদের পিছিয়ে আসার আর কোন পথ খোলা ছিলো না।' 'হয় তার সমাধি রচিত হবে—না হয়

আমাদের।' তার কিছুদিন পর, জুলাই মাস শেষ না হতেই, রশিদ খন্দকার মোশতাক আহমেদ-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলো। মোশতাক তখন মুজিব কেবিনেটের বাণিজ্য মন্ত্রী এবং চেয়ারম্যান শেখ মুজিবের পর বাকশালের তিন নম্বর সদস্য।

এ ছাড়া, খন্দকার মোশতাক আহমেদ-এর আর একটা পরিচয় ছিলো। তিনি হচ্ছেন দাউদকান্দির নামজাদা পীর সাহেব আলহাজ্ব হযরত খন্দকার কবির উদ্দিন আহমেদ-এর পুত্র এবং আওয়ামী লীগের ভেতরে সবচেয়ে কম বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। এবং ঢাকার হাইকোর্ট ও পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতিও ছিলো।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মোশতাক আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাজউদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে গঠিত মুজিবনগরের প্রবাস সরকারের তিনি ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। ১৯৭১-এর শরৎকালে ডঃ হেনরী কিসিঞ্জার আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন ধরানোর চাল খেলে পাকিস্তানের ভাঙ্গন রোধ করতে চেষ্টা চালিয়েছিলো। সেই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে মোশতাক জড়িত ছিলেন বলে কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে এসে পররাষ্ট্র দফতরের গদি তিনি আর পেলেন না।

খন্দকার মোশতাককে দেয়া হলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সম্পদ ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের ভার। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারের প্রবর্তন করলে, মোশতাক পেলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।

বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে রশিদের সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারিত হলো ২রা আগস্ট, সন্ধ্যে সাতটায়। সবার দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে বেসামরিক পোশাকে রশিদ খন্দকার মোশতাক আহমেদের পুরনো ঢাকাস্থ আগা মসিহ লেনের বাড়ীটিতে গিয়ে হাজির হয়। পরে যাতে কেউ জিজ্ঞেস করলে কিংবা জানতে চাইলে বিপদে পড়তে না হয়, সেজন্যে রশিদ স্কুটার কেনার জন্য পারমিটের একটি দরখাস্তও সঙ্গে নিয়ে যায়। একজন রাজনীতিকের বাড়ীতে একজন সৈনিকের উপস্থিতি নিয়ে কথা উঠলে, ঐ দরখাস্তটা দেখিয়ে সন্দেহ দূর করার জন্যেই সে তা করেছিলো। মোশতাক তাকে দোতলার একটি ঘরে স্বাগত জানালেন। কিছুক্ষণ ধরে টুকিটাকি বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর রশিদ বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলাপ শুরু করে। তারা সেদিন প্রায় দু'ঘন্টা ধরে আলাপ করেছিলেন।

রশিদের ভাষায়, আমরা কিছুক্ষণ রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা বলি। পরোক্ষভাবে দেখছিলাম এতে তিনি কি রকম বোধ করেন। পরে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আওয়ামী লীগের প্রবীণতম সদস্য এবং শেখ মুজিবের একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ লোক হিসেবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে দেশ কোন উন্নতি প্রত্যাশা করতে পারে বলে তিনি মনে করেন কিনা। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন, 'না', জাতি তার নেতৃত্বে কোন উন্নতি প্রত্যাশা করতে পারে না।

'তারপর আমি বলেছিলাম, এটাই যদি সত্যি হবে, তাহলে আপনারা তাকে ছেড়ে

যাচ্ছেন না কেন?' তিনি উত্তর করেছিলেন, 'এটাও আসলে অতটা সহজ নয়। তারা এতই কাপুরুষ ছিলো যে তাঁর সব অপকর্মই তারা মেনে নিয়েছিলো।' রশিদ আরো বললো, 'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম', 'দেশের এ পরিস্থিতিতে কেউ যদি শেখ মুজিবকে জোরপূর্বক সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, তাহলে তা কি ঠিক হবে?' 'তিনি বলেছিলেন, দেশের স্বার্থে সম্ভবতঃ এটি একটি ভাল কাজ হবে। কিন্তু কাজটা খুবই কঠিন।'

এটাই আসলে মোশতাকের হুবহু মুখের কথা ছিল কিনা সঠিক করে বলতে বললাম।

সে উত্তর দিলোঃ হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন, 'এটি একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে কেউ যদি তা করতে পারে, তাহলে সম্ভবতঃ সেটি হবে একটি মহৎকর্ম।'

রশিদকে আমি তখন প্রশ্ন করলামঃ 'তাহলে তিনি রাজী হয়েছিলেন? রশিদের উত্তরঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি রাজী হয়েছিলেন। এমনকি মোশতাক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যদি তাকে সরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাঁর পরিবর্তে কে আসবে? বিকল্পতো থাকা উচিত।'

রশিদ মোশতাকের নিকট ব্যাখ্যা করছিলো যে, 'যদি কেউ শেখ মুজিবকে সরিয়ে দেয়ার কথা চিন্তা করে থাকে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই মুজিবের বিকল্পও ঠিক করে রেখেছে বিশেষ করে, এমন একজনকে যে রাজনৈতিক দিক থেকে অন্ততঃ তাঁর সমকক্ষ হবে।'

খন্দকার মোশতাক আহমেদ রশিদের আভাসে ইঙ্গিতে কথা বুঝতে পেরেছিলো কিনা জিজ্ঞেস করলে সে বললোঃ 'আমি যখন তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করতে গেছি, তখন অবশ্যই তিনি আমার ঐ সব ইঙ্গিতের কথায় আমি কি বুঝাতে চাচ্ছিলাম, তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। না বুঝার কোন কারণই ছিলো না।'

খন্দকার মোশতাক আহমেদের মাঝে শেখ মুজিবের বিকল্প খুঁজে পেয়ে রশিদ মনে মনে সান্ত্বনা পেলো। রশিদ ফারুককে এ খবরটি দিলে, ফারুক বললো, 'আমার ধারণায় তুমি ঠিকই আছো। তবে এটা পুরোপুরি তোমার ব্যাপার।' ফারুক এই ভেবে খুশী হয়েছিলো যে, শেষ পর্যন্ত তার পরিকল্পনা একটা রূপ নিতে যাচ্ছে। আমি পৃথক পৃথকভাবে ফারুক এবং রশিদের অনেকগুলো সাক্ষাৎকার টেপে রেকর্ড করেছি। ঐ সব সাক্ষাৎকারে তারা শপথ করে বলেছে যে, শেখ মুজিবের হত্যার পূর্বে এভাবেই খন্দকার মোশতাককে অবগত করানো হয় এবং তিনি মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

খন্দকার মোশতাককে যখন আমি জিজ্ঞেস করি, তখন তিনি তা অস্বীকার করেন। আমি কিন্তু এই দুই মেজরকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ খুঁজে পাইনি।

তারা পরিষ্কার করে বলেছে যে, মোশতাককে তারা আগস্টের দুই তারিখে মুজিব হত্যার পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলো। ঘটনাটি মুজিব হত্যার মাত্র তেরো দিন আগে। এর ফলে খন্দকার মোশতাক তাঁর সহযোগী তাহেরউদ্দীন ঠাকুর প্রমুখ সহকর্মীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার সময় পান। শেখ মুজিবকে হত্যার পর কে কোন পদে আসীন হবে সে নিয়েও তারা মতামত ব্যক্ত করেন। তারপরে, তাদের দলেরই কোন একজন এই

গোপন পরিকল্পনার কিছু তথ্য আমেরিকান দূতাবাসের একজন যোগাযোগ রক্ষাকারীর কাছে ফাঁস করে দেয়। ১৫ই আগস্ট বিস্ময়ের সঙ্গে ফারুক লক্ষ্য করে যে, যখন তার লোকেরা মুজিবের বাড়ী ও সেরনিয়াবাতের বাড়ীতে হত্যাকান্ড চালাচ্ছিলো তখন আমেরিকান দূতাবাসের কয়েকটি গাড়ী শহরের চতুর্দিকে ছুটাছুটি করছিলো। রশিদ খন্দকার মোশতাককে নিয়ে রেড়িও স্টেশনে পৌঁছার অনেক আগেই তাহেরউদ্দীন ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়েছিলো। মোশতাকের বেতার ভাষণটি তাহেরউদ্দীন ঠাকুরেরই লেখা। ভাষণটি যেভাবে লেখা হয়েছিলো তাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এটা বেশ সময় ধরে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে লেখা। শেখ মুজিবের হত্যার পর তাহেরউদ্দীন ঠাকুর পশ্চিমা এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছিলো যে, মুজিব হত্যার পরিকল্পনাটি তার বাড়ীতেই মাত্র দুই রাত আগেই চূড়ান্ত করা হয়েছিলো।

ফারুক আর রশিদ কিন্তু শপথ করে বলেছে যে, তারা ওই ধরনের কোন বৈঠকে উপস্থিত ছিলো না। এমনকি মুজিব হত্যার আগে তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের সঙ্গে তারা কোন রকম যোগাযোগই করেনি। তারা তাহেরউদ্দীন ঠাকুরকে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করতেও প্রস্তুত বলে যে সময় জানিয়েছিলো। সুতরাং ঠাকুর যদি সত্য কথাও বলে থাকেন, তাহলে ১৩ই আগস্ট তার বাড়ীতে যে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, সেটি ছিলো একান্তই মোশতাক আহমেদের অনুসারীদের একটি ঘরোয়া বৈঠক। হয়তো এটি আয়োজন করা হয়েছিলো। দুই মেজরের হত্যাকান্ড পরিচালনার ব্যাপারে তাদের সমর্থন চূড়ান্ত করার জন্যেই। শেখ মুজিবের হত্যাকান্ডের বিষয়টি আগে থেকেই খন্দকার মোশতাক জানতেন বলেই এই ঘটনাবলী সাক্ষ্য দিচ্ছে।

অবশ্য এতে করে এমন কিছু প্রমাণিত হচ্ছে না যে, খন্দকার মোশতাক ও তাঁর অনুগামীরা আলাদাভাবে শেখ মুজিবকে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিলো। যদিও আরো অনেকেই শেখ মুজিককে হত্যার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলো। এদের মধ্যে মাওবাদী বামপন্থী দল 'সর্বহারা পার্টি' এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুই মেজরের কান্ডকীর্তি অন্যান্যদের সকল জল্পনা-কল্পনা ছাড়িয়ে গেলো।

গোয়েন্দা বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমাকে জানায় যে, ১৯৭৫ সালের আগস্টের প্রারম্ভে তার বিভাগ শেখ মুজিবকে উৎখাতের কমপক্ষে পাঁচটি 'সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রের' তদন্ত চালাচ্ছিলো। সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসারদের মধ্যে চরম অসন্তোষ ছিলো ঐ হিসেবের অতিরিক্ত। একজন সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদ সে সময়ে তার স্ত্রীর শাড়ি কেনার অজুহাতে কলকাতা যান। কিন্তু তিনি দমদম বিমান বন্দরের বাইরে যাননি। ঐ সময়ে তিনি একজন পশ্চিমা কূটনীতিকের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। আরেকটি রিপোর্ট দেন শেখ মনি। তিনি জানান যে, খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ একটি ঘরোয়া নৈশভোজে কিছু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি এবং জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার কমপক্ষে তিনজন উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারকে আপ্যায়ণ করে।

'বাংলাদেশ, দি আন্‌ফিনিশ্‌ড রেভ্যুলিউশন' গ্রন্থের রচয়িতা লরেন্স লিফ্‌সুল্‌জ ১৯৭৯ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের চতুর্থ মৃত্যু বার্ষিকীতে লন্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় এক চমৎকার প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছিলো শেখ মুজিবের গুপ্তহত্যার আড়ালে লুক্কায়িত নেপথ্য কাহিনী নিয়ে।

তার ভাষায় :

'বাঙ্গালী ও বিদেশী কূটনীতিকদের একটি ওয়াকিফহাল মহল দাবী করে যে, মোশতাক এবং তাঁর রাজনৈতিক সঙ্গীরা এক বছরেরও বেশী সময় ধরে মুজিব হত্যার পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাসের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আর ওয়াকিফহাল বাংলাদেশীয় সূত্র এ ব্যাপারে একমত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগে থেকেই মুজিব হত্যার চক্রান্ত সম্বন্ধে অবগত ছিলো। মুজিবের মৃত্যুর কম করে হলেও ছয়মাস আগে থেকেই ষড়যন্ত্রে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা আলোচনা বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছিলো।

মার্কিন দূতাবাসের একজন উচ্চপদস্থ কূটনীতিকের মতে শেখ মুজিবের উৎখাতের ব্যাপারে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ (বাংলাদেশী) মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলো। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত সংশিষ্ট লোকদের সঙ্গে দূতাবাসের কর্মকর্তাদের বহু বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐসব বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল—যদি বাংলাদেশে আসলেই অভ্যুথানের মাধ্যমে একটা রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে যায়, 'তাহলে এতে মার্কিন সরকারের প্রতিক্রিয়া কি হবে তা অনুধাবন করা।' দূর্ভাগ্যক্রমে লিফ্‌সুল্‌জ ঐসব বাংলাদেশী যারা মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগসাজস রক্ষা করেছিলো তাদের পরিচয় দেননি বা দিতে পারেননি। প্রতিবেদন থেকে অনুমেয় যে, ঐ সকল লোকজন বেসামরিক ব্যক্তি ছিলো। দুই মেজর ঐ ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো না।

ফারুক আর রশিদ আমার সঙ্গে শপথ করে বলেছে যে, তারা কোন দেশী বা বিদেশী মিশনের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ স্থাপন করেনি। কিন্তু লিফ্‌সুল্‌জ বলেন যে, 'একজন উর্ধ্বতন মার্কিন কর্মকর্তা তাকে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে জানিয়েছিলো যে, তার দূতাবাস থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, তারা এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে কোনভাবেই জড়িয়ে পড়বে না।' লিফ্‌সুল্‌জ তাঁর প্রতিবেদনে বলেন, 'যদিও মার্কিন দূতাবাসের উচ্চ পর্যায়ে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, তারা কোনভাবেই মুজিব বিরোধীদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ রক্ষা করবে না।' কিন্তু পরবর্তীতে, মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যেই এ নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়। দূতাবাসের যারা আগের বৈঠকগুলো সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলো, তারা ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকের ঘটনাবলী ছাড়া আর কিছুই তাদের ব্যক্তিগতভাবে জানা

ছিলো না বলে জানায়। অন্যান্যরা অভিযোগ করে যে, 'যারা নিষ্কলুষ থাকতে চায় এমন কূটনীতিবিদ পর্যায়ে যোগাযোগ ছিন্ন হলেও, পরে মার্কিন দূতাবাসের সিআইএ-এর প্রধান, ফিলিপ চেরী এবং অন্যান্য এজেন্টদের সঙ্গে চক্রান্তকারীদের যোগাযোগ সঠিকভাবেই কাজ করছিলো।' সাক্ষাৎকারে অবশ্য চেরী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে। "বাংলাদেশীরা নিজেরাই তা করছিলো।" চেরী বলে, "এটা ধারণা করা বোকামি যে, কোন বিদেশী সরকার জড়িত থাকলেই কেবল একটা অভ্যুত্থান ঘটতে পারে। প্রায় সকল অভ্যুত্থানের পেছনেই নিজের লোকদের সক্রিয়তা কাজ করে থাকে।" মোশতাকের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগসাজস বা আঁতাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে, চেরী বলেন, 'কিছু রাজনীতিবিদ এমনিতেই খুব বেশী বিদেশী দূতাবাসে যাওয়া-আসা করে। সম্ভবতঃ সেখানে তাদের যোগাযোগের ব্যাপারও থাকতে পারে। তাই বলে, কোন অভ্যুত্থানের ব্যাপারে কোন দূতাবাস জড়িত হবে এমন মনে করা ঠিক নয়।' লিফ্‌সুল্‌জ বলেন, '১৯৭৫ সালের এপ্রিলে মোশতাক আহমেদ ও তার রাজনৈতিক সঙ্গীরা গোপনে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, সামরিক বাহিনীকে তাদের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত করা। সামরিক বাহিনীর কিছু সিনিয়র অফিসার দিয়ে তারা অভ্যুত্থানটি ঘটাতে চেয়েছিলো।'

তিনি আরও বলেন, ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সূত্র থেকে বলা হয় যে, অভ্যুত্থান ঘটানোর ব্যাপারে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট নেতৃত্বের প্রস্তাব দেয়া হলে, তিনি প্রস্তাবিত অভ্যুত্থান পরিকল্পনায় আগ্রহ প্রকাশ করলেও তিনি সামরিক পদক্ষেপ-এর নেতৃত্ব দিতে অনীহা প্রকাশ করেন।

উপসংহারে লিফ্‌সুল্‌জ বলেন, 'খন্দকার মোশতাকের গ্রুপ অভ্যুত্থানের জন্যে বিশ্বাসযোগ্য সিনিয়র আর্মি অফিসার না পাওয়ায় জুনিয়র অফিসারদের পরিকল্পিত চক্রান্তকে এগিয়ে নিয়ে যায়। রশিদ স্বাভাবিকভাবে খুব ধীর গতিতে কাজ করে। কিন্তু যখন সে আসছে শুক্রবারেই অভ্যুত্থান ঘটানোর চূড়ান্ত ব্যবস্থা ফারুক সম্পন্ন করেছে বলে জানতে পারে, তখন সে তার দিকের সকল কাজ শেষ করার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৭৫ সালের ১৩ই আগস্ট। বেলা ২টা ৩০মিনিট। আগা মসিহ লেনস্থ খন্দকার মোশতাকের বাড়ীতে রশিদ আবারও উপস্থিত হলো। এই সময়ে কোন 'এ্যাপয়েন্টমেন্ট' করা হয়নি। ঐদিন তাদের মধ্যে মাত্র দশ মিনিট আলাপ হয়। রশিদের মতে, ঐ সপ্তাহে বা তৎপরবর্তী কিছুদিনের মধ্যে খন্দকার মোশতাক আহমেদের বাইরে যাবার কোন পরিকল্পনা ছিলো কিনা তা জানাই ছিলো ঐ সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য। রশিদের কথায়ঃ 'আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিছুদিনের মধ্যে দেশের বাইরে যাবার তাঁর কোন পরিকল্পনা আছে কিনা। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি কোথাও যাবেন না। তিনি ঢাকায় থাকবেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলামঃ 'তিনি কি এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন?' রশিদ হেসে বললোঃ 'না', 'তিনি অত্যন্ত চালাক লোক। তিনি নিশ্চিত বুঝে ফেলেছিলেন—।'

মোশতাক রাজী :

খন্দকার মোশতাককে পাওয়া যাবে বলে আশান্বিত হয়ে রশিদ তাদের চক্রান্তে সাহায্যকারী অফিসারদের খোঁজে বের হয়। ইতিমধ্যেই রশিদ বুঝে নিয়েছিলো কর্মরত অফিসারদের নিয়ে কোন ভরসা নেই। কাজেই অত্যন্ত সুচতুরভাবে রশিদ এমন কিছু অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসারকে খুঁজতে লাগলো, শেখ মুজিবের প্রতি যাদের আক্রোশ বিদ্যমান। ঐ ধরনের লোক চক্রান্তের জন্যে যথেষ্ট উপকারে আসবে বলে সে মনে করলো। ঐ মুহূর্তে প্রাক্তন মেজর শরফুল হক ডালিমের নাম তার মনে পড়ে গেলো। গাজী গোলাম মোস্তফার সঙ্গে এক অপ্রীতিকর ঘটনার জের হিসেবে মেজর ডালিমকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছিলো আঠারো মাস আগে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে। ডালিমও রশিদের মতো আর্টিলারী অফিসার ছিলো। সুতরাং রশিদ তাকে খুব ভালভাবেই চিনতো। সে ডালিমকে তার সঙ্গে গল্পের আমন্ত্রণ জানিয়ে টেলিফোন করলো।

সকল ১০টায় ডালিম রশিদের ক্যান্টনমেন্টের বাসায় এসে পৌঁছায়। ঐ দিনটা ছিলো আগস্টের তেরো তারিখ। রশিদ অল্প কথায় ডালিমকে তাদের চক্রান্তের কথা জানায়। সে অবশ্য, তাকে সময়, তারিখ এবং রণকৌশলের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছুই জানালো না। রশিদ কেবল জানতে চাইলো, তাদের সঙ্গে যোগ দিতে তার কোন আপত্তি আছে কিনা। ডালিম রশিদের প্রস্তাবে সম্মত হলো। কিন্তু একই সঙ্গে সে তার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে নিতে চাইলো। ডালিমের এই বন্ধুটি তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, জেনারেল ওসমানীর এডিসি, প্রাক্তন মেজর নূর। সেও ১৯৭৪ সালে ডালিম ও অন্যান্য কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছিলো।

ঐ দিবাগত রাত ১টার সময় ডালিম নূরকে নিয়ে রশিদের বাসায় আসে। তাদের মধ্যে পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে দীর্ঘ এবং বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। রশিদ তাদেরকে জানায় যে, শেখ মুজিবের স্থলে আপাততঃ খন্দকার মোশতাককে বসানোর ব্যবস্থা করলে পরিকল্পনার সাফল্যের দিক থেকে সুবিধে হবে। নূর তাদের সঙ্গে থাকতে রাজী হয়ে গেলো। তবে নূর বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে, খন্দকার মোশতাক মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্রে আসলেই জড়িত থাকতে ইচ্ছুক। তার ভেতরে বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে রশিদ প্রস্তাব করে যে, তারা ১৪ই আগস্ট (ঐ রাত প্রভাত হলেই) বিকেল ৫টার সময় আণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের বাহিরে মিলিত হবে। সেখান থেকে রশিদ তাকে নিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমেদের বাড়ীতে যাবে।

বিকেল বেলায় প্রস্তাবিত স্থানে এসে বিস্ময়ের সঙ্গে রশিদ দেখতে পায় যে, নূরের

সঙ্গে এমন একজন অফিসার রয়েছে যার সঙ্গে এর আগে তার কোন যোগাযোগ হয়নি। সে হলো প্রাক্তন মেজর শাহরিয়ার। রশিদ ঐ সঙ্গীকে নিয়ে প্রথমে ইতস্ততঃ করলেও পরে স্থির করলো যে, এ পর্যায়ে তার জন্যে দ্বিতীয় কোন পন্থা খোলা নেই। সুতরাং নূর রশিদকে শাহরিয়ারের উপর বিশ্বাস করা যায় বলে নিশ্চয়তা দিলে, তারা তিনজনে মিলে খন্দকার মোশতাকের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পূর্ব নির্ধারিত কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকলেও খন্দকার মোশতাক তাদেরকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। এর পরই মোশতাক উপস্থিত অন্যান্যদের সঙ্গেও পরিচিত হন। রশিদ বর্ণনা করে যে, তারা কেবল তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে এখানে এসেছে। তারপর সামান্য কিছুক্ষণ আলাপচারিতা আর রসিকতা শেষে তারা বেরিয়ে চলে আসে। এতে করে নূর আর শাহরিয়ার পরিষ্কার বুঝে নেয় যে, খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে রশিদ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। রশিদ জানায় যে, 'তারা আমাকে বলেছিলো', "যে কোন সময়, যে কোন ধরনের সহযোগিতা করার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।"

ফারুকের ইউনিট নৈশ মহড়ার জন্যে ক্যান্টনমেন্টে দাঁড়িয়ে নিউ এয়ারপোর্টে প্রস্তুত থাকতে। রশিদঃ ডালিম, নূর আর শাহরিয়ারকে ঐ জায়গায় তার সঙ্গে মিলিত হতে বলে দেয়। তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্যে আসল কথাটিই সে বলে দেয় যে,ওখানে গিয়েই তারা পুরোপুরি সামরিক প্রস্তুতি দেখতে পাবে এবং সেখানে কৌশলগত পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে অধিকতর ব্যাপক আলোচনা করা যাবে। এমনকি ঐ শেষ পর্যায়ে এসেও রশিদ তার সহযোগী ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে পর্যন্ত পুরো সত্যটি প্রকাশে বিশ্বাস করতে পারেনি, যা সে নিজে মাত্র ৪৮ ঘন্টা আগে ফারুকের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলো। শেখ মুজিবকে পরদিন সকালেই চিরতরে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়া হবে।

"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", জয় বাংলা।
—শেখ মুজিবুর রহমান

৭

শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড

তাঁর সময় ফুরিয়ে গেছে— ।
কাজটা অত্যন্ত গোপনে সমাধা করতে হবে।

—আন্ধা হাফিজ

১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট। বেলা এগারোটা ছাড়িয়েছে কেবল। সময় যেন অতি দ্রুত বেগে মহিলার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। চট্টগ্রামের এক বাজারের মাঝামাঝি এসে তার ট্যাক্সি বিকল হয়ে পড়েছে। বিকল গাড়ীতে বসে মেজর ফারুকের স্ত্রী, ফরিদা অস্তিত্বের·দুশ্চিন্তায় ঘেমে একেবারে গোসল করার উপক্রম। এক ঘন্টারও বেশী সময় ধরে সে হালিশহরে অবস্থানরত আন্ধা হাফিজের নিকট একটা জরুরী খবর পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলো।

ফরিদা ঢাকা থেকে এর আগের দিন বিকেলে চট্টগ্রাম এসেছে। তার সঙ্গে তার মাও ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ফিরে এসেছিলো। ফারুক তাকে অন্ধ দরবেশের সঙ্গে আলোচনা করতে পাঠিয়েছিলো। তার স্পষ্ট নির্দেশ ছিলোঃ 'তাকে বলবে, আমি ১৫ তারিখেই কাজটা করতে যাচ্ছি। আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, আমি ইসলাম ধর্ম আর দেশের জন্যেই এ কাজ করছি। আমি যা করছি তা, জনগণের মঙ্গলের জন্যেই করছি। তাকে আরো বলবে, আমি যা করছি, তা আমার অভিলাষ কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে করছি না। যে-কোন পরিস্থিতিতে আমি আল্লাহর পথ অনুসরণ করতে প্রস্তুত। আমি চাই যে, তিনি আমাকে বলুক, আমি কি ঠিক পথেই চলেছি, না ভুল পথে চলেছি। তিনি যদি অন্য কিছু করতেও বলেন, আমি তাই করবো।'

ফারুক ফরিদাকে দুপুরের মধ্যেই আন্ধা হাফিজের বক্তব্য টেলিফোনে ঢাকায় জানিয়ে দিতে বলেছিলো। ফরিদার কথায়ঃ 'বেবী ট্যাক্সি পেতে আমাদের বেশ কষ্ট করতে হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত একটা মিললেও পথে সেটা কয়েকবার বিকল হয়ে পড়েছিলো।' 'দরবেশজীর কাছে অবশেষে পৌঁছা গেলো। কিন্তু কী আশ্চর্য! ট্যাক্সি চালক পথে আমাদের এতটা অসুবিধার জন্যে দুঃখ প্রকাশ না করে বরং উল্টো আমাদের কাছে ২৭ টাকা ভাড়া বেশী চেয়ে বসলো।

ফরিদা গিয়ে দেখলো দরবেশ আন্ধা হাফিজ লুঙ্গি ও সুতি গেঞ্জি গায়ে পায়ের উপর পা তুলে একটা নীচু চৌকিতে বসে আছেন। কিছু কাপড় তার কামরার একটা ছোট রশিতে ঝুলছিলো। ফরিদা একটা বেতের মোড়ায় গিয়ে বসলো। সে যেন মোড়ায় বসে অদৃশ্য কিছু ফুলের সুগন্ধ পাচ্ছিলো। মৃদুমন্দ ঠান্ডা একটা বাতাস এসে তার শরীর স্বস্তিতে ভরিয়ে দিলো। কিন্তু রুমের ভেতরে কোথাও কোন পাখার চিহ্নটিও তার চোখে পড়লো না। তার মনে জাগতে লাগলো, স্বর্গীয় বাতাসই আন্ধা হাফিজকে গরমের মাঝে ঠাণ্ডা করে রেখেছে।

অন্ধ দরবেশ ফরিদার হাত নিজের হাতের উপর নিয়ে নীরবে ফারুকের পাঠানো সংবাদ শুনে নিলেন। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবেগজড়িত কণ্ঠে উর্দু ভাষায় আন্ধা হাফিজ বলতে লাগলেনঃ 'তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে। তোমাদের যা করার করে ফেলো। তবে, অত্যন্ত গোপনে কাজটা করতে হবে।' আবারও এক লম্বা নীরবতা। তারপর তিনি ফরিদাকে বললেন, 'ফারুককে বলো, কাজটা শুরু করার আগে সে যেন আল্লাহর রহমতের জন্যে সর্বান্তঃকরণে দোয়া করে নেয়। তার সাথীরাও যেন একইভাবে দোয়া করে নেয়। দু'টি 'সুরা' দিলাম। সে যেন অনবরত তা পাঠ করতে থাকে। তাহলে তার মন পবিত্র থাকবে ও পবিত্র চিন্তা ছাড়া সে আর অন্য কোন চিন্তাই করতে পারবে না।

ফরিদা বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। যাবার পূর্ব মুহূর্তে সে তার স্বামী ও তার সাথীদের জন্যে দোয়া করতে আন্ধা হাফিজকে অনুরোধ জানালো। আন্ধা হাফিজ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'চিন্তা করো না। আমি তাদেরকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়েছি। এটা তাঁর ইচ্ছে। তিনিই তাদের রক্ষা করবেন।'

ফরিদার ভোগান্তি শেষ হলো না। বাবার বাড়ীতে ফিরে এসে দেখে, 'ঢাকার টেলিফোন লাইন অচল। দু'ঘন্টা পরে লাইন পেলেও তখন আবার ফারুকের দিক থেকে কোন জবাব আসছিলো না।' তখন ফরিদা তার বোনের বাসায় টেলিফোন করলো। কিন্তু তাতেও কথা বুঝা যাচ্ছিলো না। উপায়ান্তর না দেখে সে তার শ্বশুরকে ফোন করে। শ্বশুর রিসিভার উঠালে ফরিদা বললো, 'ফারুককে আমার জরুরী দরকার। আপনি তাকে এক্ষুণি আমায় টেলিফোন করতে বলুন।' ডঃ রহমান গিয়ে দেখেন তার ছেলে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তিনি মনে করলেন, সকাল সকাল বাসায় ফিরে কোন কাজ হাতে না থাকায় একটুখানি ঘুমিয়ে নিচ্ছে। পরিশেষে, বিকেল পাঁচটার সামান্য কিছু আগে ফরিদা ঐ সাংঘাতিক নির্দেশমালা ফারুককে পাঠাতে সক্ষম হয়। কেবল আন্ধা হাফিজই শেখ মুজিবের নক্ষত্রে তাঁর পতনের আভাস দেখতে পাননি। প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত স্টাফের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রুহুল কুদ্দুস একজন খ্যাতনামা শৌখিন হস্তরেখা বিশারদ। জুলাই মাসের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্টের হাত দেখার সুযোগ হয়েছিলো। তার হাত দেখে সে এতই

ভড়কে গিয়েছিলেন যে, কালবিলম্ব না করে তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে 'লম্বা চিকিৎসা ছুটির' নামে ইউরোপে পাড়ি জমান। এতেই তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। মুজিব হত্যার সময় তিনি দেশে ছিলেন না। বাংলাদেশ সরকার কয়েক মাস চেষ্টা করেও তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আসলে শেখ মুজিবের পরিবারের বিরুদ্ধেও ভাগ্য কাজ করছিলো। আগস্টের ১০ তারিখে শেখ মুজিবের প্রিয় ভাগ্নির বিয়ে উপলক্ষে ঢাকায় জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সবাই জড়ো হয়েছিলো। অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেরনিয়াবাতের ছেলেরা খুলনা থেকে বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধবও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো। তারা সবাই ঢাকায় অবস্থান করছিলো। কারণ ১৪ই আগস্ট ছিলো সেরনিয়াবাতের মায়ের চেহ্‌লাম। ফারুক আর রশিদ যখন এই গোষ্ঠীর উপর আঘাত হানার চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে আসে, তখন তারা সবাই ধানমন্ডির মাত্র আধা বর্গমাইল এলাকায় অবস্থান করছিলো। ঘটনাচক্রে আরেকটি ব্যাপার মেজরদের পক্ষে কাজ করছিলো। অবশ্য তারা এর উপর খুব একটা বড় রকমের ভরসা করেনি। রক্ষীবাহিনীর লৌহমানব, শক্তিধর কমান্ডার, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান দেশ ভ্রমণে ইউরোপে ছিলেন। তাঁর জায়গায় একজন তুলনামূলকভাবে জুনিয়র অফিসার কাজ করছিলেন। এবং এই প্রথমবাবের মতো তিনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন। সুতরাং সাধারণভাবে রক্ষীবাহিনী কোন দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্যে য়তটা প্রস্তুত থাকে, ঐ সময়ে তারা এতটা প্রস্তুত ছিলো না। আগস্টের ঐ দুর্ভাগা দিনটিতে শেখ মুজিব অবশ্য তাঁর প্রত্যাশার স্বর্ণ শিখরে অবস্থান করছিলেন। বাকশালের একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়েছে। সপ্তাহান্তেই ৬১ জন জেলা গভর্ণর তাদের কর্মস্থলে চলে যাবে।

শেখ মুজিবের মাথায় আর একটা বুদ্ধি কাজ করছিলো। পরের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেয়ার কথা। গোপনে একটা ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছিলো যে, ঐ সভাতেই জনগণের দ্বারা তাকে আজীবন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হবে। বিরোধী দলের কোন অস্তিত্বই ছিলো না। অথচ তাঁর অবস্থান ছিলো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

মুজিব জানতে পারেননি, মেজররা কি করছে। যদিও তাঁর কানে খবর এসেছিলো যে, ক্যান্টনমেন্টে কিছু একটা হচ্ছে। পাকিস্তানী অভিজ্ঞতা থেকে মুজিবের ধারণা জন্মেছিলো যে, বিপদ সব সময় সেনাপতিদের দিক থেকেই আসে। কাজেই তিনি তাঁর গোয়েন্দা বিভাগকে কেবল সেই দিকে বিশেষ নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি জুনিয়র অফিসারদের মোটেই পাত্তা দেননি। ঐ ভুলের মাশুল তাকে জীবন দিয়েই দিতে হয়েছিলো।

নিয়মমাফিক ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার ও দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারীর যুক্ত মহড়া ১৪ই আগস্ট রাত দশটায় শুরু হলো। দু'টি ইউনিটের প্রায় ৬০০ সৈন্য ক্যান্টনমেন্টের পেছনে নির্মীয়মাণ নূতন এয়ারপোর্টের কাছে অংশ নিতে গিয়েও তাদের কমান্ডারদের মনে কি আছে তা একটুও টের পায়নি। ফারুক আর রশিদ আন্ধা হাফিজের নির্দেশিত কঠোরতম গোপনীয়তা বজায় রেখে চলছিলো।

সকল স্বাভাবিক ও গতানুগতিক কাজের মধ্যে একটা কাজ করা হয়েছিলো অস্বাভাবিক। একটা আর্টিলারী রেজিমেন্টের তিন কোম্পানী ব্যাটারীকে বেরিয়ে এসে কেবল রাইফেল নিয়ে সজ্জিত হতে বলা হয় এবং ১২টি ট্রাকে ভর্তি হয়ে মহড়ার স্থানে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। এমনকি শেষ নির্দেশটিও কারও মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করতে পারেনি। এই জন্যে যে, মেজর রশিদ রেজিমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রায়ই এ ধরনের ট্রেনিং রুটিনে রদবদল করেছে।

রশিদ ৬টি ১০৫ মিঃ মিঃ যুগোশ্লাভ হাউইটজার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে গোলাবারুদ এয়ারপোর্টের আশেপাশে জড়ো করে। ক্রুরা জানতেই পারলো না যে, রশিদের নির্দেশ অনুযায়ী কামানের লক্ষ্য স্থির করা হলো সেখান থেকে চার মাইল দূরে রক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের দিকে।

আরো এগারোটি কামান ইউনিট হেড কোয়ার্টারে ক্রুসহ মোতায়েন রাখা হয়েছিলো। রেজিমেন্টাল অস্ত্রাগারের আঠারতম কামানটি ল্যান্সার গ্যারেজ-এর ক্রুদের সঙ্গে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিলো। স্বাভাবিক নিয়মে ফারুক সেখান থেকেই ২৮টি টি-৫৪ ট্যাংক নিয়ে রওয়ানা দেয়। যান্ত্রিক গোলাযোগের জন্যে সেদিন পুরো সংখ্যার চেয়ে দু'টি ট্যাংক কম নিয়েই ফারুককে যাত্রা করতে হয়। অধিনায়কদের ছাড়া প্রতি ইউনিটে মাত্র চারজন করে অফিসার উপস্থিত ছিলো। আরো দু'জন অফিসারকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পারার কারণে মহড়া থেকে বাদ দেয়া হয়। শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি এত বেশী নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের সৈন্যদের মুজিবের বিরুদ্ধে কিছু করতে বললে, তা করতে তারা দ্বিধা করবে বলে ফারুক ও রশিদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না।

পদাতিক বাহিনীর একটা ইউনিটকে এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত করার জন্যে রশিদ শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। অভ্যুত্থানের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সকল অংশকে এক সঙ্গে জড়িত করাই ছিলো এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে সে তার এক পুরানো বন্ধু মেজর শাহজাহানকে টেলিফোন করে। শাহজাহান তখন জয়দেবপুরের ১৬তম বেঙ্গল ইনফেন্ট্রির ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক। রশিদ তাকে বলেছিলো, তার সৈন্যদের নিয়ে রাতে নূতন এয়ারপোর্টের কাছে অনির্ধারিত এই যৌথ মহড়ায় অংশ নিতে। সে অবশ্য মেজর শাহজাহানকে এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। কিন্তু তার বিশ্বাস ছিলো যে, মেজর শাহাজান তার ইউনিট নিয়ে এলে, সে তাকে তাদের পরিকল্পনায় যোগ দিতে রাজী করাতে পারবে। অপ্রত্যাশিতভাবে সে রাজী হয়ে রাত দশটায় তার ইউনিট নিয়ে মহড়ায় যোগ দেবে বলে জানায়। রশিদ অধীর আগ্রহে মেজর শাহজাজান, মেজর ডালিম, নূর আর শাহরিয়ারের আগমনের অপেক্ষা করছিলো।

রাত সাড়ে দশটা বেজে গেলো। কিন্তু কোথাও কারও কোন চিহ্নটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। অন্য প্রান্ত থেকে মেজর শাহজাহানের

কণ্ঠ ভেসে এলো। শাহজাহান জানালো তার সৈন্যেরা খুব ক্লান্ত। এ অবস্থায় তারা যৌথ মহড়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না।

হতাশাব্যঞ্জক এই খবর শুনে ফারুক ক্ষেপে গিয়ে মন্তব্য করে, 'মনে হচ্ছে সব বেঙ্গল টাইগারই এখন পোষা বিড়ালে পরিণত হয়ে গেছে।'

এর মধ্যে মেজর ডালিম আর তার সঙ্গীদেরও কোন খবর নেই। রাত প্রায় এগারটার দিকে তারা মেজর পাশা আর মেজর হুদাকে সঙ্গে নিয়ে জায়গামত চলে আসে। মেজর হুদা মিলিটারী গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার এবং ডালিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা একসঙ্গে আর্টিলারীতে কাজ করেছে। রশিদ তার দল আর ১২ ট্রাক বোঝাই সৈন্য নিয়ে ট্যাংক গ্যারেজে ফারুকের সঙ্গে যোগ দেয়। সেখানে মধ্যরাতে প্রথমবারের মতো সবাইকে অপারেশনের পুরো বিবরণ জানানো হয়।

ফারুক অপারেশনের সর্বময় নেতৃত্বে ছিলো। শেখ মুজিবকে হত্যা করার কারণ এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে, পরিকল্পনায় যোগ দিতে রাজী আছে কিনা ফারুক জানতে চাইলে সকলেই সম্মতি জানায়। তারপরই বসে তারা কাজের কথায় ফিরে আসে।

ফারুক তখন ঢাকা শহরের একটি সুপরিকল্পিত ট্যুরিস্ট ম্যাপ স্কোয়াড্রন অফিস টেবিলে রাখে। সে সকল জায়গায় ব্লক স্থাপন করতে হবে, সে সমস্ত জায়গায় সে দাগ কেটে দেয়।

পরিকল্পনা মোতাবেক একটা ট্যাংক বিমান বন্দরের রানওয়ে আটকাবে আর সৈন্যরা মিরপুর ব্রিজ নিয়ন্ত্রণ করবে। অন্য দলগুলোকে পাঠানো হবে রেডিও স্টেশন, বঙ্গভবন আর নিউমার্কেটের কাছে পিলখানায় (পিলখানা ব্যারাক বাংলাদেশ রাইফেলস-এর সদর দফতর)।

৭৫ থেকে ১৫০ জন সৈন্যের বড় বড় তিনটি দল সাজানো হলো। ঐ সুসজ্জিত তিনটি দলকে তিনটি প্রধান প্রধান টার্গেট—শেখ মুজিব, আবদুর রব সেরনিয়াবাত এবং শেখ ফজলুল হক মনি'র বাড়ীতে চূড়ান্ত আঘাতের দায়িত্ব নেয়া হলো। শেখ মুজিবের বাড়ীতে আক্রমণের জন্যে ডালিমকে বলা হলে, ডালিম রাজী হলো না। প্রেসিডেন্ট পরিবারের সঙ্গে তার পরিবারের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। সম্ভবতঃ সে কারণেই ডালিম খোদ শেখ মুজিবের উপর আক্রমণ চালাতে ব্যক্তিগতভাবে নারাজ হলো। তৎপরিবর্তে সে সেরনিয়াবাতের বাড়ীতে সর্বাত্মক হামলা চালানোর দায়িত্ব নিলো। আর শেখ মুজিবকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার ভয়ঙ্কর দায়িত্বটি নিলো প্রাক্তন মেজর নূর এবং মেজর মহিউদ্দিন। তারা তাদের সঙ্গে নিলো এক কোম্পানী ল্যান্সার।

ফারুকের অত্যন্ত আস্থাভাজন এনসিও (নন কমিশন্ড অফিসার) রিসালদার মুসলেহউদ্দিন ওরফে মুসলিমকে দেয়া হলো শেখ মনি'র বাড়ীতে আক্রমণের দায়িত্ব। তাদের উপর নির্দেশ ছিলো—শেখ মুজিব, সেরনিয়াবাত আর শেখ মনিকে হত্যা করার।

এবং মুজিবের দুই পুত্র শেখ কামাল আর শেখ জামালকে বন্দী করার। আর কাউকে কিছু করা বারণ ছিলো। তবে, পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এমন যে কাউকে প্রয়োজনবোধে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার নির্দেশ রইলো। আসলে এই নির্দেশটিই হত্যাযজ্ঞের পরিধি প্রশস্ত করার পথ খুলে দিলো।

ফারুকের মতে, রশিদের দায়িত্ব ছিলো রাজনৈতিক গুটিগুলো সঠিকভাবে চালনা করা। অভিযান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই রশিদ স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকতের কাছে যাবে, যাতে করে সে তার মিগ জঙ্গী বিমান নিয়ে প্রস্তুত থাকে। ঢাকার বাইরে থেকে কোন সেনা ইউনিট ঢাকায় আসার চেষ্টা করলে, সে তা ঠেকিয়ে দেবে।

এছাড়া, রশিদের উপর আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বর্তায়। তার একটা ছিলো, খন্দকার মোশতাক আহমেদকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে আসা। রেডিও স্টেশনে পৌঁছে মুজিব হত্যার ঘোষণা দেয়া, আর দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমেদের নাম ঘোষণা করা। অন্য দায়িত্বটি ছিলো, মুজিব হত্যার পর ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালানো। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ফারুক তার সহকর্মী অফিসারদের মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পেরেছিলো। তার জানা ছিলো যে, ঢাকায় কোন সেনা ইউনিটকে হতে প্রস্তুত তাদের কমপক্ষে দু'ঘন্টা সময় লেগে যাবে। সে মোটামুটি নিশ্চিত ছিলো যে শেখ মুজিব দুনিয়াতে নেই এ খবর একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, সামরিক কমান্ডাররা তাদের জীবন আর চাকুরীর ভয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে অন্ততঃ দু'বার ভেবে দেখবে। কাজেই সে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চিন্তাই করেনি। তার পরিবর্তে ভয়ঙ্কর হত্যাকান্ডটি ঘটে যাবার পর সে রশিদকে তাদের সমর্থন লাভের জন্যে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রায় সবকটা ঘটনাতেই ফারুকের ধারণা/সিদ্ধান্ত একেবারে কানায় কানায় সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। অভিযানে তার প্রধান লক্ষ্যসমূহ সঠিকভাবে অর্জিত হবার ব্যাপারে ফারুকের কোন সন্দেহই ছিলো না। তিনটি প্রধান বড় দলকে এভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, তাদের লক্ষ্যবস্তুতে বাধা সৃষ্টিকারী যে-কোন কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অধিকার তাদের থাকবে। তার জানা ছিলো, সবাই ব্যর্থ হলেও তার ল্যান্সার এ ব্যাপারে ব্যর্থ হবে না।

সুতরাং সে নিজে নিলো অভিযানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আর বিপদসঙ্কুল কাজটি এবং তা ছিলো দুর্ধর্ষ রক্ষীবাহিনীকে সামলানোর কাজ।

সাধারণ অবস্থায়, অতর্কিতে আক্রমণ চালানো হলে, ২৮টি ট্যাংক দিয়ে একত্রে জমাট বাধা ৩০০০ রক্ষীবাহিনীর একটি দলকে অকেজো করে দেয়া তেমন কোন কঠিন কাজই নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফারুকের ট্যাংকগুলো ছিলো একেবারে শূন্য—কোন গোলাবারুদই ছিলো না এতে। এমনকি ট্যাংকের মেশিনগানগুলোতেও কোন গুলি ছিলো

না। ঐ অবস্থায় কেউ তাকে সত্যিকারভাবে প্রতিরোধ করতে চাইলে, তার কিছুই করার থাকতো না। পরে জানানো হয়েছিলো যে, ট্যাংকের সকল গোলাবারুদ জয়দেবপুরের অর্ডন্যান্স ডিপোতে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো। শেখ মুজিব প্রথমদিকে মিশরের এই ট্যাংক উপহার গ্রহণ করতেই রাজী ছিলেন না। তিনি প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যবস্থা করে, এটা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যেন ঐ সকল ট্যাংক কোন কালেই অন্ততঃ তাঁর বিরুদ্ধে কেউ ব্যবহার করতে না পারে। কিন্তু ফারুক নিলো ভিন্ন পন্থা। সে ট্যাংকগুলো দিয়ে সবাইকে ধোঁকা দিয়ে কাজ হাসিল করার পন্থা অবলম্বন করলো।

ফারুক আমাকে পরে জানিয়েছিলো, 'মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র হিসেবে ট্যাংক যে কতটা কার্যকরী তা খুব কম লোকই জানে। ট্যাংক দেখে জীবনের ভয়ে পালাবার চেষ্টা করবে না, এমন সাহসী লোক খুবই কম পাওয়া যাবে। আমরা জানতাম আমাদের ট্যাংকগুলো নিরস্ত্র। জেনারেল হেড কোয়ার্টারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র এ ব্যাপারে অবগত ছিলো। কিন্তু তারাও পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলো না যে, 'ট্যাংকগুলো আসলেই এতটা নিরস্ত্র। সংশ্লিষ্ট বাকী সকলের কাছেই ট্যাংক অত্যন্ত মারাত্মক অস্ত্র যা তার সামনে যা কিছু আসে সবই উড়িয়ে দিতে পারে।' ফারুক হাসতে হাসতে আরও বললো, 'কে-ই বা আমাকে অতটা পাগল ভাববে যে, আমি জি এইচ কিউ আর রক্ষীবাহিনীর মোকাবেলা করার জন্যে একদল একেবারে ফাঁকা ট্যাংক নিয়ে এত বড় ভয়ঙ্কর অভিযানে পা বাড়াবো।

ভোর ৪টা ৪০ মিনিট নাগাদ ফারুকের বাহিনী আঘাতের জন্যে সংগঠিত হয়ে গেলো এবং যার যার জায়গামত পৌঁছার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলো। রশিদের আর্টিলারী বাহিনী তাদের কামান নিয়ে নূতন এয়ারপোর্টের প্রান্তে দন্ডায়মান। ল্যান্সার গ্যারেজে সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে ২৮টি ট্যাংক, ১২টি ট্রাক, ৩টি জীপ আর একটি ১০৫ মিঃ মিঃ হাউইটজার। এইগুলোর সঙ্গে রয়েছে রণসাজে সজ্জিত ৪০০ সৈন্যের একটি শক্তিশালী দল। তাদের দুই-তৃতীয়াংশেরই ছিলো কালো উর্দি যা পরবর্তীতে বাংলাদেশীদের মনে এক ভয়ঙ্কর পোশাক বলে পরিগণিত হতে পারে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, এই বিরাট সমরসজ্জা সেনা সদরের ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মাত্র তিনশ' গজের মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছিলো। অথচ, ঐ ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের দিন-রাত সতর্ক দৃষ্টি রাখার কথা। ল্যান্সার গ্যারেজের তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা সীমানার বাইরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগে থেকেই ফারুক সৈন্য পাহারার ব্যবস্থা করেছিলো। নির্দেশ ছিলো—গ্যারেজের ভেতরে সাজসজ্জার ব্যাপারে কেউ খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করলে, তাকে আটক করতে হবে। কিন্তু কেউ এ সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবর করতে আসেনি। সম্ভবতঃ তারা ধরে নিয়েছিলো যে, ট্যাংক আর আর্টিলারীর নির্ধারিত নৈশকালীন প্রশিক্ষণ মহড়ার কাজ চলছে।

আধা ঘন্টার মধ্যে ফারুক তার সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করলো। ফারুক

ছিলো সর্বাগ্রের ট্যাংকটিতে। বাইরে বেরিয়ে আসতেই ফারুকের কানে ভেসে এলো 'সুমধুর আযানের ধ্বনি।' ক্যান্টনমেন্ট মসজিদ থেকে মোয়াজ্জিন ফজরের আযান দিচ্ছিলো। আযানের ধ্বনি যেন তার কানে মধু বর্ষণ করছিলো।

শুক্রবার ফজরের আযানের সময়েই ফারুক দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো। আজও আবার ফিরে এসেছে আর এক শুক্রবার। আযানের আওয়াজ তার কানে ঐ জন্মদিনের কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলো। হয় সে নবজীবনের সূচনা করবে, আর না হয়, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। মনে হয়ে গেলো তার আন্ধা হাফিজের কথা। আন্ধা হাফিজ নির্দেশিত সুরা দু'টি মনে-প্রাণে আর একবার পাঠ করে নিলো। তারপরই সে তার ঘাতক বাহিনীকে আগে বাড়ার নির্দেশ দিলো। শুরু হলো ভয়ঙ্কর মিশনের দুরন্ত যাত্রা।

গন্তব্যের পথে ফারুক ক্যান্টনমেন্টের গোলাবারুদ সাব-ডিপোতে থামলো। তার ধারণা হচ্ছিলো যে, সে সেখানে সামান্য কিছু ট্যাংকের গোলাবারুদ অথবা নিদেন পক্ষে মেশিনগানের কিছু বুলেট বেল্টতো অবশ্যই পেয়ে যাবে। ঐ প্রত্যাশা নিয়ে চট করে সে ডিপোর ভেতরে ঢুকে পড়লো। কামানের ব্যারেলের ধাক্কায় ডিপোর দরজা খুলে ফেললো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে কোন গোলাবারুদ বা মেশিনগানের বুলেট ইত্যাদি কিছুই ছিলো না। তার কাছে ব্যবহার করার মতো একটা স্টেনগান ছাড়া আর কোন অস্ত্রই ছিলো না। সুতরাং ধোঁকা দিয়ে কার্যসিদ্ধি করা ছাড়া আর কোন গতি রইলো না।

বনানীর রাস্তা ধরে, ডানদিকে মোড় নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের চেক পয়েন্টের দিকে ফারুকের ট্যাংক বহর ধীরে ধীরে ছুটে চললো। পথে হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরা একদল লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হলো। তারা ছিল ৪র্থ ও প্রথম বেঙ্গল পদাতিক বাহিনীর সৈনিক। ঐ সময়ে তারা প্রাতঃকালীন পিটি-তে বেরিয়েছিলো। তারা সকলেই তাদের ডিল বন্ধ করে ট্যাংক বহরকে হাত উঁচিয়ে শুভেচ্ছা জানালো। ফারুকের সৈন্যরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাত নেড়ে তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলো। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ট্যাংকের অত বড় বহর তাদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ এলাকা ছাড়িয়ে বাইরে যেতে দেখেও কারো মনে কোন সন্দেহ জাগলো না। একমাত্র ফারুকের বাবা ডঃ রহমান ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। তিনি সবেমাত্র ফজরের নামাজ শেষ করেছেন। আওয়াজ শুনে তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেন ট্যাংক বহর এগিয়ে যাচ্ছে। এতো ভোরে ট্যাংক বাইরে আসার ব্যাপারটি তার কাছে বেখাপ্পা ঠেকছিলো। তিনি অবাক হয়ে এগুলোর গতিবিধি নিয়ে ভাবতে লাগলেন।

ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে বের হয়েই ট্যাংকগুলো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো। দেয়াল ভেঙ্গে ঢুকে পড়লো এয়ারপোর্ট এলাকায়। একটা ট্যাংক পূর্বের নির্দেশ মতো সারি থেকে বেরিয়ে এসে রানওয়ে অবরোধ করে বসলো। আর একটি গেলো হেলিপ্যাডের দিকে। সেখানে আধা ডজন হেলিকপ্টার পার্ক করা ছিলো। বাকী সব ট্যাংক প্লান্ট

প্রটেকশন সেন্টারকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চললো রক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের দিকে। ফারুক তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে সকাল ৫টা ১৫মিনিট হয়ে গেছে। ততক্ষণে ঘাতকদলগুলো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই।

এয়ারপোর্টের দেয়ালের কাছাকাছি এসে ফারুক তাকিয়ে দেখে মাত্র একটি ট্যাংক তাকে অনুসরণ করছে। বাকী ২৪টা ট্যাংক একেবারে লাপাত্তা। কিন্তু ফারুক দমে যাবার পাত্র নয়। কম্পাউন্ডের বাউন্ডারী ওয়াল আর দু'টি গাছ উপড়ে ফেলে তার ট্যাংক এগিয়ে চললো। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর ব্যারাকের কাছে পৌঁছে সে যা দেখলো, তাতে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো।

তার ভাষায়ঃ 'হঠাৎ আমি তাকিয়ে দেখি ৩০০০ রক্ষীবাহিনীর পুরো ব্রিগেডটি ৬ সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে ব্যারাকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ছিলো যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। মাথায় তাদের স্টিলের হেলমেট, হাতে রাইফেল, কাঁধে প্রয়োজনীয় জিনিসের বান্ডিল আরও কত কি। এর পর পিছু হটার আর কোন পথই খোলা ছিলো না।'

'ট্যাংকের ড্রাইভার আমাকে বললো, 'এখন আমি কি করব।'

'আমি তাকে বললাম, তুমি তাদের নাকের ডগার মাত্র ছ'ইঞ্চি দূর দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। কামানগুলো তাদের মাথা বরাবর তাক করে রাখার জন্যে গানারদেরকে নির্দেশ দিলাম। অন্যান্যদেরকে ভাবভঙ্গিতে সাহসী ভাবটা ফুটিয়ে রাখতে বলে দিলাম।

'আমরা যখন ওদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন রক্ষীবাহিনীর লোকেরা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলো। আমরা তাদের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে ছিলাম। সে ছিলো এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। আমি ড্রাইভারকে বললাম, যদি ওরা কিছু করতে শুরু করে, অমনি আর দেরি না করে তাদের উপরেই ট্যাংক চালিয়ে দেবে।'

'তার আর দরকার হয়নি। দূর থেকে ভেসে আসা গুলির আওয়াজ তাদের কানে বাজতে লাগলো। তদুপরি, নিজেদের সামনে হঠাৎ ট্যাংক দেখে, ওরা গায়ের মশা পর্যন্ত নাড়াবার সাহস পেল না।'

রক্ষীবাহিনীর পক্ষ থেকে কোন রকম প্রতিক্রিয়া না দেখে ফারুক নিশ্চিত হলো যে, তার বিপদের সম্ভাবনা কেটে গেছে। তার ধারণা, আরও একবার পুরোপুরি সঠিক প্রমাণিত হলো। ফারুক পরিপূর্ণভাবে আশান্বিত হলো যে, তার বিজয় সুনিশ্চিত—সে বিজয়ী। ঐ অবস্থায় রক্ষীবাহিনীকে পাহারা দেয়ার জন্যে একটা রেখে অন্য ট্যাংকটি নিয়ে ফারুক ধানমন্ডির দিকে রওয়ানা দিলো।

ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ীর অবস্থা গোলাযোগপূর্ণ। ভোর সোয়া পাঁচটার মধ্যেই মেজর মহিউদ্দিন, নূর আর হুদার নেতৃত্বে পরিচালিত প্রধান ঘাতকদলটি শেখ মুজিবের বাড়ী পৌঁছে গিয়েছিলো। তাদের সঙ্গে পাঁচ ট্রাক ভর্তি ১২০ জন সৈন্য আর একটি হাউইটজার ছিলো। মিরপুর রোডের লেকের পাড়ে হাউইটজারটি শেখ মুজিবের বাড়ীর

মুখোমুখি বসানো হলো। আরও কিছু ট্রাকে করে সৈন্য এসে পুরো বাড়ীটার চতুর্দিক ঘিরে ফেলে। তারপরই মেজরবৃন্দ আর তাদের লোকেরা ভেতরে ঢুকে পড়ে।

বাড়ীর এলাকার বাইরে প্রহরারত সশস্ত্র পুলিশ কালো উর্দি পরা ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য দেখে ভড়কে যায়। এবং কোন প্রকার বাদানুবাদ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে। গেইটে প্রহরারত ল্যান্সার প্রহরীরা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলো না ঠিকই। কিন্তু যখন তারা তাদেরই সহকর্মী আর তাদেরই কিছু অফিসারকে দেখতে পেলো, তখন তারা ঐ কালো উর্দি পরিহিত লোকদেরকে ভেতরে আসার সুবিধে করে গেইট ছেড়ে দিলো। ঐ সময় শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত প্রহরীরা বারান্দায় ঘুমন্ত ছিলো। আনাগোনার শব্দ শুনে ওরা জেগে উঠে। গেইট দিয়ে অচেনা লোকদেরকে অস্ত্র নিয়ে ঢুকতে দেখে, তারা তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গুলি চালায়। আর্টিলারীর শামছুল আলমের মাথায় গুলি লেগে সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা যায়। ল্যান্সার বাহিনীর আর একজন সৈন্য গুরুতরভাবে আহত হয়। সঙ্গীদের ঢলে পড়তে দেখে আর বাড়ীর ভেতর থেকে প্রচন্ড প্রতিরোধের কারণে সৈন্যরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেখ মুজিবের দেহরক্ষীদের খতম করে দিয়ে তারা বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই তারা নীচতলার প্রতিটি রুম পালাক্রমে তল্লাসী করে দেখে।

ইতিমধ্যে প্রচন্ড গুলি বিনিময়ের শব্দে হাউইটজারের ক্রুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রবল প্রতিরোধের আশঙ্কায় তারা তাদের হাউইটজার থেকে রকেট নিক্ষেপ করতে শুরু করে। রকেটের প্রথম দু'টিই ধানমন্ডির লেকের দু'পাশে গিয়ে পড়ে। তারপর তারা তাদের কামান উঁচিয়ে আরও ছয় রাউন্ড রকেট নিক্ষেপ করে। একটিও লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হলো না। কামান থেকে এতবেশী জোরে রকেটগুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো যে, এর একটা প্রায় চার মাইল দূরে মোহাম্মদপুরে এক বিহারীর বাড়ীতে গিয়ে পড়ে। ঐ রকেটের আঁচমকা আঘাতে দু'ব্যক্তি নিহত ও অনেক লোক আহত হয়।

শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল আর শেখ জামাল সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্টেনগান হাতে নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বেশীক্ষণ টিকতে পারেনি কামাল। সিঁড়ির গোড়ার দিকেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। অবশ্য নিহত হবার আগে সে আরও দু'জন সৈন্যকে আহত করতে পেরেছিলো।

শেখ মুজিব নিজেও খুব তাড়াতাড়ি কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা চালান। প্রথমেই তিনি টেলিফোন করেন রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে । সেদিন রক্ষীবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান আর কর্ণেল সাবিহউদ্দিন দেশে ছিলো না। তিনি বহু চেষ্টা করে অন্য কোন সিনিয়র অফিসারকেও মিলাতে পারলেন না। উপায় না পেয়ে তিনি সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান, জেনারেল শফিউল্লাহকে ফোন করেন এবং তার মিলিটারী সেক্রেটারী ব্রিগেডিয়ার মাশহুরুল হককে ফোন করে অবিলম্বে সাহায্য

পাঠাবার নির্দেশ দেন। সর্বশেষ ফোনটি করেন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ডাইরেক্টর, কর্ণেল জামিলকে। মাত্র পক্ষকাল আগে শেখ মুজিব কর্ণেল জামিলকে ঐ পদের জন্যে বিশেষভাবে নির্বাচন করেন। জামিল একটুও দেরী করলো না। পোশাক পরিধানের সময় না পেয়ে তার পায়জামার উপরে ড্রেসিং গাউনটি চড়িয়ে দিয়ে লাল ভোক্সওয়াগন গাড়িতে করে সে প্রেসিডেন্টের সাহায্যে ছুটে চললো। প্রচণ্ড বেগে গাড়ী হাকিয়ে এসে পৌঁছালো প্রেসিডেন্টের বাড়ীর দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ীটি তখন কারবালায় পরিণত হয়ে গেছে। জামিল তার গাড়ী নিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকতে চেয়ে ব্যর্থ হলো। গেইটের বাইরে তাকে থামিয়ে দিলো সৈন্যেরা। অত্যন্ত কড়া ভাষায় বাক্য বিনিময়ে সঙ্গে সঙ্গেই জামিল তার গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। গাড়ী ফেলে সৈন্যদের পাশ কাটিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইলেই সৈন্যরা গুলি চালিয়ে দেয় জামিলের বুকে আর মাথায়। টলতে টলতে প্রেসিডেন্টের বাড়ীর গেইটের গোড়ায় মৃত্যুর হিমশীতল কোলে ঢলে পড়ে জামিল। জীবনের বিনিময়েও সে শেখ মুজিবের কোন কাজে লাগতে পারলো না।

এরই মধ্যে বাড়ীর সর্বত্র ওরা ছড়িয়ে পড়েছে। মেজর মহিউদ্দিন, হুদা আর নূর বাড়ীর প্রতিটি কামরা মুজিবের খোঁজে তন্ন তন্ন করে চষে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ অপ্রতাশিতভাবে মহিউদ্দিন মুজিবকে পেয়ে গেলো। সে দু'তলায় উঠতে সিঁড়ির গোড়ায় পা ফেলতেই শেখ মুজিবকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পায়। তাদের মধ্যে দূরত্ব ২০ ফুটের বেশী হবে না।

শেখ মুজিবের পরনে একটি ধূসর বর্ণের চেক লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবী। ডান হাতে ছিলো তাঁর ধূমপানের পাইপটি।

শেখ মুজিবকে হত্যা করার দৃঢ় মনোবল নিয়ে এ অভিযানে বেরুলেও মহিউদ্দিন শেখ-এর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পুরোপুরিভাবে মনোবল হারিয়ে ফেলে। মহিউদ্দিন আমতা আমতা করে তাকে বলেছিলো, 'স্যার আপনি আসুন।'

'তোমরা কি চাও?' মুজিব অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় জিজ্ঞেস করলো। 'তোমরা কি আমাকে খুন করতে চাও? ভুলে যাও। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তা করতে পারেনি। তোমরা কি মনে করো, তা করতে পারবে?'

মুজিব স্পষ্টতঃই সময় কাটাতে চাচ্ছিলেন। তিনি তো আগেই বেশ কয়েক জায়গায় ফোন করে রেখেছেন। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই লোকজন তাঁর সাহায্যে ছুটে আসছে। সেই সময়ে তিনি অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিচ্ছিলেন। পরে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে ফারুক আমাকে বলেছিলো, 'শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব ছিলো অত্যন্ত প্রবল। মহিউদ্দিন তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে একেবারে নতজানু হয়ে পড়েছিলো। ঐ মুহূর্তে নূর চলে না আসলে কি যে ঘটতো তা আমার আন্দাজের বাইরে।'

'মহিউদ্দিন তখনো ঐ একই কথা বলে চলছিলো "'স্যার, আপনি আসুন।"

আর অন্যদিকে শেখ মুজিব তাকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় ধমকিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় নূর এসে পড়ে। তার হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। সে বুঝে ফেলে, মুজিব সময় কাটাতে চাইছেন। মহিউদ্দিনকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নূর চিৎকার করে আবোল তাবোল বকতে বকতে তার স্টেনগান থেকে মুজিবের প্রতি "ব্রাশ ফায়ার" করে। শেখ মুজিব তাকে কিছু বলার আর সুযোগ পেলেন না। স্টেনগানের গুলি তাঁর বুকের ডানদিকে একটি বিরাট ছিদ্র করে বেরিয়ে গেলো। গুলির আঘাতে তাঁর দেহ কিছুটা পিছিয়ে গেলো। তারপর নিস্তেজ হয়ে তাঁর দেহ মুখ-থুবড়ে সিঁড়ির মাথায় পড়ে গেলো। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মহান নেতার প্রাণহীন দেহ সিঁড়ি দিয়ে কিছুদূর গড়িয়ে গিয়ে থেমে রইলো। তাঁর ধূমপানের প্রিয় পাইপটি তখনও তিনি শক্তভাবে ডান হাত দিয়ে ধরে রেখেছিলেন।

সময় তখন সকাল ৫টা ৪০ মিনিট। বাঙ্গালী জাতির সঙ্গে শেখ মুজিবের প্রচন্ড ভালবাসার চিরতরে অবসান ঘটলো।

গুলির শব্দ শুনে বেগম মুজিব তার স্বামীর অনুসরণ করতে চাইলে তার বেডরুমের দরজার সামনেই তাকে আর এক দফা ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হলো। তারপর হত্যাযজ্ঞ চলতে লাগলো।

অফিসার আর সৈন্যেরা গুলি করে দরজার বোল্ট উড়িয়ে দিয়ে একের পর এক রুমের দরজা খুলে ফেললো। তারপর ব্রাশ ফায়ার করে রুমগুলোকে ঝাঁঝরা করে দেয়া হলো যেন একটা প্রাণীও এর ভেতরে বেঁচে থাকতে না পারে। শেখ মুজিবের দ্বিতীয় ছেলে জামাল। কেবলই স্যান্ডহার্স্ট থেকে প্রশিক্ষণ শেষ করে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে সেনাবাহিনীতে কাজ করছিলো। অবস্থা দেখে বাড়ীর বাকী সদস্যদের বাঁচানোর জন্যে সে তাদেরকে মেইন বেডরুমে এনে জমায়েত করে। এবার এলো তার মরার পালা। একজন অফিসার অত্যন্ত কাছ থেকে তাকে গুলি করলে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সামনে শেখ জামাল মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। নয় বছর পরও যে দেয়ালের বিপরীতদিক থেকে তাকে গুলি করা হয়েছিলো, সেই দেয়ালে তার রক্তের দাগ, হাড্ডি আর মাংসের কণা, এমনকি বুলেটগুলি পর্যন্ত পরিষ্কার প্রমাণ হিসেবে রয়ে গিয়েছিলো।

মুজিবের দুই যুবতী পুত্রবধূ, কামাল আর জামালের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীদ্বয়, রাসেলের গলা জড়িয়ে ধরে বিছানায় গড়াগড়ি যাচ্ছিলো। রাসেল শেখ মুজিবের দশ বছর বয়স্ক সর্বকনিষ্ঠ ছেলে। দুই পুত্রবধূকে জঘন্য ভাবে টেনে আলাদা করে অত্যন্ত কাছে থেকে গুলি করে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। রাসেল তখন ঘরের আলনা কিংবা অন্যান্য আসবাবপত্রের আড়ালে পালিয়ে জীবন বাঁচানোর সকরুণ ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু এই নিষ্পাপ শিশুটিকেও ঠিক একইভাবে সজোরে টেনে বের করে অত্যন্ত জঘন্যভাবে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হলো। শেখ মুজিবের ছোট ভাই, শেখ নাসের স্বাধীনতার পর

প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়। সে পাশের একটা বাথরুমে পালিয়ে ছিলো। সেখানেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

শেখ মুজিবের দুই কন্যার মধ্যে শেখ হাসিনা বয়সে বড়। ওরা দু'জনই দেশের বাইরে থাকায় এই ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ থেকে প্রাণে বাঁচে।

নির্মম খুনের নীরব দশর্ক এই 'খুনের বাড়ীটি'র কোন কিছুতেই হাত দেয়া হয়নি বলে, ভয়ঙ্কর ঘটনাটির প্রমাণদি এতদিন ধরে যেন হিমায়িত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিলো।

হত্যাকারীরা এরপর পুরো বাড়ীটা এক এক করে তল্লাশী চালায় এবং মূল্যবান সবকিছু লুটে নেয়। প্রতিটি আলমারী, ড্রয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র ভেঙ্গে ফেলা হয়। এবং মূল্যবান জিনিসপত্র ছাড়া সবকিছুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা হয়। বাড়ীর প্রতিটা কামরাই যে এক একটা কসাইখানা আর সমস্তটা বাড়ী জুড়ে যেন মৃত্যুর গন্ধ দর্শনার্থীদের ব্যাকুল করে তুলেছিলো।

মৃত্যুর পরেও শেখ মুজিবকে আর একদফায় অবমাননা করা হলো। ফারুক জানিয়েছিলো, হত্যাকারীদের একজন জীবদ্দশায় শেখ মুজিবকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পায়নি। সুতরাং খুব কাছে থেকে বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্যে সে তার পায়ের বুট মুজিব-দেহের নীচে দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে বুটের হেঁচকা টানে প্রাণহীন মরদেহটি উল্টিয়ে দিয়ে মনের সুখে বঙ্গবন্ধুর হাসিমাখা মুখখানি দেখার সাধ মিটায়। এর প্রায় চার ঘন্টা পর সরকারী তথ্য দফতর থেকে আগত এক বিশেষ ফটোগ্রাফার ঐ অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর ছবি উঠায়।

শেখ মুজিবের বাড়ীর কাছাকাছি সেরনিয়াবাত আর শেখ মনি'র বাড়ীও ঐ সময়ে হত্যাকারীদের ভিন্ন দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে গেছে।

ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে ডালিমের দল আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়ীতে পৌঁছে। ঐ বাড়ীতে মাত্র একজন পুলিশ পাহারাদার ছিলো। সম্ভবতঃ তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্যে আক্রমণকারীরা গুলি চালায়। বন্দুকের গুলির আওয়াজে বাড়ীর সবাই জেগে উঠে। কেবিনেট মন্ত্রীর ৩০ বছর বয়সের ছেলে আবুল হাসনাত জানায়, সে জানালা দিয়ে কালো উর্দি পরা সৈনিকদের তার বাড়ীর দিকে গুলি চালাতে দেখে। তার কাছে সব সময় যে স্টেনগানটা থাকতো, তা নিয়ে হাসনাত দৌঁড় চলে এলো, দু'তলায় তার বাবাকে জাগিয়ে দিতে। আবদুর রব সেরনিয়াবাত তখন শেখ মুজিবকে সাহায্য পাঠানোর জন্যে টেলিফোন করতে ব্যস্ত। লাইন পাচ্ছিলো না। আবারও চেষ্টা করে লাইন পাওয়া গেলো।

হাসনাত স্মৃতিচারণ করে বললো, 'বাবা বঙ্গবন্ধুকে বললেন আমাদের বাড়ী দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক আক্রান্ত। বাবা তাকে সাহায্য পাঠাতে অনুরোধ জানালেন। টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে কেউ খুব চিৎকার করে কথা বলছিলো, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। বাবাও শুনছিলেন। অন্য প্রান্তের কথা শুনে বাবা একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। আমার ধারণা বাবাকে

বলা হয়েছিলো যে, 'বঙ্গবন্ধুর বাড়ীও আক্রান্ত হয়েছে। বাবা আর একটি কথাও বললেন না। তিনি ফোন নামিয়ে বিছানার উপর বসে পড়লেন। তারপর কোন কথা না বলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।'

হাসনাত উঠে একটা জানালায় গিয়ে সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করে। 'গুলির ম্যাগজিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ট্রিগার চেপে রাখলাম। গুলি শেষ হয়ে গেলে আমি আরও গুলির জন্যে উপরতলায় দৌড়ে যাই।' হাসনাত বলছিলো। এতেই সে বেঁচে গিয়েছিলো। মুহূর্তের মধ্যে সৈন্যেরা বেডরুমে ঢুকে পড়ে এবং সেরনিয়াবাতকে বসা অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। তারপর তারা বাড়ীর সবাইকে ধরে নিয়ে নীচতলার ড্রইং রুমে জড়ো করে।

ইতিমধ্যে হাসনাত উপরতলায় তার স্টেনগানের জন্যে রাখা অতিরিক্ত গুলির ম্যাগজিন বের করার জন্য ট্রাংক ভাঙ্গার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। তালা ভাঙ্গার প্রচেষ্টা চলাকালে সে গুলির আওয়াজ এবং উপরতলায় এগিয়ে আসছে এমন সৈনিকের বুটের আওয়াজ শুনতে পায়। সে তখন তার গুলিহীন স্টেনগান মেঝেতে রেখে ছাদের উপর দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তখন সে লাফ দিয়ে চিলে কোঠার মেঝেতে বসে পড়ে এবং সৈন্যদের আগমনের অপেক্ষা করতে থাকে। নিশ্চয়ই এখন তার মরার পালা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কেউ এদিকে এলো না।

২০ মিনিট ধরে সে থেমে থেমে গুলির আওয়াজ আর চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ পরেই সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলো আর সৈন্যদের বুটের আওয়াজ দূরে রাস্তায় মিলিয়ে গেলো। বাড়ীর সবকিছু থেমে যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করছিলো। তারপর অনেক সন্তর্পণে হাসনাত নেমে এলো নীচতলায়। ড্রইং রুমে এসে দেখে তা এক কসাইখানায় পরিণত হয়ে গেছে। চতুর্দিকে কেবল রক্ত, মৃত দেহের স্তূপ আর ভাঙ্গা-চূরা আসবাবপত্র। তার স্ত্রী, মা আর বিশ বছরের একটি বোন গুরুতরভাবে আহত। তার দুই কন্যা অক্ষত অবস্থায় সোফার পেছনে পালিয়ে থেকে ভয়ে কাঁপছিলো। আর তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে, দশ ও পনের বছরের দু'টি বোন, ১১ বছর বয়সী তার ছোট ভাই, আয়া, কাজের ছেলে আর তার চাচাতো ভাই শহিদুল ইসলাম, সেরনিয়াবাত-এর লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। শহিদুল ইসলামের বড় বড় গোঁফ ছিলো এবং দেখতে অনেকটা হাসনাতের মত ছিলো। সেই কারণেই হয়তো হত্যাকারীরা হাসনাত ভেবে শহিদুল ইসলামকে ভুল করে হত্যা করে গেছে। শেখ মুজিবের ভাগ্নির বিয়ে উপলক্ষে হাসনাতের দশজন বন্ধু বরিশাল থেকে এসেছিলো, তাদের মধ্যে একজন নিহত আর পাঁচজন আহত হয়। পরে হাসনাত বাড়ী থেকে বেরিয়ে ভারতে পালিয়ে যায়।

শেখ মনি'র বাড়ীতে আক্রমণটি অত্যন্ত সংক্ষিত হলেও রীতিমত প্রলয়ঙ্করীগোছের। শেখ মনির ঘুম অত্যন্ত পাতলা বলে প্রতীয়মান হয়। রিসালদার মুসলেহউদ্দিন দুই ট্রাক

ভর্তি তার লোকজন নিয়ে মনি'র বাড়ীর দিকে এলেই সে ঘুম থেকে লাফ দিয়ে উঠে একেবারে বিছানায় বসে পড়ে। সৈন্যদেরকে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, 'তারা তার বাড়ী পাহারা দেবার জন্যে এসেছে কি না। মুসলেহউদ্দিন তাকে নীচে নেমে আসতে অনুরোধ করে। মনি নীচে নেমে আসে। আসার সঙ্গে সঙ্গে মনিকে সে (মুসলেহউদ্দিন) ধরে ফেলার চেষ্টা করে। ঐ মুহূর্তে মনি'র সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী স্বামীকে বাঁচানোর জন্যে লাফ দিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আর অমনি স্টেনগান দিয়ে গুলি করে উভয়কে চিরশয়নে শায়িত করা হয়। বাড়ীর আর একটা লোককেও স্পর্শ করা হলো না। মুসলেহউদ্দিনের জন্য নির্দিষ্ট মিশন সম্পন্ন করে সে শেখ মুজিবের বাড়ীর দিকে গাড়ী চালিয়ে দিলো।

সকলকে তাদের প্রলয়ঙ্করী মিশনে পাঠিয়ে দিয়ে, রশিদ সোজা চলে গেলো স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকতের বাসায়। সে তাকে তার মিগ নিয়ে পূর্ব প্রস্তাবিত মতে প্রস্তুত থাকার জন্যে সতর্ক করতে গেলো। তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে পুরো ঘটনাটা সম্বন্ধে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলতে তার কয়েক মিনিট সময় লেগে গেলো। লিয়াকত বিমান বাহিনী প্রধানের নির্দেশ ব্যতিরেকে কিছু করতে পারবে না বলে জানিয়ে দিলো। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে চললো ৪৬তম পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর হাফিজের উদ্দেশ্যে। মেজর হাফিজ পূর্ববর্তী পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত থাকলেও সে শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিলো। ১৬তম ইস্ট বেঙ্গলের মেজর শাহজাহান জয়দেবপুর থেকে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে ব্যর্থ হবার কারণেই রশিদ মেজর হাফিজকে দিয়ে ফার্স্ট ইস্ট বেঙ্গলকে বের করে তাদের সঙ্গে জড়িত করতে চেয়েছিলো। তার প্রত্যাশা ছিলো যে, অভিযান যখন শুরু হয়ে গেছে তখন ব্রিগেড মেজর তাদের সঙ্গে যোগ দিতে এখন আর কোন ইতস্ততঃ করবে না।

যেভাবেই হোক হাফিজ তার পদাতিক ব্রিগেড বের করতে অস্বীকৃতি জানায়। সে তার ব্রিগেড কমান্ডার কিংবা সেনাবাহিনী প্রধানের নির্দেশ ছাড়া নড়তে পারবে না বলে জানিয়ে দেয়। কিছু গরম বাক্য বিনিময়ের পর হাফিজ তার কমান্ডিং অফিসার শাফাত জামিলকে টেলিফোনে মিলাতে চেষ্টা করে। কিন্তু টেলিফোনে তাকে পাওয়া গেলো না। রশিদ তাকে তার জীপে চড়িয়ে শাফাত জামিলের বাসায় নিয়ে যায়। যখন তারা জামিলের বাসার কম্পাউন্ডে ঢুকে, তখনই ধানমন্ডির দিক থেকে হাউইটজারের প্রথম গোলা নিক্ষেপের আওয়াজটি তাদের কানে ভেসে আসে।

রশিদ জানায় যে, সে ব্রিগেড কমান্ডারকে আঘাত হানার ব্যাপারটি বর্ণনা করছিলো। তার ভাষায়ঃ 'স্যার, শেখকে উৎখাত করার জন্যে আমরা অভিযান শুরু করে দিয়েছি- ।' তার যতটুকু স্মরণে আছে, এতে শাফাত জামিল শোকাভিভূত ও রেগে আগুন হয়ে উঠে। সে নিজেও তখন দূর থেকে ভেসে আসা কামানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলো। দুই

অফিসারের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। এমন সময় জামিলের টেলিফোন বেজে উঠে। ফোন করেছে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ। শেখ মুজিবের টেলিফোনের বরাত দিয়ে জেনারেল শফিউল্লাহ তাকে জানায় যে, কিছু সৈন্য প্রেসিডেন্টের বাড়ী আক্রমণ করেছে। এক্ষুণি তাকে ব্রিগেড নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাহায্যে ছুটে যেতে নির্দেশ দেয় শফিউল্লাহ।

রশিদ বলে, 'আমি জামিলকে বললাম, কিছু একটা করার মতো এখন আর সময় নেই। আমরা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছি।' শাফাত জামিল টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলো। সে রাগে ফেটে পড়ছিলো। কিন্তু কিছুই করলো না। তারপর সে আমাকে বললো, "আমি জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে এক্ষুণি দেখা করছি।" আমি তাকে বাধা দিতে চাইলাম না। তখনই রশিদ তার জীপে চড়ে প্রচন্ড গতিতে ধানমন্ডির দিকে ছুটে চললো।

রশিদ চলে যাবার পর জেনারেল শফিউল্লাহ্ আবারও জামিলকে টেলিফোন করলেন। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে জেনারেল তাকে জানান যে, শেখ মুজিব আর ইহজগতে নেই। তাঁকে ওরা খুন করে ফেলেছে। সেনাবাহিনীর প্রধান স্পষ্টতঃই সাংঘাতিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। সে কারণে তিনি জামিলকে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশটি পর্যন্ত দিতে পারলেন না। সুতরাং ঝটপট তার উর্দি গায়ে জড়িয়ে জামিল জেনারেল জিয়ার বাসভবনে হেঁটে গিয়ে উপস্থিত হন। জামিল গিয়ে দেখেন জেনারেল জিয়া তখন সেভ্ করছেন।

রশিদের কথা আর জেনারেল শফিউল্লাহ্‌র টেলিফোনের বর্ণনা দিয়ে জামিল জিয়াকে বলে, 'স্যার প্রেসিডেন্টকে খুন করা হয়েছে। এখন আমাদের করণীয় দিক নির্দেশ করুন।'

জেনারেল জিয়াকে অত্যন্ত শান্ত দেখাচ্ছিলো। স্পষ্টতঃই তিনি ঘটনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত বলে মনে হচ্ছিলো। জিয়া উত্তর করলেনঃ 'প্রেসিডেন্ট যদি বেঁচে না থাকেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট তো আছেন? তোমরা হেড কোয়ার্টারে যাও এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করো।'

জিয়া তড়িঘড়ি করে সঙ্গে সঙ্গেই কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত রইলেন। শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন। পরিস্থিতি একেবারেই ঘোলাটে। এই অবস্থায়, ফারুক যা ধারণা করেছিলো, অন্যান্য সকল সিনিয়র অফিসারদের মতো জেনারেল জিয়াও অপেক্ষা করে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় তা দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন।

শেখ মুজিবের বাড়ীতে পৌঁছে রশিদ দেখতে পায় সবকিছুই একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। সৈন্যেরা বাড়ীর বাইরে টহল দিচ্ছিলো। তার এক প্রশ্নের জবাবে একজন কনফার্ম করলো যে, বঙ্গবন্ধু আসলেই খুন হয়েছে। রশিদ জানায় যে, সে পুরো পরিবারটিকে খতম করা হয়েছে জানতে পেরে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়ে। তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় আজ এই অবস্থা। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিলো যে, এটি একটি মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। এতে

করে জনগণের সমর্থন তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ওরা নিন্দিত হবে। একই সময়ে রশিদ এটাও ভাবলো যে, সৈনিকদেরকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। কারণ তার ভাষায়, এটা সামরিক অভিযান, এতে যে কেউ মারা যেতে পারে।' তথাপি, সে বাড়ীর ভেতরে যাবার আগ্রহী হলো। পরে কি ভেবে সে তার জীপ ঘুরিয়ে ক্যান্টনমেন্টের ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে ফিরে এলো।

স্মৃতিচারণ করে রশিদ বললো, 'কর্ণেল শাফাত জামিল আর অন্যান্য সিনিয়র অফিসারেরা সেখানে উপস্থিত ছিলো। আমি তাদেরকে বললাম যে, শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। এখন আর কোন হস্তক্ষেপ বা ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সকলকেই যার যার জায়গামত অবস্থান করা উচিত। আর রক্ষীবাহিনী যদি কোন কারণে চড়াও হয় তাহলে তাদেরকে ঠেকানোর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।'

সে জানায় যে, সব অফিসারই অত্যন্ত রোষান্বিত হয়ে উঠছিলো। কিন্তু কেউ কোন উচ্চবাচ্য করেনি। তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছিলো। 'সকলেই ভাবছিলো, শেখ মুজিব তো চলে গেছেন। এখন তাদের ভাগ্যে কি ঘটে তা হচ্ছে আসল ব্যাপার।'

ইতিমধ্যেই ফারুক নিশ্চিত হয়ে নিলো যে, শেখ মুজিব আর বেঁচে নেই। তার এখন কাজ হলো রাজধানীর নিরাপত্তা বিধান করা। সে তার ট্যাংক বহর থেকে ১০টি ট্যাংক বের করে নিয়ে ছুটে চললো রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরের দিকে। এখন সে রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কমান্ডিং অফিসারের মোকাবেলা করবে। তার স্মরণে আছে, 'কমান্ডিং অফিসার তখন ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। ট্যাংকগুলোকে সারিবদ্ধভাবে সাজানো দেখতে পেয়ে সে ভাবলো যে আমি তাকে আক্রমণ করতে ছুটে এসেছি। ফারুক তাকে জানালো যে, এখন থেকে রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে একীভূত করা হলো। এবং তাদেরকে সেনাবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর সদর দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ফারুক টেলিফোন উঠিয়ে, 'মিলিটারী অপারেশনস্-এর পরিচালক কর্ণেল নূর উদ্দিনের সঙ্গে আলাপ করে নিলো। ফারুক তাকে জানালো যে রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসা হয়েছে। এই কাজটি সম্পন্ন হবার পর শেখ মুজিবের ঝটিকা বাহিনী আর হুমকির কারণ হয়ে রইলো না।

পরে, মিরপুর রোড ধরে শেখ মুজিবের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় একদল ল্যান্সার-এর আহবানে সে সেখানে নামে এবং দেখতে পায় যে, ওরা তিনজন লোককে ধরে অত্যন্ত শক্তভাবে মাটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ওরা তাকে বলে, 'মুজিবের বাড়ীর দিকে যাবার চেষ্টা করলে আমরা তাদের পাকড়াও করি।' ওদের খতম করে দেবো না কি? ফারুক দু'জন কম বয়সী লোককে চিনতে পারলো না। দেখামাত্রই সে তৃতীয় লোকটিকে চিনে ফেললো। ঐ লোকটি প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব, ব্রিগেডিয়ার মাশহুরুল হক। তিনদিন আগে ফরিদার বিবাহ বার্ষিকীতে এই লোকটিই ফরিদাকে বিরাট

বড় এক ফুলের তোড়া দিয়ে বাজিমাত করার গৌরব অর্জন করেছিলো। ফারুক তার সৈন্যদেরকে শান্ত করলো। আর কোন খুনের প্রয়োজন নেই বলে সে তাদেরকে জানিয়ে দিলো।

ফারুক বলেই চললো, 'আমি তখন আমার ট্যাংকগুলো দিয়ে মার্চ করতে করতে সেকেন্ড ক্যাপিটাল রোড, ফার্মগেট হয়ে একেবারে সোজা ক্যান্টনমেন্টে চলে যাই। সেখানে পৌঁছে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের সামনে আমার সব ট্যাংক পার্ক করি। আমি সেখানে তাদেরকে বলিঃ আমরা আমাদেরকে আপনাদের কমান্ডে ন্যস্ত করলাম।'

ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের অফিসারদের মধ্যে স্পষ্টতঃই একটা বিরোধী ভাব ফুটে উঠছিলো। ভাবখানা এ রকম যে, 'কে তুমি ঐ দিনের ছোকরা ট্যাংক কমান্ডার দেশের প্রেসিডেন্টকে খুন করে বাহাদুরী দেখাতে চাইছো?' বাকী সবাই ক্ষুব্ধ কিন্তু কিছু বলছিলো না। ফারুক জানায়, 'আমি তাদের বৈরীভাব বুঝতে পারছিলাম। তারা যেন বলতে চাইছিলো, 'তুমি একজন অনাকাঙ্ক্ষিত।' আমি কর্ণেল শাফাত জামিলের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও সে প্রচন্ডভাবে চটে উঠে বলতে থাকে, 'কে তোমাকে উপদেশ দিতে বলেছে? বন্ধ কর তোমার মুখ।'

রশিদ জানায়, তাদের অভিযানের সাফল্যে সে এতই প্রলুব্ধ হয়ে গিয়েছিলো যে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমেদকে না বসিয়ে নিজেরাই ক্ষমতা দখলের চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিলো। এক নজরে সে পরিস্থিতিটা একবার মিলিয়ে দেখে নিলো। রক্ষীবাহিনীকে ফারুকের ট্যাংক পরাস্ত করে দিয়েছে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার গভীর শোকে মুহ্যমান। সেনাবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লেও, কাজ যখন শেষ হয়ে গেছে, এটা ধরে নেয়া যায় যে, ওরা মেজরদের কিছু অনুসরণ করতে দ্বিধা করবে না। সে আরও বেশী আস্থাবান হয়ে উঠেছিলো এই কারণে যে, জনগণ শেখ মুজিবের জন্যে এক ফোঁটা চোখের পানিও ফেলছিলো না। কিন্তু জনগণ যদি একবার জেনে ফেলে যে শেখ মুজিবের পুরো পবিবারকেই একেবারে নৃশংসভাবে খতম করে দেয়া হয়েছে, তখন জনগণের প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নিয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো।

এই মুহূর্তে এটাই ছিলো রশিদের মূল বিবেচ্য বিষয়। এই ভবিষ্যতের উপর চিন্তা করতে গিয়ে মোশতাকের বাড়ীতে যেতে রশিদের ২০ মিনিট দেরি হয়ে গেলো। এরই মধ্যে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও রশিদ শুনতে পায়, ডালিম রেডিওতে শেখ মুজিবের হত্যার ঘোষণা দিচ্ছে। আরও বলছে যে, সেনাবাহিনী খন্দকার মোশতাক-এর নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করেছে। ডালিম আরো বলছে যে, দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছে। দেশটি এখন থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত হবে।

বুঝতে বাকী রইলো না যে, ডালিম এবং কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার মিলে বিশৃঙ্খলা আর গোঁয়ার্তুমি দেখিয়ে শেখ মুজিব আর সেরনিয়াবাতকে হত্যা করে রেডিও

স্টেশনে ছুটে যায়। সেখানে গিয়ে মাইক্রোফোন নিয়ে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর ডালিম তার নামে এই ঘোষণা দেয়।

ঘোষণাতে রশিদ আঘাত পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে বলে, 'আমি জানতাম, এটা আমাদের জন্যে সমস্যার সৃষ্টি করবে। কারণ, ঢাকার বাইরের ব্রিগেডগুলো হয়তো জানতে চাইবে, ডালিমের মত একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটালো কি করে?' অভ্যুত্থান তো কেবলই একটা সেনাবাহিনীর দ্বারা সংগঠিত হতে পারে। তার মতো অবসরপ্রাপ্ত একজন লোক কিভাবে সেনাবাহিনীর হয়ে কথা বলে। ওরা তা মেনে নেবে না।

ক্ষমতা দখলের চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে, রশিদ দ্রুত ছুটে চলে খন্দকার মোশতাক আহমেদের বাড়ীর দিকে।

৮

মোশতাকের ক্ষমতা গ্রহণ

আমি টয়লেট গেলাম। সেখানে বসে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্যে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম।

—খন্দকার মোশতাক আহমেদ

সময় সকাল ৭টা ৩০ মিনিট।

একটা ট্যাংক পেছনে নিয়ে রশিদের জীপ ঢাকার আগা মসিহ্ লেনের একটি বাড়ীর সামনে এসে থেমে যায়। বাড়ীটি খন্দকার মোশতাক আহমেদের। বাড়ীটি পুরনো ফ্যাশনের তিনতলা দালান। ছোট্ট একটু জায়গার মধ্যে আরও অধিক পুরনো বাড়ী দ্বারা ঘেরা ছিলো এটি। ট্যাংকের বিকট গর্জনে ইতিমধ্যেই চারিদিকের পাড়া-প্রতিবেশীর জেগে উঠেছে। শত শত মানুষ এর আগেই ডালিমের মারাত্মক বেতার ঘোষণা শুনে হতচকিত হয়ে উঠেছিলো। ঐ অবস্থায় একটা ট্যাংক তাদের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে, নাটকের পরবর্তী দৃশ্য অবলোকন করার জন্যে প্রচুর লোকের ভিড় জমে গেলো। সকলেই যার যার সুবিধেমত—কেউ জানালার ফাঁকে, কেউ ছাদের উপরে, কেউবা অন্য পথে নীরবে লক্ষ্য করছিলো। কিন্তু কেউ ট্যাংকের ধারে কাছেও আসতে সাহস পেলো না।

মোশতাক তাঁর উপরতলার বেলকনি থেকে ট্যাংক কামানের বিষাক্ত মুখ তাঁর বাড়ীর দিকে তাক করা দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠেন। মুহূর্তের মধ্যেই রশিদ অত্যন্ত আলুথালু অবস্থায় সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতে লাগলো। হাতে একটি স্টেনগান আর পেছনে দু'জন সশস্ত্র সৈনিক।

মেজর রশিদ কিন্তু তার পূর্ববর্তী তিনটি আলোচনা সভায় তাকে শেখ মুজিবের স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারটি মোটেই গোপন রাখেনি। কিন্তু খন্দকার মোশতাক অন্য একজন রাজনীতিককে পুরোপুরি বিশ্বাস করার মতো অতটা কাঁচা লোক নহেন। তাছাড়া, ঐ রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে একজন সামরিক অফিসারকে বিশ্বাস করার তো প্রশ্ন উঠে না। ডালিমের বেতার ঘোষণার পর বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে গেছে, তার উপরে আবার

ট্যাংকের উপস্থিতি। সব মিলিয়ে মোশতাক অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে বিভিন্ন রকমের দুশ্চিন্তা উঠানামা করছিলো। পাল্টা অভ্যুত্থানে তাকে সরিয়ে দেয়ার পর মোশতাক ১৯৭৫-এর ১১ ও ১২ই ডিসেম্বর দু'টি দীর্ঘ সাক্ষাতকারে আমাকে ঐ ঘটনাবলীর পূর্ণ বিবরণ প্রদান করেছিলেন।

স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, 'ওরা আমাকে হত্যা করতে এসেছিলো কি-না, তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো। তাদের হাতে ছিলো অস্ত্র এবং তাদেরকে অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হচ্ছিলো। ওরা কি করে, তা দেখার জন্যে আমি ওদের হাতের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার দিকে তাদের বন্দুক তাক করার পরিবর্তে তাদের দু'একজন আমাকে স্যালুট দিতে লক্ষ্য করে আমি কিছুটা হালকা বোধ করলাম। সুতরাং আমি সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কি মনে করে এ পর্যন্ত এসেছেন?" আর যাই হোক না কেন, মোশতাক একজন ভালো অভিনেতা।

রশিদ মোশতাককে জানায় যে, সে তাকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্যে নিতে এসেছে। এ কারণে তাকে এখন রেডিও স্টেশনে যেতেই হবে। শব্দগুলো মোশতাকের কানে যেন মধু বর্ষণ করছিলো। তবু তাঁর মনে একটা সন্দেহ রয়েই গিয়েছিলো। তখনও রশিদকে তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি তাকে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি মেজরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা যাব কিভাবে? আমরা কি আপনার জীপে চড়ে যাব, না কি আমার গাড়ীতে করে যাব?' এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো যে, তিনি কি সসম্মানে তাঁর গাড়ীতে চড়ে যেতে পারবেন, না সামরিক জীপে বন্দী হয়ে যাবেন। রশিদ মোশতাককে বললো, গাড়ীর ড্রাইভারের উপর বিশ্বাস করা গেলে, তারা গাড়ীতেই যেতে পারেন। এখন মোশতাক আরও একটু স্বস্তি পেলেন। তারপর মোশতাক মেজরকে বললেন, 'ঠিক আছে, আমাকে একটু সময় দিতে হবে। আমার সামান্য একটু কাজ বাকী আছে। তারপর আমাকে আমার কাপড়-চোপড় পরতে হবে।'

তিনি বলছিলেন, 'আমি টয়লেটে গেলাম। সেখানে বসে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্যে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। টয়লেটে বসে আমি চিন্তা করার কিছুটা সময় পেয়েছিলাম।'

তারা সবাই গাড়ীর কাছে নেমে এলেন। মোশতাকের মনে তখনও কিছুটা সন্দেহ বিরাজ করছিলো, তিনি রশিদকে আরও একবার পরীক্ষা করে নিচ্ছিলেন। তিনি আমাকে জানান, 'গাড়ীর দরজা কে খুলবে এ নিয়ে আমি কিছুটা গড়িমসি করছিলাম। ওরা যে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। আমাকেই যদি দরজা খুলে গাড়ীর উঠতে হয়, তাহলে এর অর্থ হবে এই যে—ওরা আমাকে আসলে হত্যা করতে নিয়ে চলেছে। আর যদি দরজাটা আমাকে কেউ খুলে দেয়,

তাহলে বুঝে নেব যে, ওরা আমাকে সসম্মানে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম।'

সমস্যা মিটে গেলো। একজন সৈন্য চৌকসভাবে এক স্যালুট দিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে দিলো এবং অত্যন্ত নম্রভাবে আমাকে গাড়ীর ভিতরে বসার ইঙ্গিত করলো। মোশতাকের সন্দেহ ছুটে গেলো। তিনি জানান, 'এটা ছিলো একটা আশ্চর্য নাটক।'

রেডিও স্টেশনে যাবার পথে মোশতাক দেখতে পেলেন যে, শেখ মুজিবের মৃত্যুতে জনগণের মাঝে তেমন কোন দুঃখের বহিঃপ্রকাশ নেই। এতে তিনি আরও স্বস্তি পেলেন। তিনি বললেন, 'জনগণকে শোকাহত মনে হচ্ছিলো। কিন্তু কিছু লোককে উল্লাসে চিৎকার করতেও দেখা গেছে।'

রেডিও স্টেশনে পৌঁছে মোশতাক তাঁর মাঝে আস্থা ফিরে পেতে থাকলেও তাঁর মনের কোণে একটা ভীতি তখনও উঁকি দিচ্ছিলো। মেজরেরা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে শেখ মুজিবের স্থলে তাকে বসালেও তিন বাহিনী প্রধান আর সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা অমীমাংসিত প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। তিনি জানতেন যে, তাদেরকে কব্জা করতে না পারা পর্যন্ত তাঁর পুরো নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। সুতরাং তিনি রশিদকে বললেন যে, তিন বাহিনী প্রধানকেও এখানে নিয়ে আসতে হবে। রশিদ এটাকে একটা ভাল প্রস্তাব বলে মনে করলো। খন্দকার মোশতাককে তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের সঙ্গে রেখে সে ক্যান্টনমেন্টের দিকে রওয়ানা দিলো। তথ্যমন্ত্রী ঠাকুর তখন মোশতাকের বেতার ভাষণ চূড়ান্ত করার কাজে ব্যস্ত। ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে রশিদ দেখতে পায় চীফ অব জেনারেল স্টাফ, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্ণেল শাফাত জামিল এবং আরো কিছু উর্ধ্বতন অফিসার সেখানে আলাপ করছে। সে চীফ অব জেনারেল স্টাফকে ট্যাংকের জন্যে কিছু গোলাবারুদ সরবরাহ করতে অনুরোধ জানালে সে সানন্দে রাজী হয়ে যায়। খালেদ মোশাররফ রশিদকে আরো আশ্বাস দেন যে, সে তাদের হয়ে তিন বাহিনীর প্রধানের সমর্থন আদায়ে সহযোগিতা করবে। আধা ঘন্টার মধ্যে সে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ, এয়ার ভাইস মার্শাল এ, কে, খন্দকার আর কমোডর এম, এইচ, খানকে নিয়ে এসে হাজির হলো। তাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর উপ-স্টাফ প্রধান, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানও এলেন।

তিন বাহিনী প্রধানকে রশিদ তাদের কৃতকর্মের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয় এবং ঐ ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা কামনা করে। সে তাদেরকে বলে, 'আমরা দেশের বৃহত্তম স্বার্থেই তা করেছি।' 'আমরা আপনাদেরকে ত্যাগ করছি না এবং আমরা ক্ষমতায়ও যেতে চাচ্ছি না। আমরা বরং আপনাদের নেতৃত্ব চাই। সুতরাং আপনারা রেডিও স্টেশনে আসুন এবং যা কিছু করণীয় করুন।'

ফারুক যেমনি ধারণা করেছিলো, ঠিক তেমনি তা সত্যে পরিণত হলো। মুজিবের

মৃত্যুর খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই জেনারেলরা এক কাতারে এসে দাঁড়ালো। ঐ পরিস্থিতিতে কেউ মেজরদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহস পেলো না।

পরের পরিস্থিতি সম্বন্ধে খন্দকার মোশতাক আমাকে বিশদ বিবরণ প্রদান করেন, 'আমি একজন উকিল।' আমি জানি কিভাবে মানুষকে ফাঁদে ফেলতে হয়। আমকে যেহেতু দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হচ্ছিলো, সে জন্যে আমিও সামরিক বাহিনীর আনুগত্য আদায় করতে চাইলাম। সুতরাং আমি জেনারেল শফিউল্লাহর দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, "আমাকে বলুন, এ কাজ কি আপনি করেছেন?" শফিউল্লাহ বেকায়দায় পড়ে গেলো। তার সামনেই ছিলো শেখ মুজিবের হত্যাকারী মেজরবৃন্দ। জীবনের ভয়ে সে পিছাতেও পারছিলো না। সুতরাং সে আস্তে আস্তে আমাকে বললো, "হ্যাঁ, আমরাই তো করেছি।" তারপর একে একে আমি অন্য বাহিনীর প্রধানদেরও ঐ একই প্রশ্ন করলাম। তারাও ঠিক একই উত্তর দিলো। আমি বুঝতে পারছিলাম, 'তারা সবাই অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। এছাড়া ওদের আর কোন উপায়ও ছিলো না।

মোশতাক বলেই চললেন, 'আমি তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম' ঃ "আপনারা আমাকে দিয়ে কি করতে চান?" তারা আমাকে বললোঃ "আপনি দয়া করে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করুন। এখন বাংলাদেশে আপনিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব।" "আমি তাদেরকে বললাম, আমি একজন বেসামরিক গণতন্ত্রমনা লোক। আমি ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারি এই শর্তে যে, আমার সরকার হবে একটি বেসামরিক ও গণতান্ত্রিক সরকার। আপনারা এতে মাথা ঘামাতে পারবেন না।" (বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তহত্যা, আর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে সরকারের গোড়াপত্তন, সে সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকার-এর মর্যাদা দিতে গিয়ে তিনি কি বুঝাতে চাইছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন করে আমি ঐ পরিস্থিতিতে মোশতাককে বিব্রত করতে চাইনি)।

মোশতাক বললেন, জেনারেলরা পাশের একটি কামরায় চুপিচুপি আলাপ করতে চলে গেলো। আধা ঘন্টা পরে তারা ফিরে এসে তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করলো। তারপর তিনি একে একে সবাইকে নিয়ে তার সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়ে বেতারে প্রচার করে দেন। ১১টা ১৫মিনিটে যখন তিনি তাঁর নিজের ভাষণ প্রচার করেন, তখন পুরো পরিস্থিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। মেজররা তাকে প্রেসিডেন্ট বানালেও তিনি তাদের ক্রীড়নক হতে চাননি।

প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে তিনি শেখ মুজিবের সমালোচনা করেন এবং সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের জন্যে জনগণের উদ্দেশ্যে কিছু প্রতারণামূলক কথা উচ্চারণ করেন। তিনি এই হত্যা আর অভ্যুত্থানকে 'ঐতিহাসিক প্রয়োজনে' করা হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'সকলেই এই শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছিলো। কিন্তু প্রচলিত নিয়মে পরিবর্তন সম্ভব ছিল না বলেই সরকার পরিবর্তনে

সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়েছিলো। সেনাবাহিনী জনগণের জন্যে সুযোগের 'স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছে।' মোশতাক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এও প্রতিজ্ঞা করেন যে, এই সরকার কখনও কোন ধরনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি কিংবা সামাজিক অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করবে না।' কিন্তু তিনি সত্যের অপলাপ করেছিলেন। কারণ, হত্যার মত জঘন্যতম অপরাধের সঙ্গে তিনি আপোষ করে চলেছিলেন।

বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারেও খন্দকার মোশতাক জনগণের সঙ্গে শঠতার পরিচয় দেন।

ডালিমের ঘোষণায় ঐদিন সকাল বেলায় প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে নিয়েছিলো যে, বাংলাদেশ এখন থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। ফারুক, রশিদ দু'জনেই তা চাচ্ছিলো।

বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করার নামে শেষ পর্যন্ত জনগণকে ঠকানোর দোষে মোশতাক নিজেই দোষী।

ঐদিন সকাল বেলায় ডালিমের বেতার ভাষণ থেকে প্রত্যেকেই ধারণা করেছিলো যে, বাংলাদেশ এখন থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়ে গেছে। ফারুক আর রশিদেরও ঠিক একই রকম ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু মোশতাক তাঁর মনে অন্য চিন্তা লুকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটি পাল্টাতে চাইলেন না। কিন্তু ঐ মুহূর্তে তিনি অত্যন্ত সুচতুরভাবে এই অপ্রিয় সিদ্ধান্তই জনগণের কাছে ঘোষণা করা থেকে বিরত রইলেন। এর পরিবর্তে তিনি প্রত্যেককে বোকা বানিয়ে তাঁর ভাষণের শুরুতে আল্লাহর নামটি জুড়ে দেন এবং 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলে শেষ করেন। তাঁর ভাষণের আগাগোড়ায় বিভ্রান্তি আর প্রতারণার ছাপ ছিলো। ভাষণের পরে ৮৫% ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত দেশের জনগণের মনে একটা ধারণার জন্ম নিলো যে, দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হতে যাচ্ছে। তিক্ত সত্যটি তারা পরে জেনে ফেলেছিলো। বাংলাদেশ ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়নি। শেখ মুজিবের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার আর তাঁর আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য সাধনের ঘোষণা অপরিবর্তিত থেকে যায়। মোটকথা, প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমেদ আওয়ামী লীগের ঐতিহ্যই বহন করে চলছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে খন্দকার মোশতাক তাঁর অবস্থান মজুবত করে নিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে অভিযোগ তোলার আর সময় ছিলো না।

বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের একটা ভাল অংশ বৃটেনে বসবাস করে। বৃটেনবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে খন্দকার মোশতাকের ভাষণ একটা সাংঘাতিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ডালিমের প্রথম ঘোষণায় বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার কথা শুনে সেখানকার ধার্মিক মুসলমানেরা অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠে। কিন্তু খন্দকার মোশতাক-এর বেতার ভাষণের মূল বিষয়টি জানার পর তারা নিতান্তই হতাশ হয়ে পড়ে।

ভাষণের ব্যাখ্যা চেয়ে শত শত টেলিফোন কল লন্ডনের বাংলাদেশী দূতাবাসকে অতিষ্ঠ করে তুলে।

তাদের একজন ডেপুটি হাই কমিশনার ফারুক চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করে, 'বাংলাদেশ কি ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে, না কি হয়নি?' ডেপুটি হাই কমিশনার জানায় যে, তা ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়নি। তখন অত্যন্ত দুঃখ করে ঐ লোকটি বলে, 'এটাই যদি হবে, তবে আপনারা শেখ মুজিবকে হত্যা করেছেন কেন?'

মোশতাকের বিভ্রান্তিকর ভাষণে বাংলাদেশীরাই কেবল বিব্রত হয়নি। দেশটিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা দেয়ার প্রশ্নে সৌদি আরবও বিব্রত বোধ করে। তারা বাংলাদেশের জনগণের জন্যে বহুবার শুভেচ্ছাবাণী পাঠালেও প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি দান স্থগিত রাখে। কারণ, তাদের ধারণা ছিলো, মুসলমান জনগণের জন্যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়া উচিত।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট। তিনি পরে শেখ মুজিবের ভ্রাম্যমান দূত নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে বাদশাহ্ ফয়সালের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভার আলোকে তিনি আমাকে সৌদি আরবের অবস্থানের ব্যাখ্যা দেন।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেলে কি বুঝানো হয়েছে তার ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন বাদশাহ্ ফয়সল। তিনি এমনভাবে বিষয়টা বর্ণনা করলেন, যা বাদশাহ সোলায়মানকেও অভিভূত করতে পারতো। 'আমি বাদশাহকে বলেছিলাম যে, আমি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিভিন্ন সময়ে এই বিশেষ আর্টিকেলটার সূত্র ধরে বলেছি যে, এতে ধর্মহীনতা বুঝানো হয়নি। এর মানে এই যে, বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী সকল লোককে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সমান অধিকার দেয়া হবে। অর্থাৎ তারা তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষা করতে পারবে এবং তাদেরকে তাদের জীবনযাত্রায় সমান অধিকার দেয়া হবে। যেহেতু কেবল একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্ম ছাড়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অতএব, রাজন্ আপনি বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ধরে নিতে পারেন।'

বিচারপতি চৌধুরী বলে যেতে লাগলেনঃ 'ক্ষণিকের জন্যে মনে হয়েছিলো যে, বাদশাহ ফয়সল বুঝি আমার যুক্তিতে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বললেন, বাংলাদেশের সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটি বাদ দিয়ে দেশটিকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা করলে তিনি খুশী হবেন। তিনি অন্য একটা আর্টিকেলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলেন যে, 'সংখ্যালঘুদের উপর কোন প্রকার উৎপীড়ন করা হবে না—বাক্যটিই তো তাদের সুরক্ষার জন্যে যথেষ্ট।' বাদশাহ ফয়সলকে বোকা বানানো সম্ভব হলো না। তিনি 'ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে' স্বীকৃতি প্রদান করতে সম্মত হলেন

না। কিন্তু বাদশাহ খালেদের নেতৃত্বে সৌদি আরব যখন শুনতে পেলো, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে এবং দেশটিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তখন তারা বাংলাদেশের জন্যে বহুদিনের অস্বীকৃত-স্বীকৃতি নিয়ে এগিয়ে আসেন। বিচারপতি চৌধুরী; মোশতাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে কি ধরনের বাক্যজালের সৃষ্টি করে তা আদায় করেছিলেন, সে আমার জানা নেই। তবে এটা সত্যি যে, নূতন প্রেসিডেন্ট দেশটির 'ধর্মনিরপেক্ষ' চরিত্রটির কোন পরিবর্তন সাধন করেননি।

খন্দকার মোশতাক তাঁর পরিকল্পনা মত কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রথমেই তিনি সামরিক শাসন জারি করে সারাদেশব্যাপী অনির্দিষ্টকালের জন্যে কার্ফিউর নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তাহলে কি হবে? এখানেও তিনি সাধারণ মানুষের ধার্মিক চেতনায় একটু রস লাগানোর ব্যবস্থা করলেন। তিনি একটুখানি কষ্ট স্বীকার করে হলেও শুক্রবারে জুম্মার নামাজ আদায় করার সুযোগের জন্যে তিন ঘন্টা সময় কার্ফিউ শিথিল করেন। তারপর তিনি একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করেন। দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। এতে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ লোকদেরকে বাদ দেন। নূতনদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আর ডঃ এ, আর, মল্লিক। ডঃ মল্লিক ফারুকের মামা এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ডঃ মল্লিককে অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। নতুন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মচারীদের কয়েকজনকে বরখাস্ত করেন এবং তাদেরকে বদলির তালিকায় নিক্ষেপ করেন। মোশতাক, গাজী গোলাম মোস্তফা আর আবদুস সামাদ আজাদসহ অনেক রাজনীতিবিদকে আটক করেন। তিনি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাতকারে মিলিত হন। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন নূতন শাসনের গুণগানে মত্ত হয়ে উঠে।

পালা বদলের জন্যে চাটুকারদের কোন পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয়নি। মোশতাক আহমেদকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে প্রেসিডেন্ট ভবনে চাটুকারদের ভিড় জমে উঠে। এমন কি যে-কোন একজন মেজর পেলেও তাকে অভিনন্দিত করতে ওরা ছাড়তো না। অভিনন্দন বাণী সম্বলিত টেলিগ্রাম আর পত্রাদি চতুর্দিক থেকে প্রচুর পরিমাণে আসতে শুরু করলো।

শেখ মুজিবের জন্যে এক ফোঁটা চোখের পানিও কেউ ফেললো না। মওলানা ভাসানী কয়েক মাস আগেই কেবল শেখ মুজিবের দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রতি তার সর্বাত্মক সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। এক্ষণে তিনি সময় ক্ষেপণ না করে খন্দকার মোশতাকের সরকারের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। বৃটেনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার সৈয়দ আবদুস সুলতানও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে।

ঢাকার ধানমন্ডিতে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের প্রমাণাদি মুছে ফেলার জন্যে খন্দকার মোশতাক অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব, সেরনিয়াবাত আর

শেখ মনি'র পরিবারের সবাইকে নীরবে বনানী গোরস্থানে কবরস্থ করার বন্দোবস্ত করা হয়। কেবল শেখ মুজিবের লাশ একটি বিমান বাহিনী হেলিকপ্টারে করে তাঁর নিজ গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার তাঁর পরিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুরের মতে, অভ্যুত্থান আর তাঁর হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু গ্রামবাসী মিলে শেখ মুজিবের পৈতৃক বাড়ী লুট করে। সম্ভবতঃ এটাই তাঁর সর্বশেষ অবমাননা।

খন্দকার মোশতাক আহমেদকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত করে ফারুক এবং রশিদ সেনা সদরে ফিরে গিয়ে যোগদান করতে চাইলে, তাদেরকে যোগদান করতে দেয়া হলো না। সামরিক কমান্ডাররা তাদেরকে ভয় পাচ্ছিলো। খন্দকার মোশতাক এই সমস্যার সমাধান করেন। তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে তিনি দুই মেজরকে সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকার ব্যবস্থা করেন।

শেখ মুজিবকে উৎখাতের ব্যাপারে খন্দকার মোশতাক মেজরদেরকে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। এখন আবার তিনি তাদেরকে সুরক্ষার বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু এতসব করলেও তাঁর পূর্বসুরির মতো তিনিও মূলতঃ সকল সামরিক বিষয়াদির প্রতি অবিশ্বাস আর অপছন্দ মনে মনে দৃঢভাবে পোষণ করতেন। তিনি নিজেও একজন গোড়া আওয়ামী লীগার ছিলেন। তিনি পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্যে তিনি সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। মোশতাকের ৮৩ দিনের শাসনকালে তিনি সামরিক বাহিনীকে তলিয়ে দেয়ার জন্যে নিবিষ্ট চিত্তে চেষ্টা করেন।

কিন্তু তাকে তার "পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়।" এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি ছিলো, সেনাবাহিনী স্টাফ প্রধানের পদটি নিয়ে। রশিদ আর ফারুক, সেনাবাহিনী প্রধানের গুরুত্বপূর্ণ পদটিতে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর পরিবর্তে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে স্থলাভিষিক্ত করতে চাচ্ছিলো। পরে, মোশতাকের সমর্থন না থাকলেও, তারা তাদের পছন্দমত বিমান বাহিনীর প্রধান হিসেবে অন্য একজনকে নিয়ে আসে। এই লোকটির নাম গ্রুপ ক্যাপ্টেন তোয়াব। তোয়াব কলকাতায় প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের একজন ঊর্ধ্বতন বিমান বাহিনীর অফিসার হিসেবে কাজ করে। তোয়াব ঐ সময়ে অবসর গ্রহণ করে তার জার্মান বংশোদ্ভূত স্ত্রীকে নিয়ে মিউনিখে বসবাস করছিলো। রশিদ তাকে নিয়ে আসার জন্যে জার্মানীতে যায়।

মোশতাক দু'টি কারণে জেনারেল জিয়াকে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করতে অনীহা পোষণ করেছিলেন। প্রথম কারণ ছিলো; জিয়ার প্রতি তাঁর অবিশ্বাস।

দ্বিতীয়ঃ অন্যান্য সিনিয়র আর্মি অফিসারদের ব্যতিক্রম হিসেবে জিয়া তাঁর সৈনিকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। এইটা ছিলো, মোশতাকের জন্যে একটা অসহনীয় ব্যাপার। কারণ, তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এই ধরনের কমান্ডারকে অবশ্যই একজন সম্ভাব্য বিপদজনক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য করতে হবে। সুতরাং তিনি তাঁর পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থাটাই অবলম্বন করলেন। তিনি জিয়াকে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান নিয়োগ করলেন। কিন্তু তাঁর অবস্থান সঠিকভাবে সুদৃঢ় রাখার বন্দোবস্ত করে নিলেন। তিনি তাঁর নিজের বাছাই করা একজনকে দিয়ে জিয়ার কার্যকারিতা চুল্লিতে উঠানোর ব্যবস্থা করেন।

রশিদ সেনাবাহিনীর সকল ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে উপদেশ প্রদানের কথা। কিন্তু তিনি রশিদকে না জানিয়েই তিন বাহিনীর প্রধানে উপরে কর্তৃত্ব করার জন্যে একটি পদ সৃষ্টি করেন। ঐ পদের নাম দিলেন—ডিফেন্স স্টাফ প্রধান। ডিফেন্স স্টাফ প্রধান হিসেবে তিনি বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে নিয়োগ করেন। মেজর জেনারেল এরশাদ তখন ভারতের একটা স্টাফ কোর্সে নিয়োজিত। তাকে চার মাসের মধ্যে দ্বিতীয় প্রমোশন দিয়ে জিয়ার ডেপুটি নিয়োগ করা হয়। পদোন্নতির দিক দিয়ে জিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে জিয়ার অধীনে চীফ অব জেনারেল স্টাফ হিসেবেই রাখা হলো। এই সকলের উর্ধ্বে 'পাপা টাইগার' বলে পরিচিত জেনারেল এম, এ, জি, ওসমানীকে তাঁর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে স্থাপন করলেন। ওসমানী ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্ণেল ইন চীফ এবং তাকে তিনি সবচাইতে বেশী বিশ্বাস করতেন বলে প্রতীয়মান হতো।

প্রকৃতপক্ষে মোশতাক উল্টো পথেই চলছিলেন। তাঁর কার্যকলাপের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দুঃখভরে ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর পরে আমাকে বলেছিলো ঃ 'প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতি দুর্ব্যবহারের দিক দিয়ে মোশতাক শেখ মুজিবকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন চতুর এবং ধূর্ত। তিনি একজনকে আর একজনের পেছনে লাগিয়ে রাখতেন। এমনকি সরকারী আমলাদেরও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছিলেন।' ঐ সময় জেনারেল জিয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তার কথার সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিলেন।

২৬ শে সেপ্টেম্বর মোশতাক এক অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে শেখ মুজিবের হত্যাকারীদেরকে তাদের কৃত অপরাধ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। এই অধ্যাদেশটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে 'দি ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৫' নামে একটি অসাধারণ গেজেট নোটিশে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় স্বাভাবিকভাবে প্রচার করা হয়নি। কারণ, পত্র-পত্রিকায় এ খবর প্রকাশ হয়ে গেলে, জনসাধারণের মাঝে এক প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারতো।

এই গোপন আইনটির মাধ্যমে মেজরদের সকল প্রকার অপরাধকে পরিপূর্ণভাবে

ক্ষমা করে দেয়া হলো। কেবল তাই নহে, ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত পরিকল্পনা, কুমন্ত্রণা, হত্যা ইত্যাদি সকল কাজের জন্যে মেজরবৃন্দ এবং তাদের সংশ্লিষ্ট লোকজনকে 'বেকসুর মাফ ' করে দেয়া হলো। যারা এই নূতন দেশটির প্রতিষ্ঠাতা, একটা জাতির জনক আর তাঁর পরিবারের ২১ জন সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করে, তাদের জন্যে গোপনে ক্ষমা ঘোষণা আসলেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাপার।

খন্দকার মোশতাক যেভাবে শেখ মুজিবের বুকের তাজা রক্তের উপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে এসে গদিতে বসেন। সেই অবস্থায় অবশ্য কেউ প্রত্যাশা করেনি যে, তিনি শেখ মুজিবের হত্যাকারীদের বিচার করবেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া স্পষ্টতঃই একটা আলাদা ব্যাপার। আমাকে পরে বলা হয়েছিলো যে, কেবল রশিদ আর ফারুকই এই আইনটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। কূটতার্কিক মোশতাক, নিজেও তাঁর চলার পিচ্ছিল পথে একটা ছোট্ট খুঁটি হিসেবে এই কর্মটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

তিনি তো বেশ সুচতুরভাবেই অনেককে 'নিরাপত্তা সনদ' প্রদান করলেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের জন্যে ঐ 'নিরাপত্তা সনদে' স্বাক্ষর করেছিলেন কি-না, তা আমার জানা নেই। তবে নিশ্চিত সত্য যে, এই অধ্যাদেশের শর্তগুলো ঐ কর্মকে নিয়মানুগ করতে গিয়ে ব্যাপক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

হত্যাকারীদের ক্ষমা ঘোষণা, ফারুক আর রশিদকে প্রমোশন দিয়ে লেঃ কর্ণেল-এ উন্নীতকরণ এবং সর্বোপরি, ৩রা অক্টোবর এক বেতার ভাষণে তাদেরকে 'সেনাবাহিনীর সূর্যসন্তান' বলে প্রশংসার যে বন্যা বইয়ে দেন তাতে সেনাবাহিনীর মনোবল আর শৃঙ্খলায় ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে। পরিষ্কার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো যে, বিদ্রোহ, ধ্বংস, হত্যা সেনাবাহিনীর অফিসার আর জোয়ানদের জন্যে অনুমোদনযোগ্য। কেবল ধরা না পড়লেই হলো। এসব কারণেই পরবর্তীতে অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান আর সাত বছর পরে চট্টগ্রামে জেনারেল জিয়াউর রহমানের হত্যাও সংঘটিত হয়।

প্রথম বেতার ভাষণে খন্দকার মোশতাক অনেক লম্বা লম্বা বুলি আওড়ালেও গদিতে আসার দশ দিনের মধ্যেই তাঁর তেমন কোন অবদান ছিলো না বললেই চলে। তবে, একটা অবদান অবশ্য উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর পরিহিত কালো নেহেরু টুপি'কে 'জাতীয় মাথার পোশাক' হিসেবে ঘোষণা দেন।

সে যাক, এই সময়ের মধ্যেই মোশতাক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দেয়ার ধূর্ত ও ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি হিসেব কষে দেখলেন যে, আসল হুমকি সেনাবাহিনীকে বাদ দিলে, আসছে তাঁরই পুরনো পার্টি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বিরোধী দলীয় শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে

পারে বলে তিনি মনে করলেন। সুতরাং যখনই তিনি বুঝতে পারলেন যে, দেশ শেখ মুজিবের হত্যাকে গ্রহণ করে নিয়েছে, তখনই আর বিলম্ব না করে মুজিবনগর সরকারের চারজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বকে পাকড়াও করার বন্দোবস্ত পাকা করে ফেললেন। ঐ চারজন হচ্ছে—তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামান। এখানে আবারও মোশতাক তাঁর স্বভাবজাত ছল-চাতুরির আশ্রয় নিলেন যাতে করে জনগণের আক্রোশ তাঁর উপর নিপতিত না হয়।

মনসুর আলী তখনও প্রধানমন্ত্রী। তাকে বঙ্গভবনে ডেকে পাঠানো হলো। খন্দকার মোশতাক সেখানে তাকে উচ্ছ্বাস ভরে গ্রহণ করেন। অথচ টেলিভিশনে যখন এই উচ্ছ্বাসভরা আন্তরিকতার ছবি জনগণকে দেখানো হচ্ছে, তখন বেচারা মনসুর আলীকে ঠেলে নিয়ে সংগোপনে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান আর তাজউদ্দিন আহমেদ-এর ভাগ্যেও তাই ঘটলো।

এই চার নেতা জেলে থেকে এক 'আকস্মিক ষড়যন্ত্রের' শিকার হয়। এই ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতেই মাত্র দু'মাস পরে এই জেলখানার ভেতরেই তাদেরকে পৈশাচিকভাবে খুন করা হয়।

খুন করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফারুক বলে যে, শেখ মুজিবকে ওরা যেভাবে উৎখাত করেছে, সেভাবে খন্দকার মোশতাকও তো উৎখাত হতে পারে। ঐ অবস্থায় ভারতের সহায়তায় কোন পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে গেলে, জেলের চার নেতার যে-কোন একজনকে টেনে এনে পাল্টা সরকার গঠনের ব্যবস্থা করা হবে। সুতরাং তাদেরকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করাটাই ওরা নিরাপদ বলে মনে করে।

খন্দকার মোশতাক তাঁর গ্রামের বাড়ী ধোসপাড়ায় বেড়াতে গেলে ফারুক আর রশিদ মিলে এই পরিকল্পনা তৈরী করে।

ওরা একমত হয় মোশতাককে হত্যা করা হলে কিংবা একটা পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটলে অবিলম্বে দু'টো কাজ করতে হবে। প্রথম কাজ হবে—প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে সরকারের শূন্যতা পূরণের জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়াতে হবে। একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে একটা 'জল্লাদ বাহিনী' দ্রুত কেন্দ্রীয় কারাগারে ছুটে গিয়ে তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী আর কামরুজ্জামানকে হত্যা করবে। হত্যা করার কাজটি দেয়া হলো ফারুকের তিন থেকে পাঁচ সদস্যের একটি 'জল্লাদ বাহিনীর' উপর। ওরা এই ধরনের কাজের জন্যে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এইটি ছিলো রিসালদার মুসলেহউদ্দিনের দল। এরাই ১৫ই আগস্টে শেখ ফজলুল হক মনিকে খতম করে এসেছিলো। এইভাবে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় পৈশাচিক নরহত্যার জঘন্য পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করা হয়।

'তাৎক্ষণিক পরিকল্পনাটি বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছিলো যেন তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে

কাজ করে।' —ফারুক মত প্রকাশ করে। তার কথাই সত্যে পরিণত হয়েছিলো। ৩রা নভেম্বর খালেদ মোশাররফ পাল্টা অভ্যুত্থান পরিচালনা করলে ঐ জঘন্য পৈশাচিক পরিকল্পনাটি জঘন্যতম পরিণতির মানসে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে কার্যকরী করা হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ সাল। শেখ মুজিবের হত্যার পর মাত্র তিনটি সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে। একজন অতিশয় করিৎকর্মা মধ্যবয়সী বাঙ্গালী অত্যন্ত চমৎকার একেবারে নিখাঁদ 'সিল্কের আচ্ছাদন' আর সাদা চুরিদার পায়জামা পরে পাকিস্তানের রাজধানী, ইসলামাবাদ থেকে লন্ডনে এসে পৌঁছেছে। নাইটস্‌ব্রীজের এক অত্যন্ত ব্যয়বহুল হোটেল তার আস্তানা। টাকাটা তার কাছে কোন ব্যাপারই নহে। নাম তার মাহমুদ আলী। সে এক বিশেষ মিশনে লন্ডনে এসেছে। তার নিশ্চিত বিশ্বাস—বিজয়ের মালা তার গলায় পড়তে বাধ্য। কাজটা হলো—বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিলীন করে, পাকিস্তানের পুনঃএকত্রীকরণ।

প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিশেষ দূত মাহমুদ আলী বাংলাদেশের নূতন শাসকের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই এখানে তার আগমন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানী জেলখানা থেকে মুক্তি দেয়ার সময়ে মিঃ ভুট্টো তাঁর কাছে যে প্রস্তাব রেখেছিলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে সেই বিশেষ 'লিংক' রক্ষার ব্যাপারে খন্দকার মোশতাক আহমেদ কতটা অগ্রগামী তা যাচাই করাই ছিলো তার বিশেষ দায়িত্ব।

মাহমুদ আলীর পরিকল্পনা তার গুরু, মিঃ ভুট্টোর চিন্তা-ভাবনাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। আমার সঙ্গে ঐ হোটেলে এক সাক্ষাতকারে সে বলেছিলো ঃ 'বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়বস্তুর অবশ্যই বিলুপ্তি ঘটাতে হবে।'

একজন পুরনো মুসলিম লীগার হিসেবে পাকিস্তানে বসবাসকারী অন্যান্য বাঙ্গালীদের মতো, মাহমুদ আলীও বাংলাদেশের অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারেনি। যে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিলুপ্তি ঘটানোর জন্যে নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করে যাচ্ছিলো। সে অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে পাকিস্তানের পুনঃএকত্রীকরণের জন্যে সম্ভব সবকিছু করছিলো। চার বছর ধরে 'জোঁকের' মতো লেগে থেকে তার মতে, 'সে আসল কার্যসিদ্ধির প্রকৃত সময় পেয়ে গিয়েছিলো। সে বিরামহীনভাবে ঢাকার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলো এবং অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে মহত্তম সংবাদটি পাওয়ার প্রত্যাশায় প্রহর গুণছিলো।'

মাহমুদ আলীর এতো বেশী আনন্দের অবশ্য কারণও ছিলো। খন্দকার মোশতাকের পররাষ্ট্র নীতি, পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কিছু মন্তব্য, বিশেষ দূত হিসেবে পীর মোসলেহউদ্দিন (দুদু মিঞা)-কে পাকিস্তানে প্রেরণ, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কোলাবরেটর—শফিউল আজম, তোবারক হোসেন, সালাহউদ্দিন, এ, বি, এস, সফদর-এর মত লোককে সরকারের সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থাপন ইত্যাদি বিষয়াদি মাহমুদ আলীকে অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারতো বটেই। আর সে জন্যেই সে পাকিস্তানকে পুনঃএকত্রীকরণের 'মহান কর্মে' গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলো।

মাহমুদ আলী আমাকে বলেছিলো, 'খন্দকার মোশতাক তাঁর অপকৃতার জন্যে দেশটাতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হলেও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মোশতাক ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে যে পট পরিবর্তন ঘটে তা উল্টে দেবে।' সুতরাং সে কিছু মধ্যস্থতাকারীর সাহায্যে মোশতাকের নিকট একটা 'কনফেডারেশন' গঠনের প্রস্তাব করে। এইটি তার মতে, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানকে 'একনামে এক পতাকাতলে' ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবে। অন্যান্য সম্পর্কাদির বিশদ বিবরণ পরে সুবিধেজনক পর্যায়ে সঠিক করা যাবে বলে সে মত প্রকাশ করে।

মাহমুদ আলী অত্যন্ত আস্থাভরে বলেছিলো, 'আমি খন্দকার মোশতাককে বলেছিলাম, অপেক্ষা করতে গেলে বিপদ চলে আসতে পারে, এক্ষণেই কাজটা করে নেয়া উচিত। আমি তার কাছ থেকে যা চেয়েছিলাম তা হচ্ছে কেবলই এ ব্যাপারে তার সম্মতির ঘোষণা। বিস্তারিত দিক-পাশ পরেই ঠিকঠাক করা যাবে।'

আমি মাহমুদ আলীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কি আসলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, ১৯৭১-এ বাঙ্গালীরা তাদের কলিজায় চিরদিন বিঁধে থাকার মতে যে চমৎকার অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলো, তার পরেও কি তারা পাকিস্তান ফিরে যেতে চাইবে। তাছাড়া, আরও তো বিপত্তির বিষয় অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছে। 'কনফেডারেশন' গঠন করা হলে, সর্বশক্তির উৎস হিসেবে একটা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির ব্যাপারটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সেই ক্ষেত্রে হয় ভুট্টোকে, না হয় মোশতাককে সর্বশক্তির উৎস থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু দু'জনের কেহই এ কাজটি করতে চাইবে না। বড়ই মজাদার ঐ উৎসের জায়গা। আর দু'জনেই বহু ছল, বল আর কৌশলের মাধ্যমে ঐ অভীষ্ট লক্ষ্যে এসে পৌঁছে গেছেন। মাহমুদ আলী স্বীকার করেছিলো যে, আসলে ভুট্টোই পাকিস্তানের পুনঃএকত্রীকরণের পথে বিরাট বাধা।

ভুট্টোজীর আসলে এ ধরনের পুনঃএকত্রীকরণের কোন ধারণা মনে ছিলো না। মাহমুদ আলী যেই সময়ে লন্ডনে আমার সঙ্গে এই আলাপে রত, সেই সময়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আজিজ আহমেদ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলি সেশনে তার বাংলাদেশী প্রতিপক্ষকে বলছে যে, পাকিস্তান বাংলাদেশের সঙ্গে একটি নিবিড় সম্পর্ক প্রত্যাশা করে— এক রাষ্ট্রের সঙ্গে আরেক রাষ্ট্রের যা হতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু নহে। বিচারপতি চৌধুরীর মতে, আজিজ আহমেদ বলেছিলো, 'কিছু অতি উৎসাহী ব্যক্তি রয়েছে, যারা অনেক কিছু পেতে চায়, কিন্তু আমরা তাদেরকে উৎসাহিত করছি না। তাদেরকে বাধা দিয়ে রাখতে হবে।'

মাহমুদ আলী দীর্ঘ তিন সপ্তাহ ধরে লন্ডনে বসে অপেক্ষা করছিলো, কখন সেই সাংঘাতিক ঘোষণাটি ঢাকা থেকে চলে আসে। কিন্তু তা আর কখনও এলো না। স্পষ্টতঃই বাংলাদেশ থেকে কেউ তাকে ঐভাবে লটকিয়ে রেখেছিলো। ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে

ঘুরিয়ে দিতে মোশতাক কখনই সাহস পাননি। খন্দকার মোশতাক এমন কিছু একটা করতে চাইলে, মেজর ফারুক আর রশিদ তাকে সঙ্গে সঙ্গেই খুন করে ফেলতো। ওরা অত্যন্ত কট্টর জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ দুই যুবক। ফারুক আমাকে বলেছিলো, 'কেউ যদি বাংলাদেশকে অন্য কারো হাতে তুলে দিতে চাইতো, আমি সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা উড়িয়ে দিতাম।

এদিকে দেরিতে হলেও চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলো। এতে মোশতাকের মনোবল কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো। কিন্তু তথ্যমন্ত্রী তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের সকল প্রচারযন্ত্রকে হার মানিয়ে মোশতাকের নীতিমালার প্রতি জনগণের ব্যাপক বিভ্রান্তি গুঞ্জরিত হতে লাগলো। একদিকে, কিছু পাকিস্তানী মনোভাবাপন্ন কথাবার্তা আর ইসলাম, ইসলাম বলে চুঙ্গা গরম করার প্রয়াস। অন্যদিকে, শেখ মুজিবের 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নীতিকে দু'হাতে শক্তভাবে ধরে রাখার অপপ্রয়াস। এই বৈপরিত্যপূর্ণ অদ্ভুত দিকটি ১৯৭৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর একটি সরকারী শ্বেত্রপত্রে তুলে ধরা হয়।

শেখ মুজিবকৃত ভুলকর্ম জনসমাজে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে, দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী চিহ্নিত করার জন্যে খন্দকার মোশতাক একটি 'অর্থনৈতিক টাস্ক ফোর্স' নিয়োগ করেন। এই টাস্ক ফোর্স' ১২ দিনের রেকর্ড সময়ের মধ্যে তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে দাখিল করে। এতে কিছু অস্পষ্ট মোটা বুলি সন্নিবেশিত করা হয় এবং শেখ মুজিবের চারটি স্তম্ভকে (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা আর জাতীয়তাবাদ) রাষ্ট্রের চার মূলনীতি বলে ধরে নিয়ে রিপোর্টের বিভিন্ন দিক ও সমাধানের বিশ্লেষণ করা হয়। 'ঐতিহাসিক প্রয়োজনে' ক্ষমতায় এসে খন্দকার মোশতাক সরকারের প্রথম শ্বেতপত্রে শেখ মুজিবের নীতিমালাকেই জাঁকজমকভাবে জনগণের নাকের ডগায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়।

জনগণ হতবুদ্ধি হবে, এতে আর বিচিত্র কি আছে? এসব দেখে মেজররা দিন দিন অধিক থেকে অধিকতর দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিলো। তাদের মনে জাগছিলো, 'তাহলে শেখ মুজিবকে হত্যা করার কি দরকার ছিলো?'

৩রা অক্টোবর, ১৯৭৫ সাল। খন্দকার মোশতাকের শাসন ৫০ দিনে উন্নীত হয়েছে। মোশতাক 'জনগণের হৃত গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত' রেডিও আর টেলিভিশনে ঘোষণা করেন। অত্যন্ত সুচতুরভাবে, প্রচুর সময় হাতে রেখে, তিনি ঘোষণা দেন যে, ১৫ই আগস্ট (১৯৭৬ সাল) থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হবে। আর পার্লামেন্টারী সরকার গঠনের জন্যে ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৭ সাল) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই ধূর্ত রাজনৈতিক চালটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এবং সকল রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির সরকারী ঘোষণাটি আরও বেশী সমাদৃত হয়। মোশতাক সুষ্ঠভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, 'রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে কোন রাজনৈতিক

নেতার বিরুদ্ধে এখন আর কোন 'আটকের হুলিয়া' রইলো না।' মোশতাক আরো একবার চরম মিথ্যার আশ্রয় নিলেন। অন্ততঃপক্ষে, তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী আর কামরুজ্জামানের মতো চারজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তালাবদ্ধ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলো। তাদের খুব শিগগির মুক্তির কোন সম্ভাবনাবই জানা ছিলো না।

মোশতাক তাঁর ভাষণে, মেজরদেরকে সেনাবাহিনীর 'সাহসী সূর্যসন্তান' নামে আখ্যায়িত করে তাদের কাটা ঘায়ে মলম লাগানোর ফন্দি আটলেন। কিন্তু জনগণ তার গলাভরা বুলি প্রত্যাখ্যান করলো। গত সাত সপ্তাহ ধরে তারা ঐ সূর্যসন্তানদের কেবল কলঙ্কজনক দিকগুলোই শুনে আসছিলো। চাটুকার সভাসদের দল, দুর্নীতিবাজ আমলার দল, ব্যবসায়ী মহল সবাই শেখ মুজিবের হত্যার মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই আবার যার যার কাজে বসে পড়ে। তারা আসল ক্ষমতার উৎস খুঁজে পেয়েছিলো। ফারুক স্মৃতিচারণ করে বলে, 'টাকা বাদ দিলেও, আমি লক্ষ লক্ষ ডলার এক সপ্তাহের মধ্যে হস্তগত করতে পারতাম। কিন্তু আমি ঐ বেটাদের চেহারাও দেখতে চাইনি।' রশিদ নিশ্চিত করে বলে যে, অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত এমন কিছু অবসরপ্রাপ্ত অফিসার প্রচুর টাকা বানিয়েছে বলে তার কাছে খবর আছে।

আর্টিলারী আর ল্যান্সারের কিছু অফিসার, এমনকি জোয়ান আর এনসিও-রাও বাদ যায়নি। যে যেভাবে পেরেছে, দু'হাতে লুটেছে। সুতরাং ফারুকের 'বিপ্লব' সরকারী শাসনযন্ত্র নির্মল করার মহান অভিযান—বিশেষ করে শেখ মুজিবকে হত্যা করার আসল উদ্দেশ্য, তার মতে, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলো।

ফারুক আর রশিদের আরো কিছু চিন্তার ব্যাপার ছিলো। প্রথমতঃ মোশতাক তাদের কথায় কান দিচ্ছিলেন না। তাদের যে-কোন পরামর্শ তিনি 'আমলাতন্ত্রের গোলক ধাঁধায়' ফেলে দিতেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে।' কিন্তু সেগুলো নিশ্চিতভাবে নথির ভেতরে কবরস্থ হয়ে যেতো। দ্বিতীয়তঃ ফারুক আর রশিদকে দূরে রেখে ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের সকল গৌরব মোশতাক আর তাহেরউদ্দীন ঠাকুর নিজেরাই নিতে সচেষ্ট ছিলেন। অথচ, ফারুক আর রশিদ এ জন্যে জনগণের স্বীকৃতি মনে-প্রাণে কামনা করছিলো।

'হঠাৎ করেই মোশতাক আর তাহেরউদ্দীন ঠাকুর নায়ক বনে গেলো, অভিযোগ করে ফারুক।' রশিদও একমত। 'খন্দকার মোশতাকের আমাদের প্রতি অন্ততঃ কিছুটা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিলো। কেননা, আমরাই তাকে প্রেসিডেন্ট বানানোর জন্যে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। তিনি তো তরতাজা রাজনীতিবিদ। বিশ্বাসঘাতকতা তাদের স্বভাব আর তা রক্তে মিশে আছে। তিনি কখনও সোজা পথে চলতেন না।'

দশ পৃষ্ঠার এক দলিলে তাদের কৃতকর্ম আর উদ্দেশ্যকে বিধৃত করে জনগণকে

জানিয়ে দিতে মনস্থ করলো দুই মেজর। কিন্তু মোশতাক, তাদের প্রচারণাকে খুব সুন্দর চোখে দেখতে পারলো না। তিনি কায়দা করে পরামর্শ দিলেন যে, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর মেজরদের খসড়াটিকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে পারবে। সুতরাং রশিদের খসড়াটি ঠাকুরকে দেয়া হলো। যেভাবেই হোক, ঐ খসড়ার উপরে কাজ আর কোনদিনই শেষ হলো না।

কোন সরকারী দায়িত্ব ছাড়াই মেজররা বঙ্গভবনে অবস্থান করছিলো। কিন্তু মোশতাক মেজরদেরকে উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী আলোচনায় জেনারেলদের সঙ্গে যোগ দেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

এমনই এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান, জেনারেল শফিউল্লাহ্। আলোচনা অনুষ্ঠানটি শেখ মুজিবকে হত্যার মাত্র চারদিন পরে সেনা সদরে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় ফরমেশন কমান্ডার আর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারদেরকে ডাকা হয়েছিলো। ফারুক আর রশিদও উপস্থিত। জেনারেল শফিউল্লাহ্ সম্মিলিত অফিসারদের অবগতির জন্যে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট মোশতাক এই দুই মেজরকে পাঠিয়েছেন। ওরা শেখ মুজিবকে হত্যার কারণ ব্যাখ্যা করবে আর আমাদেরকে তা শুনতে হবে।' রশিদ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা দিয়ে শুরু করে এবং মোশতাককে কেন বসানো হলো তা বলতে চেষ্টা করে। আর কিছুদূর আগানোর আগেই কর্ণেল শাফাত জামিল ক্রোধান্বিত কণ্ঠে তাকে থামিয়ে দেয় এবং চিৎকার করে বলতে থাকে, 'মোশতাক আমার প্রেসিডেন্ট নয়। সে একজন স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট, সে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নয়। আমি তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করি না। সে একজন জবরদখলকারী, ষড়যন্ত্রকারী এবং হত্যাকারী। সুযোগ এলে প্রথমেই আমি তাকে উৎখাত করবো।' এতে উপস্থিত অফিসারদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। তারপরে মেজরবৃন্দ আর কোনদিন ফরমেশন কমান্ডারদের সভায় বক্তব্য না রাখলেও তাদের উপস্থিতি সেনা সদরে অনুভূত হতে থাকে। এমনি করেই খন্দকার মোশতাক সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা চুলোয় উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

চতুর্দিকেই কেবল একটা অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করছিলো। ঐ দুই মেজর সেনাবাহিনীতে থাকলেও সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা আর 'চেইন অব কমান্ড'-এর বাইরে অবস্থান করছিলো। মাঝে মধ্যেই রশিদ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল জিয়ার অফিসে চলে আসতো এবং বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতো। এমনকি সুপারিশও প্রদান করতো। একই সময়ে বেঙ্গল ল্যান্সারের কমান্ডার, কর্নেল মোমিন তার ডেপুটির কাছ থেকে নির্দেশ পেতো ফারুকের ঔদ্ধত্য জেনারেলদের বিব্রত করে তুলেছিলো।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আর কর্ণেল শাফাত জামিলের ইঙ্গিতে একজন পদাতিক বাহিনীর অফিসার বঙ্গভবনে পাহারারত ল্যান্সারদেরকে

১। মেজরদের হাতে নিহত হবার পর শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঢাকাস্থ নিজ বাড়ীর সিড়ির গোড়ায় এলোপাথড়িভাবে পড়ে আছেন। তখনও তার প্রিয় ধুপপানের পাইপটি শক্তভাবে ডানহাতে ধরে আছেন।

২। ঘাতকদের হাতে নিহত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

৩। মেজর ফারুক রহমান, বেঙ্গল ল্যান্সার-এ উপ-অধিনায়ক। তিনি মুজিব-হত্যার কৌশলগত নক্‌সা তৈরী করেন।

৪। মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ, অধিনায়ক দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারী। তিনি মেজর ফারুকের ভায়রা ভাই এবং মুজিব হত্যার সাথী বন্ধু।
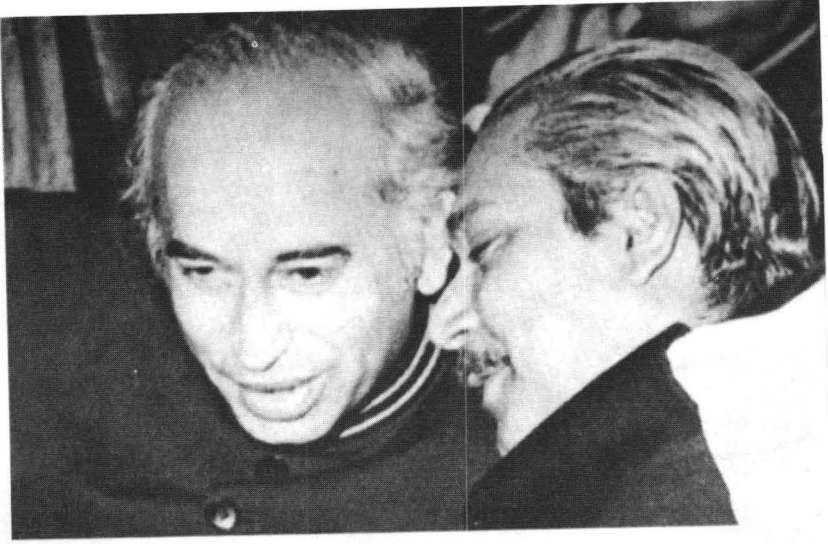
৫। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো। এককালের আপোষহীন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। অখন্ড পাকিস্তান খন্ডিত হবার পর শেখ মুজিব হলেন বাংলাদেশের জাতীয় জনক আর ভুট্টো হলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।

৬। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষে শেখ মুজিব দেশে ফিরে এলে খন্দকার মোশতাক আহমেদ তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছেন। তিনি তাঁর গুপ্ত হত্যায় ইন্দন যুগিয়েছিলেন এবং ১৯৭৫ সালে মাত্র ৮৩ দিনের জন্যে দেশের প্রেসিডেন্ট হতে সক্ষম হয়েছিলেন।
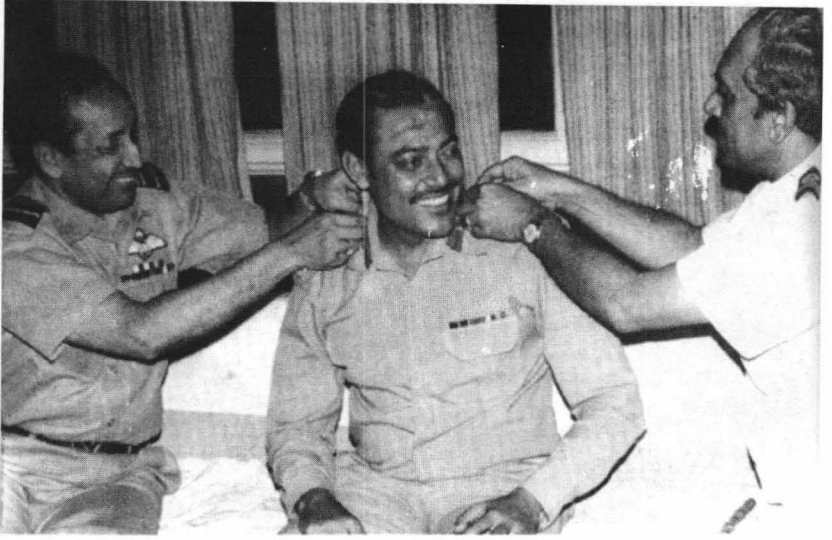
৭। অসাধারণ অনুগামীবৃন্দ : বিমান বাহিনী প্রধান, এয়ার ভাইস মার্শাল তওয়াব, নৌ বাহিনী প্রধান এড্‌মিরাল এম, এইচ, খান, এক স্বল্পস্থায়ী অভ্যুত্থানের নায়ক জেনারেল খালেদ মোশাররফকে পদভুষন ব্যাজ পড়িয়ে দিচ্ছেন। তার একদিন পর সিপাহী বিদ্রোহে খালেদ নিহত হলে ঐ দুই প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের আনুগত্য স্বীকার করেন।

৮। আন্ধা হাফিজ, চট্টগ্রামের এক অন্ধ দরবেশ। তিনিই শেখ মুজিবকে হত্যা করার জন্য মেজর ফারুকের হাতে একটি কবচ তুলে দেন।

Published by Authority

THURSDAY, APRIL 19, 1979

PART III

Notifications issued by the Ministry of Defence other than those included in Part I

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

Dacca, the 9th April 1979.

No. 7/8/D-I/75/270.—BA-69 Major General Ziaur Rahman, BU, psc is promoted to the rank of Temporary Lieutenant General with effect from 28th April 1978.

2. This cancels this Ministry's Notification No. 7/8/D-I/75/160, dated 28th February 1979.

No. 7/8/D-I/75/271.—BA-69 Temporary Lieutenant General Ziaur Rahman, BU, psc is retired from the service of the Bangladesh Army with effect from 29th April 1978.

By order of the President
A. H. F. K. SADIQUE
Defence Secretary.

প্রজ্ঞাপনসমূহ

ঢাকা, ৬ই এপ্রিল ১৯৭৯।

নং [illegible]/৭৯/ডি-১/[illegible]৬৪—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রচলিত বিধি মোতাবেক বি এ এস-৩৫০ [illegible] মো. [illegible] ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার্সকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন।

২। উক্ত অফিসারকে ২৮শে মার্চ ১৯৭৯ তারিখ হইতে [illegible] (এল ও ডি) এবং সেনাবাহিনী [illegible] (এস ও এস) করা হইল।

ঢাকা, ৭ই এপ্রিল ১৯৭৯।

নং ৪/[illegible]/ডি-১/৭৭/(অংশ)/২৬৭—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে [illegible] চাকুরী কমিশন প্রদান [illegible] ১৯৭৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪/৩২/ডি-১/৭৭ (অংশ)/৮৩৩-এর ক্রমিক নং ৭-এর বিপরীতে নিম্নলিখিত সংশোধনী জারী করা হইল:

পরিবর্তে

ক্রমিক নং।	নাম।	কমিশনের তারিখ।	কোর।
৭।	মো: মাহবুবুর রহমান	১৪-৯-১৯৭৬	আর ভি এন্ড এফ সি।

পড়ুন

ক্রমিক নং।	নাম।	কমিশনের তারিখ।	কোর।
৭।	মো: মাহবুবুর রহমান	১০-৬-১৯৭৬	আর ভি এন্ড এফ সি।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মো: [illegible]
সিনিয়র [illegible]

POST MORTEM REPORT: MAJ. GEN. M.A. MANZOOR

Body identified by Lt. Col. Shamsur Rahman of EBRC.

Reported time of death: 23.30 hours on 1st June, 1981.

Time of post mortem: 07.30 hours on 2nd June, 1981.

History: Dead body of Major General M.A. Manzoor was brought to CMH Chittagong at about 04.00 hours on 2nd June. No history available.

External Examination: Rigour Mortis had set in. There was a big gaping hole 4"x 2" with ragged margin on the right occipital region. The bullet crushed the bone and shattered it completely. A big chunk of bone was blown away and the brain matter extruded through the gap. There was no other injury on the body.
No internal examination was carried out because the cause of death was obvious.

Cause of death: Shock and haemorrhage from bullet injury, head.

Signed: Lt. Col. A.Z. Tufail Ahmed

Dated: 2nd June 1981.

Copy

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Defence
Old High Court Building
Dhaka

NOTIFICATION

No 7/8/D-I/75-160. Dated, the 28 February 1979.

BA-69 Major General Ziaur Rahman, BU,psc is promoted to the rank of Temporary Lieutenant General with immediate effect.

By order of the President,

Sd/ xxxxxxxxxxx
(A H F K Sadique)
Defence Secretary

No 7/8/D-I/75-160 Dated the 28th February 1979.

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Chief of the Army Staff, Bangladesh Army, Army Headquarters, Dhaka Cantonment, Dhaka
2. Chief of the Naval Staff, Bangladesh Navy, Naval Headquarters, Dhaka Cantonment, Dhaka
3. Chief of the Air Staff, Bangladesh Air Force, Air Headquarters Dhaka Cantonment, Dhaka.
4. P. S. O. to the Commander -in- Chief, C-in-C's Secretariat, Dhaka Cantonment, Dhaka.

Sd/ xx x x xx
(M A Hena)
Joint Secretary

POST-MORTEM REPORT ON THE DEAD BODY OF THE LATE PRESIDENT ZIAUR RAHMAN

Post-Mortem Report in respect of Lt. Gen. (Retd.) Ziaur Rahman, BU, psc., President of the People's Republic of Bangladesh.

Body Identified by—Lt. Col. Mahfuz, P.S. to President.

Time of Death—04·00 hrs. on 30-5-81.

Time of Post-mortem Examination—10·00 hrs. on 01-6-81.

Brief History—The President was allegedly assassinated by the miscreants on Saturday the 30th May, 1981 at 04·00 hrs. in Chittagong Circuit House. He sustained multiple bullet injuries on his person and died on the spot. It is stated by Lt. Col. Mahfuz that his body was buried with another two dead bodies at about 14·30 hrs. on 30th May 1981 near Chittagong Engineering College. Lt. Col. Mahfuz with others of the Sta. HQ. Ctg. exhumed his body from that mass grave on 01-6-1981 morning and brought to CMH Ctg. Cantt. for necessary P.M. examination at about 10·00 hrs. on 01-6-1981.

On Examination—The body was partially decomposed but the configuration was intact to be identified as the body of the late President Ziaur Rahman. There were about twenty separate bullet wounds on the body. The details of the wounds are as follows:—

a. One bullet entered through right eye and was out through the left occiputo-parietal region with the extrusion of the brain matter.

b. Another 8″×3″ oblique lacerated wound present extending from the left angle of the mouth up to the left lower neck. The mandible was shattered and all the neck structures

c. There are about ten bullet wounds over the chest and abdomen probaly entrance wounds.

d. There were equal number of corresponding bigger wounds on the back of the trunk also These were probably exit wounds.

c. There was big lacerated 4″×3″ wound on the perineum and left groin with corresponding wounds of the back of pelvis and buttock left. Probably due to the effects of brush fire.

f There were two bullet wounds in the rt. arm.

g There were few scattered small wounds on both lower limbs.

The body was cleaned and reconstructed. Formalin Solution was injected in all the wounds and the body was soaked by the same. The whole body was then bandaged with soft cotton wool. and wrapped in new white sheet. Cedar wood oil. Eucalyptus oil and "Atar" were sprinkled over the whole sheet. Then the body was preserved in a coffin by tea leaves. The coffin was wrapped by the National Standard and handed over to Brig. A.K.M. Azizul Islam. Lt. Col. Mahfuz and Lt. Col. Mahtabul Islam at 13·00 hrs. by CO, CMH. Chittagong.

Sd/- Lt. Col. A. Z. TUFAIL AHMED
Gd. Specialist in Pathology.

Registered No. DA-1

THE BANGLADESH GAZETTE

Extraordinary
Published by Authority

FRIDAY, SEPTEMBER 26, 1975

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW PARLIAMENTARY AFFAIRS AND JUSTICE
(Law and Parliamentary Affairs Division)
NOTIFICATION
Dacca, the 26th September 1975.

No. 692-Pub. – The following Ordinance made by the President of the People's Republic of Bangladesh, on the 26th September, 1975, is hereby published for general information:–

THE INDEMNITY ORDINANCE, 1975
Ordinance No. XLX of 1975
an
ORDINANCE

to restrict the taking of any legal or other proceedings in respect of certain acts or things done in connection with, or in preparation or execution of any plan for, or steps necessitating, the historical change and the Proclamation of Martial Law on the morning of the 15th August, 1975.

WHEREAS it is expedient to restrict the taking of any legal or other proceedings in respect of certain acts or things done in connection with, or in preparation or execution of any plan for, or steps necessitating, the historical change and the Proclamation of Martial Law on the morning of 15th August, 1975;

AND WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render immediate action necessary;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of the 20th August 1975, and in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 93 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance

1. SHORT TITLE This Ordinance may be called the Indemnity Ordinance 1975.

2. RESTRICTIONS ON THE TAKING OF ANY LEGAL OR OTHER PROCEEDINGS AGAINST PERSONS IN RESPECT OF CERTAIN ACTS AND THINGS - (1) Notwithstanding anything contained in any law, including a law relating to any defence service, for the time being in force, no suit, prosecution or other proceedings, legal or disciplinary, shall lie, or be taken in, before or by any Court, including the Supreme Court and Court Martial or other authority against any person, including a person who is or has, at any time, been subject to any law relating to any defence service, for or on account of or in respect of any act, matter or thing done or step taken by such person in connection with, or in preparation or execution of any plan for, or as necessary step towards the change of Government of the People's Republic of Bangladesh and the Proclamation of Martial Law on the morning of the 15th August, 1975.

(2) For the purposes of this section, a certificate by the President, or a person authorised by him in this behalf, that any act, matter or thing was done or step taken by any person mentioned in the certificate in connection with or in preparation or execution of any plan for, or as necessary step towards, the change of Government of the People's Republic of Bangladesh and the Proclamation of Martial Law on the morning of the 15th August, 1975, shall be sufficient evidence of such act, matter or thing having been done or step having been taken in connection with, or in preparation or execution of any plan for, or a necessary step towards, the change of such Government and the Proclamation of Martial Law on that morning.

KHANDAKER MOSHTAQUE AHMED
President

DACCA;
The 26th September, 1975.

M.H. RAHMAN
Secretary.

Printed by the Special Officer, Bangladesh Government Press, Dacca.
Published by the Assistant Controller-in-charge, Bangladesh Forms & Publications Office
Dacca

পরাভূত করতে গিয়ে ধরা পড়ে। ব্যাপারটি প্রমাণসহ জেনারেল জিয়ার নিকট পেশ ক
হয়। তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে কথা দিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি কিছুই করলেন না। রশি
বলে যে, এই ধরনের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হবার বহু অভিজ্ঞতা তার রয়েছে।

রশিদ বলে, 'জেনারেল জিয়া আমাকে বলতেন, "রশিদ ঘাবড়িও না। যদি কিছু ঘটে তবে তা আমার মৃতদেহের উপর দিয়েই ঘটবে।" আমার বিশ্বাস, 'হয় তিনি একজন কাপুরুষ অথবা অত্যন্ত চালাক লোক।' তিনি ধারণা করে থাকতে পারেন যে, 'আমরা একে অন্যকে খতম করবো, আর সেই সুবিধেটা তিনি ভোগ করবেন।'

খন্দকার মোশতাক ১২ই ডিসেম্বর ১৯৭৫, আমার সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছিলেন যে, ২রা নভেম্বরের মধ্যে দেশের আপামর জনসাধারণ বুঝতে পারছিলো যে, দেশে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। জিয়াকে তিনি এর ইঙ্গিত দিলেও জিয়া তা প্রতিপালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। মোশতাকের ভাষায়ঃ 'জিয়া একজন ছোটখাট মেজরের চেয়ে বেশী কিছু ছিলো না। সে ছিলো অনভিজ্ঞ, নির্বোধ অথচ উচ্চাভিলাষী। সে ক্যান্টনমেন্টকে রক্ষা করতে পারলো না। সে দেশকে কিভাবে রক্ষা করতো? অথচ সে বড়ই উচ্চভিলাষী।'

অক্টোবরের শেষের দিকে মোশতাক, ওসমানী, জেনারেল খলিল আর ফারুক-রশিদ মোটের উপর ধরে নিয়েছিলো যে, দেশে একটা অভ্যুত্থান আসন্ন হয়ে উঠেছে। জেনারেল খলিল, বিভিন্ন রিপোর্টের বরাত দিয়ে জানায় যে, জেনারেল জিয়া আর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ-এর কাছ থেকে অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত ভেসে আসছে। 'প্রথমে দুই মেজর তাদের দু'জনকেই (জিয়া+মোশাররফ) আটক করতে চেয়েছিলো। তারপর তারা একটি ব্রিগেড গঠন করে ঐ ধরনের সবাইকে আটক করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সম্ভব নয় বলে সেটাও বাদ দেয়া হয়। একথা জেনারেল খলিল বলেছিলো।

যে কারণেই হোক, জেনারেল ওসমানী জেনারেল জিয়াকে বিশ্বাস করতেন না। সে জন্যেই তিনি জেনারেল খলিলকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সঙ্গে আলাপে বসেন এবং জেনারেল জিয়াকে চাকুরীচ্যুত করার প্রস্তাব করেন। রশিদ দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করে। সে বলে যে, জেনারেল জিয়া নয়, সরকারের প্রকৃত হুমকি হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আর কর্ণেল শাফাত জামিল। রশিদ একটু বুদ্ধি করে মোশতাকের কানে একটা কথা উঠিয়ে দিলো যে, জিয়াকে সরানোর পেছনে ওসমানীর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। প্রেসিডেন্ট কথাটাকে খপ করে লুফে নিলেন। এবং অবস্থা বুঝে ওসমানীকে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যদি জিয়াকে সরাতে চান, তাহলে বলুন, তার জায়গায় কাকে দেয়া যায়? আমাকে কিছু নাম দিন।' ওসমানী পরের দিন নাম জানাবেন বলে কথা দিলেন। তারপর দুই জেনারেল তাদেরকে বিদায় জানিয়ে বাসায় ফিরে গেলেন।

তারপর রশিদ আর মোশতাক আধা ঘন্টা ধরে ঐ আলোচনার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে

চেষ্টা করেন। শেষে তারা ধরে নেন যে, জেনারেল ওসমানী খালেদ মোশাররফের দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। রশিদ বলে, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, দেখি, ওসমানী খালেদ মোশাররফের নাম সুপারিশ করেন কিনা। যদি তিনি তাই করেন, তাহলে ধরে নেব যে, তিনি একটা অঘটন ঘটাতে চাইছেন।'

রশিদ নীচতলার শোয়ার ঘরে যাবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছিলো। এমন সময় একজন পাহারারত পুলিশ অফিসার ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে এবং শ্বাসরুদ্ধকরভাবে বলতে থাকে; 'স্যার, পাহারারত পদাতিক বাহিনীর লোকেরা সব পালিয়ে গেছে। তারা আমাদেরকেও চলে যেতে বলেছে। সাংঘাতিক যুদ্ধের সম্ভাবনা। আমাদেরও অবশ্যই পালানো উচিত বলে, তারা বলেছে।'

রশিদের চরম ভীতি বাস্তবে রূপায়িত হলো। পাল্টা অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেছে।

৯

পাল্টা অভ্যুত্থান ও জেলহত্যা

ঐ বিশৃঙ্খল অবস্থার মাঝে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। টেলিফোন উঠিয়ে আমি একজন লোকের কণ্ঠ শুনলাম ঃ লোকটি বলছে, 'আমি ডিআইজি/প্রিজন কথা বলছি। আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

—মেজর আবদুর রশিদ

প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন অর্থাৎ বঙ্গভবন-এর নির্মাণ শৈলী অত্যন্ত চমৎকার হলেও এতে কোন সামরিক অবরোধ ঠেকানোর ব্যবস্থা রেখে নির্মাণ পরিকল্পনা করা হয়নি। ঔপনিবেশিক কায়দায় নির্মিত এই চমৎকার দালানটির বিরাট বিরাট রাস্তা আর রঙ্গীন রকমারী ফুলের সমারোহ সেকালের বিলাসিতা আর মনমোহিনী পরিবেশের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিদিনের ক্লেশ আর গ্লানি থেকে যেন অনেক দূরে তার অবস্থান। এ যেন এক ভিন্ন জগত। কেবলই জাঁকজমক চতুর্দিকে। কোন তড়িঘড়ির ব্যাপার নেই। সর্বত্রই যেন শৃঙ্খলার ছাপ। অথচ ২রা নভেম্বরের (১৯৭৫) ঐ ভয়ঙ্কর রাত্রিতে বঙ্গভবনকে একটি মিলিটারী ক্যাম্প-এর মত দেখাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো কোন এক আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার বিপুল সমরসজ্জা চলছে সেখানে।

ট্যাংকের ইঞ্জিন চালু করার গর্জনে শত শত কাক আকাশে উড়ে শহরটিকে গরম করে তুলেছিলো। মুহূর্তের মধ্যেই বাকী ট্যাংকগুলো চালু হয়ে যাওয়ায় আর অন্য কোন কিছুর শব্দ কানে আসছিলো না। ট্যাংকগুলোর ৮টা ছিলো বঙ্গভবনে, ৮টা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আর ১২টা ছিলো ক্যান্টনমেন্টের ল্যান্সার লাইনে।

ফারুক তখন রশিদের পাশের কামরায় ঘুমুচ্ছে। রশিদ তাকে জাগিয়ে ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পদাতিক গার্ড বাহিনী পালিয়ে যাবার খবরটি জানিয়ে দু'জনে তৎক্ষণাৎ খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে বৈঠকে বসে পড়ে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, ট্যাংকগুলোকে চালু করে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। মেশিনগান আর স্টেনগান নিয়ে সৈন্যরা লম্বা বাউন্ডারী দেয়ালের নির্দিষ্ট স্থানে পজিশন নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ট্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নেয়ার আগে, ফারুক একটি মাত্র টেলিফোন করে। টেলিফোনটি করেছিলো তার এক বন্ধু আর্মি অফিসারকে। সে তখন সরকারের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত। বহিঃর্বিশ্বের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার জন্যে ফারুক তাকে অনুরোধ জানিয়েছিলো। ঐ অফিসার তার কথা রেখেছিলো কিনা তা জানা যায়নি। তবে, রশিদ আর মোশতাক তাঁদের বিপক্ষে কাজ করার জন্যে ঐ সংঙ্কটময় মুহূর্তে প্রচুর অফিসারকেই লক্ষ্য করেছিলো সেদিন।

রশিদ প্রেসিডেন্টের অফিসে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে সে বিভিন্ন স্থানে সাহায্যের জন্যে টেলিফোন করতে করতে অস্থির হয়ে উঠেছিলো। প্রথমেই সে টেলিফোন করে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান, জেনারেল জিয়াকে। সে জেনারেল জিয়াকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ঘটনার বর্ণনা করে এবং তার সাহায্য কামনা করে। জিয়া ব্যাপারটি 'ভেবে দেখবেন' বলে জানান। তারপর সেই 'ভেবে দেখা' আর কখনই হয়ে উঠেনি।

চীফ অব জেনারেল স্টাফ, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে রশিদ ফোন করে জিজ্ঞেস করে ঃ 'এ সব কি হচ্ছে, স্যার?' ব্রিগেডিয়ার বলে, 'কি হচ্ছে, তুমিই বলো।' রশিদ সংক্ষেপে বর্ণনা শেষে প্রশ্ন তুলে, 'আপনি এতে কি মনে করেন?' 'এখানে মনে করার কি আছে?' গর্জে উঠে খালেদ। 'পূর্বে যা প্রত্যাশা করা হয়েছিলো, এখন কেবল তাই শুরু হয়েছে। আমি এখনই বেরিয়ে পড়ছি। তুমি সেখানে অপেক্ষা করো। আমি পরে তোমাকে ডেকে নেবো।'

রশিদের তৃতীয় ফোন বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর সদর দফতরে। কিনতু সেখানেও কোন ভরসা পেলো না। তারপর ডায়াল করে এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াবকে। তোয়াবকে রশিদের উদ্যোগেই বিমান বাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হয়। তার বড় প্রত্যাশা ছিলো তোয়াবের উপর। অথচ সেখান থেকেও তাকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়।

রশিদ উপায়ান্তর না দেখে, জেনারেল ওসমানীকে তাঁর ক্যান্টনমেন্টের বাসায় ফোন করে। ঘটনাটা একটু বর্ণনা করে ওসমানীকে বঙ্গভবনে আসার অনুরোধ জানায় রশিদ। কিন্তু তখন তার বাসায় কোন গাড়ী না থাকায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি বঙ্গভবনে আসতে পারলেন না। কিন্তু বৃদ্ধ জেনারেল প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করার সম্ভাব্য সকল পন্থাই ঘুরে দেখেন। তিনি প্রথমেই বাংলাদেশ রাইফেলস্‌কে দুই ব্যাটালিয়ান সৈন্য প্রেসিডেন্টকে পাহারা দেয়ার জন্যে পাঠাতে নির্দেশ দেন। কিন্তু যেভাবে হোক, কোন বিডিআর বঙ্গভবনে পৌঁছাতে পারেনি। তারপর তিনি টেলিফোন করেন জেনারেল জিয়াকে। সেখানেও কোন আশাব্যঞ্জক সাড়া পেলেন না।

অবশেষে বহু খুঁজে তিনি চীফ অব জেনারেল স্টাফ, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে

তার ব্রিগেড লাইনে ধরতে পারলেন। ব্রিগেডিয়ার-এর সঙ্গে বৃদ্ধ জেনারেলের যে সংক্ষিপ্ত ও কড়া কথা বিনিময় হয়, তাতে তিনি ধরে নিয়েছেন যে, ইতিমধ্যেই খালেদ অভিযানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে।

ওসমানী ঃ 'খালেদ এ সব কি হচ্ছে?'

খালেদ ঃ ট্যাংকগুলো হুমকির ভাব-ভঙ্গিমা গ্রহণ করছে কেন?

ওসমানী ঃ কিসের হুমকির ভাব-ভঙ্গিমা? তুমি তোমার পদাতিক বাহিনী সরিয়ে নিয়ে আস। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, ট্যাংকগুলো তোমাকে কিছুই করবে না।

খালেদ ঃ ঘাবড়াবেন না। আমি নিজেই সে ব্যবস্থা করে নিচ্ছি।

খালেদ মোশাররফ আর শাফাত জামিল বঙ্গভবন থেকে মেজরদেরেকে সরানোর জন্যে বহুদিন থেকে চেষ্টা করছিলো। শেখ মুজিবের হত্যার দিন খালেদ মোশাররফ নিজেই শাফাত জামিলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে প্রস্তুতি নিতে বলেছিলো। মধ্যরাতে আঘাত হানার জন্যে সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত অবস্থায় রাখা হয়েছিলো। কিন্তু ঐ 'এ্যাকশন' আর কখনো নেয়া হয়নি। কারণ, এর আগেই খালেদ মোশাররফকে বঙ্গভবনে ডেকে পাঠানো হয়েছিলো এবং তৎপরবর্তী তিন দিন ধরে সে জামিলের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ করতে পারেনি।

শাফাত জামিল সেনাবাহিনীতে 'চেইন অব কমান্ড' ফিরিয়ে আনার জন্যে সেনাবাহিনীর প্রধান, জেনারেল জিয়ার সঙ্গে এক দফায় আলোচনা করে, কিন্তু জিয়া, এ ব্যাপারে ভালমন্দ কিছুই বলেননি। তিনি সম্ভবতঃ দু'কূলই রক্ষা করে চলছিলেন।

২৫শে অক্টোবর, জেনারেল জিয়া ব্রিগেডিয়ার শাফাত জামিলকে সেনা সদরে ডেকে পাঠান। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব বসা ছিলো। এই দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিলো না বলে তিনি তাদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন কিংবা আরো জটিল করার মানসে তাদেরকে একা রেখে তিনি টয়লেটে চলে যান। দশ মিনিট পর তিনি বেরিয়ে আসেন। কিন্তু এর মধ্যে তাদের দু'জনের ভেতর কোন কথাবার্তা হয়নি।

১লা নভেম্বর, খালেদ মোশাররফ শাফাত জামিলকে নিয়ে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্যে ঢাকা স্টেডিয়ামের আশেপাশে চাইনিজ রেস্তোরাঁয় মিলিত হয়। সেখানে দু'জন জুনিয়র অফিসার অভ্যুত্থানের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জেনারেল জিয়াকে হত্যা করার প্রস্তাব করলে, খালেদ মোশাররফ এতে ভেটো দেয়। সে আর কোন রক্তপাত দেখতে চায়নি। সিদ্ধান্ত হয় যে, পরদিনই বঙ্গভবনে আঘাত হানতে হবে। মেজরদেরকে তাদের ট্যাংকসহ সরিয়ে দিয়ে সরকারের ক্ষমতা কব্জা করতে হবে। একই সঙ্গে তারা জিয়াকে আটক করে, তাকে জোরপূর্বক অবসর গ্রহণে বাধ্য

করা হবে। তারপরে আর কোন দিক থেকে কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না বলে ষড়যন্ত্রকারীরা মনে করে।

পূর্ব পরিকল্পনামত ব্রিগেডিয়ার শাফাত জামিলের নির্দেশে বঙ্গভবনে পাহারারত ৩০০ সৈন্য (পদাতিক বাহিনীর) মধ্যরাতের পর অত্যন্ত গোপনে মেজর ইকবালের নেতৃত্বে বঙ্গভবন ত্যাগ করে ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে রিপোর্ট করে। এখান থেকেই পাল্টা অভ্যুত্থানের শুরু।

ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহর নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠানো হয় জেনারেল জিয়াকে আটক করার জন্যে। তারা তাঁর বাড়ীতে সকল যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জিয়াকে তাঁর হল ঘরে আটকিয়ে রাখে। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একজন সশস্ত্র গার্ড ছিলো। অন্যদিকে, বেগম জিয়া তাঁর শোবার ঘরের টেলিফোন দিয়ে জেনারেল ওসমানী আর মেজর রশিদের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছিলো।

মাত্র এক ঘণ্টা আগে জেনারেল জিয়ার সঙ্গে রশিদের আলাপ হয়েছিলো। ইতিমধ্যে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিলো। সে দ্বিতীয়বারের মতো জিয়ার নিকট ফোন করে। টেলিফোন উঠায় বেগম জিয়া। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তিনি তাকে জানান যে, তার স্বামী এখন বন্দী। তিনি তার স্বামীর জীবনের নিরাপত্তার জন্যে পাগল প্রায় হয়ে উঠেছিলেন। রশিদ তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। 'ঘাবড়াবেন না। এ পর্যন্ত যদি ওরা তাকে কিছু না করে থাকে তাহলে ওরা তাকে আর কিছু করবে না। তবু, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। কেবল তিনিই এখন আমাদেরকে বাঁচাতে পারেন।'

আসলেই, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তখন তাদের জন্যে অন্য কোন পন্থা খোলা ছিলো না। কোন মানুষই মেজরদের কোন উপকারে আসতে পারেনি। ১৫ই আগস্টের পর থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত দেহের উপর পা রেখে তারা এতোদিন ধরে ক্ষমতা, ছল-চাতুরী আর মিথ্যা রাজনীতির যে ফানুস সৃষ্টি করেছিলো, তা ততক্ষণে সবদিক থেকে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছিলো।

এরই মাঝে ঘরের একটি টেলিফোন বেজে উঠে। রিং করেছে স্বয়ং খালেদ মোশাররফ।

খালেদ ঃ আমরা এখন যুদ্ধে নেমে গেছি। সুতরাং এখন একটা 'আপস-রফায়' আসতে তোমার আপত্তি কি?

রশিদ ঃ কিসের আপস-রফা?

খালেদ ঃ চলে আসো এবং আমার সঙ্গে যোগ দাও। তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই।

রশিদ ঃ আমার অবস্থান জেনে নিন। আমি কেবল একবারেই বিশ্বাস করি—আমি

ভুল করতে পারি, কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি না। বিশেষ করে, এই রকম অবস্থায় তো আপসের কোন প্রশ্নই উঠে না।

খালেদ ঃ পাল্টা ব্যবস্থা নিয়ে আমরা এগিয়ে আসছি। শেষ পর্যন্ত তোমাকে আমি দেখে নেবো।

রশিদ ঃ আপনি যদি যুদ্ধ শুরুই করে থাকেন, তাহলে এটা আপনার ভাগ্যের উপর নির্ভর করবে। আমিও আপনাকে শেষ পর্যন্ত দেখে ছাড়বো।

অনেকক্ষণ ধরে একে অন্যকে গালাগালির পালা চললো। বাংলাদেশ গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছালেও যুদ্ধটা তখনকার মতো টেলিফোনেই সীমাবদ্ধ রইলো।

ঐ সময়ে বঙ্গভবনের আসন্ন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে পুরোপুরি রণসাজে সজ্জিত। তারা দেখতে পাচ্ছিলো ব্রিগেডিয়ার শাফাত জামিলের ৪৬তম পদাতিক বাহিনী এগিয়ে আসছে। ভোরের আবছা আলোতে তাদেরকে অনেক দূর থেকে ক্ষীণভাবে দেখা যাচ্ছিলো। কিন্তু ঐ পদাতিক বাহিনীর সৈন্যেরা নিজেদেরকে নিরাপদে দূরত্বে রাখার চেষ্টা করছিলো। কেননা, ভারী মেশিনগান আর অন্যান্য অস্ত্র ঘুরিয়ে নিয়ে শত্রুর দিকে তাকে করে রাখার চেষ্টা চলছিলো ট্যাংকগুলোতে।

পাল্টা অভ্যুত্থান শুরু হবার কারণে বাহিরে যে সাংঘাতিক অবস্থা বিরাজ করছিলো তার প্রতিফলন প্রেসিডেন্ট ভবনেও পড়তে শুরু করে। একদিকে টেলিফোন বাজছে অন্যদিকে নির্দেশের পর নির্দেশ জারি করা হচ্ছে। লোকজন খবর নিয়ে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ছুটাছুটি শুরু করেছে। এর মাঝে, রশিদ বাইরে অবস্থানরত সৈনিকদের উপরও নজর রেখে চলেছে। ভোর ৪টা বাজার একটু পরেই রশিদ আর একটি টেলিফোনের রিসিভার উঠায়। রশিদের ভাষায়, ঐ বিশৃঙ্খল অবস্থার মাঝেই টেলিফোনটি বেজে উঠে। টেলিফোন উঠিয়ে আমি শুনতে পেলাম, একজন ভারী কণ্ঠে কথা বলছে, "আমি ডিআইজি/প্রিজন কথা বলছি, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই।"

রশিদ মোশতাককে টেলিফোনটি দিলে, তিনি কিছুক্ষণ ধরে কেবল হ্যাঁ, হ্যাঁ, করতে থাকেন। তাঁর কথা পরিষ্কার বুঝা না গেলেও যে-কোন ব্যাপারেই হোক, তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন, এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

টেলিফোনে যখন আলাপ চলছিলো, তখন ফারুক-রশিদের পরিকল্পিত 'আকস্মিক পরিকল্পনা' কার্যকরী করার জন্যে রিসালদার মুসলেহউদ্দিন তার দলবল নিয়ে কেন্দ্রীয় কারাগারে চার নেতাকে খুন করার জন্যে ভেতরে প্রবেশের অপেক্ষারত। ভেতরে প্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে ডিআইজি কারাগারে এসে হাজির হয়। পরে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করে ডিআইজি, মুসলেহউদ্দিনকে তার দল নিয়ে কারাগারের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়।

তাজউদ্দিন আর নজরুল ইসলাম কারাগারের একটি সেলে অবস্থান করছিলেন। মনসুর আলী আর কামরুজ্জামান ছিলেন পাশের আর একটি সেলে। তাদেরকে তাজউদ্দিনের সেলে একত্রিত করা হয়। একত্রিত অবস্থায় খুব কাছে থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে তাদেরকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। তাদের তিনজন সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারালেও তাজউদ্দিন পেটে ও পায়ে গুলি খেয়ে রক্তক্ষরণের ফলে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পরে মারা যান। পাশের সেলে অবস্থানরত কারাবন্দী জানায় যে, সে ওখানে মৃত্যু যন্ত্রণায় কোন একজনের আর্তনাদ শুনেছিলো। আর পানি পানি বলে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাঁতরানোর মর্মভেদী শব্দও তার কানে আসছিলো। কিন্তু বর্বর ঘাতক, মুসলেহউদ্দিন ও তার গ্যাং চলে যাবার আগে সেলটিকে খুব শক্ত করে তালাবদ্ধ করে রেখে যাওয়ায় মৃত্যুর আগে তাজউদ্দিনের মুখে এক ফোঁটা পানিও কেউ তুলে দিতে পারেনি।

১৯৭১-এর ডিসেম্বরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালীদের যেমন করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলো, এই হত্যাও ঠিক ঐভাবেই সংঘটিত হয়েছিলো। অথচ বুদ্ধিজীবীদেরকে জাতীয়ভাবে বৎসরে একবার স্মরণ করা হলেও ঐ চার নেতার ভাগ্যে সেটুকুও জুটলো না।

চার নেতাকে জেলে রেখে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার ব্যাপারে জনমনে বিভিন্ন রকমের জল্পনা-কল্পনা থাকলেও অন্ততঃ ঐ সময়ের ক্ষমতাসীন সরকারের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত ছাড়া তা করা সম্ভব ছিলো না—একথা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। তাজউদ্দিন হয়তো কোনভাবে তা বুঝতে পেরেছিলেন কিংবা ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। জেলে থাকাকালীন মিসেস তাজউদ্দিনের সঙ্গে যে দু'বার অল্পক্ষণের জন্যে তাঁর দেখা হয়, তার শেষেরটিতে ঐ ইঙ্গিতটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট মনে হচ্ছে। 'পরিস্থিতি খুবই খারাপ। আমার মনে হয় না যে, জীবিত অবস্থায় আমরা কোনদিন জেল থেকে বের হতে পারব।'

১৯৭৫-এর নভেম্বরে, তিনজন সুপ্রীম কোর্ট জজের সমন্বয়ে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেই সরকার 'খালাস' পান। কিন্তু জেনারেল জিয়া, তাঁর সাড়ে পাঁচ বছর শাসনকালে ঐ তদন্ত কমিশনকে তাঁদের কাজ পরিচালনা করতে সম্মতি দেননি। কারণটি অবশ্য জানা যায়নি। সুতরাং কমিশন এমনিতেই বাতাসে মিলিয়ে যায়। এই ঘটনাটি সব সময়ই জেনারেল জিয়ার স্মৃতিকে কলঙ্কের কালিমা মেখে রাখবে। আর যা-ই ঘটুক, সরকারী ইঙ্গিতে এই ধরনের জেলে বন্দী রেখে নির্মমভাবে হত্যা করা নিঃসন্দেহে একটি জঘন্যতম লোমহর্ষক অপরাধ। এই সকল কারণেই আমাদের পতন আসে। আর বাংলাদেশও ঐ রক্তের ঋণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

৩রা নভেম্বরের সকালবেলা। পরিস্থিতি ক্রমেই গরম আকার ধারণ করছে। জেনারেল ওসমানী বহু কষ্টে প্রেসিডেন্ট ভবনে এসে পৌঁছেছেন খালেদ মোশাররফ

দু'জন কর্নেল আর দু'জন প্রাক্তন মেজর দিয়ে তার দাবীনামা পাঠিয়ে দিয়েছে। দাবীনামার প্রথমটি এই যে, ট্যাংকগুলোকে নিরস্ত্র অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যেতে হবে। দ্বিতীয়তঃ জেনারেল জিয়ার স্থলে অন্য একজনকে সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব দিতে হবে। তৃতীয়তঃ মোশতাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকতে পারবে—তবে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করতে হবে। অত্যন্ত ঔৎসুক্যের ব্যাপার এই যে, ঐ দাবীতে ফারুক আর রশিদের আত্মসমর্পণের কোন উল্লেখ ছিলো না। মোশতাক দাবীনামার ফিরিস্তি শুনে তা পালন করতে অস্বীকৃতি জানান এবং ভোর ৬টার পর থেকে তিনি রাষ্ট্রপতি থাকছেন না বলে ঘোষণা করেন।

মোশতাক অফিসারদেরকে জানান যে, তিনি তাদের দাবী মেনে নিতে পারছেন না। কারণ, সকাল ৬টার পর থেকে তিনি আর প্রেসিডেন্ট থাকছেন না। তারা তখন জেনারেল ওসমানীকে জিজ্ঞেস করে। জেনারেল বলেন যে, খন্দকার মোশতাক যেহেতু প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন, প্রেসিডেন্টের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসেবেও তাঁর ক্ষমতা আপনা-আপনিই শেষ হয়ে গেছে। ডালিম কর্কশভাবে ওসমানীকে বলে, 'তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বলুন।' আমি জানি, 'আইয়ুব খান কেন আপনাকে বৃদ্ধ নকুল বলে ডাকতেন। কিন্তু এই অবস্থায় জেদ দেখাবার চেষ্টা করবেন না।'

সকাল ১০টা পর্যন্ত ঐ অবস্থাতেই চলতে থাকলো। এমন সময় পুলিশের আইজি বঙ্গভবনে টেলিফোন করে। তখন ডিফেন্স স্টাফ প্রধান, জেনারেল খলিলুর রহমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তার ভাষায় ঃ 'পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি আমাকে তাজউদ্দিন আর তার সহকর্মীদেরকে ঐ রাতেই সেলের ভেতরে হত্যা করা হয়েছে বলে জানান। খবর শুনে আমি আঁতকে উঠি। দেরি না করে আমি প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারী, মাহবুবুল আলম চাষীর নিকট ছুটে যাই এবং ঘটনাটি প্রেসিডেন্টকে জানাতে বলি। সঙ্গে সঙ্গেই চাষী উঠে প্রেসিডেন্টের রুমে যান। এক মিনিটের মধ্যেই তিনি ফিরে এসে বলেন ঃ "তিনি তা জানেন।"

জেনারেল খলিল জেল হত্যায় মোশতাকের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলেও তিনি ঘটনাটি আর কাউকে জানালেন না। পরে রশিদ আর ফারুকের দেশত্যাগের জন্যে বিপরীত পার্টির নিকট অনুরোধ জানান খন্দকার মোশতাক। খালেদ মোশাররফ আর শাফাত জামিল মোশতাকের অনুরোধে রাজী হয়। এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তাদেরকে ব্যাংককে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেয়া হয়।

এক পর্যায়ে মোশতাক নিজেও মেজরদের সঙ্গে প্রবাসে চলে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু খালেদ ও কথা শুনেনি। শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবের হত্যার সঙ্গে জড়িত—

ডালিম, নূর, হুদা, পাশা আর শাহরিয়ারসহ মোট ১৭ সদস্যের একটি দল ফারুক আর রশিদের সঙ্গে প্রবাসে চলে যায়।

মেজরদের চলে যাবার পর মোশতাক আর কোনভাবেই পরবর্তী সরকারে থাকতে চাইলেন না। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বাড়ী আগামসিহ লেনে চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু খালেদ মোশাররফ রাজী হলেন না। তিনি তাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবেই পুনরায় দেখতে চাইলেন। মোশতাক রাজী হলেন। তবে শর্ত দিলেন দু'টি। একটি হলে—সেনাবাহিনীকে তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হবে এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। দ্বিতীয়টি হলো—মন্ত্রী পরিষদকে আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হয়ে তাঁর প্রতি সমর্থন ও আস্থার কথা প্রকাশ করতে হবে। খালেদ মোশাররফ এতে খুশী হতে পারেনি। সে বরং উল্টো জেনারেল জিয়ার পরিবর্তে তাকে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান নিয়োগ করার দাবী জানায়। জেনারেল ওসমানীর মতে, এতে বিমান বাহিনীর প্রধান, এয়ার ভাইস মার্শাল এম. জি. তোয়াব আর নৌবাহিনীর প্রধান, কমোডর এম. এইচ, খানের সক্রিয় সমর্থন ছিলো। দু'দিন পরেই ঐ সক্রিয় সমর্থক দুই বাহিনীর প্রধানকে খালেদ মোশাররফের পোশাকের দুই কাঁধে জেনারেলের স্টার এবং ফিতা লাগাতে দেখা যায়। সেদিনই বাংলাদেশ অবজারভার প্রথম পাতায় তাদের ছবিটি ফলাও করে প্রকাশ করে। তারপর দু'দিন যেতে না যেতেই খালেদ মোশাররফ সিপাহী বিদ্রোহে প্রাণ হারায়। আশ্চর্যের বিষয়, কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই ঐ দুই বাহিনীর প্রধান আবার জিয়ার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে।

মঙ্গলবার সকাল দশটায় খালেদ মোশাররফ সঙ্গে করে নিয়ে আসে মেজর জেনারেল খলিল, তোয়াব আর কমোডর খানকে। তারা একটি শোক সংবাদ নিয়ে এসে হাজির হয়। সংবাদটি ছিলো জেনারেল জিয়ার সেনাবাহিনীর চাকুরী থেকে ইস্তফা দান। জিয়া সংক্ষেপে তাঁর ইস্তফা পত্রে উল্লেখ করেন যে, তিনি রাজনীতিতে নিজেকে জড়াতে চান না। সে কারণেই সেনাবাহিনী থেকে সরে দাঁড়াতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সে যাই হোক, জীবনের হুমকির মুখে জিয়ার কাছ থেকে ইস্তফা আদায় করা হয়েছিলো বলে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়। কারণ, তিনি ইস্তফা দেয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার বাড়ীতে বন্দী অবস্থায় সময় কাটাচ্ছিলেন। জিয়াকে তার পেনশনের টাকা দিয়ে সংসার চালাতে হবে বলে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে। অন্যান্যদের মতো তিনি টাকা বানাতে পারেননি। অত্যন্ত করুণ হলেও সত্যি যে, একজন জেনারেল হয়ে চাকুরীতে ইস্তফা দেয়ার পর তিনি তাঁর একজন জুনিয়র অফিসারকে মাসিক তিনশত টাকা ভাড়ায় একটি বাড়ী করে দেয়ার জন্যে বলেছিলেন। 'কিন্তু স্যার,' বিব্রত অফিসার জবাব দেয়, 'এমন কি মোহাম্মদপুরের মতো জায়গায়ও আটশত টাকার কমে বাড়ী ভাড়া পাওয়া সম্ভব নয়।'

অভ্যুত্থানের নায়ক, খালেদ মোশাররফের জন্যে সেনাবাহিনীর প্রধান হবার পথ সুগম হয়ে গেলো। কেননা, জিয়া আর তার পথের কাঁটা হয়ে রইলেন না।

মোশতাক মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকবেন বলে স্থির করলেন। ওসমানী, খালেদ, তোয়াব, কমোডর খান এবং জেনারেল খলিল সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্যে বলে দিলেন। তারা যখন চলে যাচ্ছিলো, এমন সময় 'ফোর্সেজ ইন্টেলিজেন্স'-এর ডাইরেক্টর, এয়ার কমোডর ইসলাম, তাজউদ্দিন ও তার সঙ্গীদের জেলের ভেতরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে খবর নিয়ে ছুটে আসে।

ওসমানী স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'প্রচন্ড হৈ চে-এর সৃষ্টি হয়ে যায়। উপস্থিত কয়েকজন মন্ত্রী ভয়ে একেবারে জড়সড় হয়ে পড়ে। অন্যান্যরা সজোরে চিল্লাচিল্লি শুরু করে দেয়। আমরা সবাই একেবারে হতবাক হয়ে যাই। আমি ভেবে অস্থির হয়ে যাই এই জন্যে যে, আমরা আরো একবার চরম বর্বরতার আশ্রয় নিলাম।'

আর যাই হোক না কেন, মোশতাক একজন চমৎকার অভিনেতা। তিনিও অন্যান্যদের মতো সজোরে বিলাপ করতে শুরু করলেন। ভাবখানা এই রকম, যেন তিনি এই সংবাদ শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। কালবিলম্ব না করে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক ডাকলেন। মন্ত্রী পরিষদ জেল হত্যার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্যে একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে। তিনজন সুপ্রীম কোর্টের জজ সমন্বয়ে কমিশনটি গঠিত হয়। তারপর তাদের মধ্যে পাল্টা অভ্যুত্থান নিয়ে এবং ফারুক, রশিদ আর দলের অন্যান্যদেরকে দেশত্যাগের অনুমতি নিয়ে এক প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়।

খালেদ, জেনারেল খলিল, তোয়াব আর কমোডর খান ভেতরে এসে তারা সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য আর প্রেসিডেন্টকে মেনে চলার প্রতিজ্ঞা পেশ করে। কিন্তু মন্ত্রী পরিষদের কেউ কেউ খালেদ মোশাররফকে চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করায় অসন্তোষ জ্ঞাপন করে। এ নিয়ে খন্দকার মোশতাক আর জেনারেল ওসমানীর মধ্যে চালাকিপূর্ণ কথাবার্তা বিনিময়ের এক পর্যায়ে সভায় ক্রোধান্বিত বাক্য বিনিময়ের সূত্রপাত হয়।

হঠাৎ দরজায় সজোরে চিৎকার শুনে ভেতরের গরম বাক্য বিনিময় থেমে যায়। শাফাত জামিল আরো পাঁচজন অফিসার নিয়ে স্টেনগান হাতে কেবিনেট রুমে জোরপূর্বক ঢুকে পড়ে। এতে কেবিনেট রুমে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং মন্ত্রীরা চেয়ার ছেড়ে যে যেভাবে পারে পালাতে চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট মোশতাককে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে দেখা যায়। তাঁর মাথার উপর এক মেজর স্টেনগান ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওসমানী তাকে বাঁচানোর জন্যে দৌড়ে যান এবং অনুরোধের সুরে বলতে থাকেন, 'খোদার দোহাই কিছু করো না। এই অবস্থায় কিছু করা, পাগলামো ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা দেশটাকে ধ্বংস করে ফেলবে।

শাফাত জামিল মোশতাকের পদত্যাগ দাবী করে। সে প্রেসিডেন্টের দিকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বলতে থাকে 'তুমি খুনী। তুমি জাতির পিতাকে খুন করেছো। জেলের ভেতর আটকে রেখে সংগোপনে চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছো তুমি। তুমি জবরদখলকারী। তোমার সরকার, বেআইনী সরকার। ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার কোন অধিকার তোমার নেই। তোমাকে অবশ্যই অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে।'

তারপর জেনারেল খলিলের দিকে তাকিয়ে জামিল বলতে থাকে, 'জেল হত্যার ঘটনাটি চেপে রাখার জন্যে আপনি দায়ী। আপনাকে আটক করা হলো।'

প্রচন্ড হট্টগোল বেশ কিছুক্ষণ চললো। যতবারই বন্দুকধারী অফিসারেরা মন্ত্রীদের প্রতি বন্দুকের নল উঠিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো, ততবারই ওসমানী তাদেরকে ধাক্কিয়ে ফিরিয়ে রাখছিলো। পরিশেষে উপায়ান্তর না পেয়ে ওসমানী মোশতাককে বললেন, 'ব্যাপার অত্যন্ত খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে। আপনি বরং এখনই পদত্যাগ করুন।' মোশতাক মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। এতে অতন্তঃ ঐ গরম হওয়া কিছুটা ঠান্ডা হবার ভাব দেখা গেল।

মন্ত্রীদেরকে আবারো বসানো হয়। মোশতাকের পরিবর্তে প্রধান বিচারপতিকে দেশের প্রেসিডেন্ট বানানোর জন্যে শাফাত জামিল প্রস্তাব করে। আইনমন্ত্রী, মনোরঞ্জন ধর আপত্তি তোলে এবং জাতীয় সংসদের স্পীকারকে প্রেসিডেন্ট করার আইনগত ভিত্তির কথা জানায়। এতে জামিল ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'রাখুন আপনাদের গালভরা আইনের বুলি। একটা হত্যাকে নিয়মানুগ করার জন্যে আপনারা দেশের শাসনতন্ত্রকে পাল্টাতে পেরেছেন। সুতরাং আপনারা এটাকে আবারও পাল্টাতে পারবেন। আমি বলছি, প্রধান বিচারপতিই প্রেসিডেন্ট হবেন।'

এতে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে যায়। অন্যদিকে—তাহেরউদ্দীন ঠাকুর, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং কে, এম ওবায়দুর রহমানকে তাদের পদত্যাগ পত্র লিখার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়। পরে অবশ্য ঠাকুর আর শাহ্ মোয়াজ্জেমকে দুর্নীতি আর ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্যে আটক করা হয়।

এরপর কয়েক ঘণ্টা ধরে বঙ্গভবনে প্রচুর কাজ করা হয়। কেননা, কর্মরত কর্মচারীরা সরকার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সেরে নিচ্ছিলো। মোশতাকের সই নেয়ার জন্যে অনেক কয়টা চিঠিই তখন পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে গেছে। এর মধ্যে মেজরদেরকে দেশত্যাগের অনুমতি আর জেলহত্যা সংক্রান্ত চিঠি দু'টিতে সই করার জন্য খালেদ মোশতাকের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

৫ই নভেম্বর। বেলা ১টায় প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে বঙ্গভবনে নিয়ে আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। ওসমানী তাকে বলেন, 'আপনাকে দেশের প্রেসিডেন্ট বানানোর জন্যে নিয়ে আসা হয়েছে।' প্রধান বিচারপতি সঙ্গে সঙ্গে ঐ সম্মানের মালা

গলায় নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ওসমানী বিচারপতিকে উপদেশ দিয়ে বলেন, 'খোদার দোহাই আপনি এই অনুরোধ রক্ষা করুন। আপনাকে দেশের প্রেসিডেন্ট হতেই হবে। তা না হলে দেশে আইন-শৃঙ্খলা বলে কোন জিনিসই থাকবে না। এবং দেশটার একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

তারপরও তিনি ঐ অবস্থায় কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। বিচারপতি ফিরে বাড়ী চলে এলেন। তারপরই খালেদ, শাফাত জামিল, ওসমানী, খলিল আর বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধানগণ পেছনে পেছনে বিচারপতির বাড়ীতে যান। পরিশেষে, তারা তাকে প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য রাজী করাতে সক্ষম হন।

এইভাবে ১৯৭৫ সালের ৬ই নভেম্বর বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম দেশের স্বাধীনতার চতুর্থ বৎসরে ৫ম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ বাণী পাঠ করেন।

১০

একটি স্মরণীয় রাত

'সিপাই সিপাই ভাই ভাই,
অফিসারদের রক্ত চাই।'
—সিপাহী বিদ্রোহের শ্লোগান

৩রা, ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর (১৯৭৫)—এই তিনদিন বাংলাদেশে কোন সরকার ছিলো না। খন্দকার মোশতাক তখন নামে মাত্র প্রেসিডেন্ট। ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর নামেই কাজ-কর্ম চলছিলো। প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ঐদিন সকালবেলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে, মোশতাক বঙ্গভবনের বন্দী জীবন-যাপন করছিলেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আর কর্নেল শাফাত জামিল তাকে বঙ্গভবনের নীচতলায় তাঁর কক্ষে নিরাপদে আটকে রেখেছিলো।

অভ্যুত্থানের দুই নেতাই তখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা বদলের ব্যাপারে তারা ছিলো অটল। বাস্তব পরিস্থিতি যখন তাদের বিপরীতে, তখন তারা ক্ষমতা বদলের জন্যে ব্যস্ত।

মেজরদেরকে ব্যাংককে পাঠিয়ে খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীর প্রধান হবার জন্যে মোশতাক আর জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ওরা প্রধান বিচারপতিকে প্রেসিডেন্ট বানানোর জন্যে আর মোশতাককে আঁকড়ে ধরে রাখার জন্যে যে ধরনের সাংবিধানিক কৃত্রিম অভিনয়ের আয়োজন করছিলো, ঐ মুহূর্তে আদৌ তার কোন প্রয়োজনই ছিলো না। এই সকল হাস্যাস্পদ কাজ করতে গিয়েই সে তার অবস্থান সুদৃঢ় করতে ব্যর্থ হয়। খালেদের উচিত ছিলো ঐ সময়ে তার অভ্যুত্থানের প্রতি জনগণের সমর্থন আদায় করার ব্যবস্থা করা। এতে করে তার জীবন রক্ষা পেতে পারতো।

খালেদ মোশাররফ আর শাফাত জামিল সরকারের ক্ষমতা দখল ও তাদের নিজেদের সেই ক্ষমতা নিজেদের প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারেনি। জেনারেল ওসমানী কিংবা খন্দকার মোশতাককে তাদের কোন প্রয়োজন ছিলো না। সফল অভ্যুত্থান মানেই ক্ষমতার

অধিকারী হতে পারা। খালেদ সফল অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়ে ঐ ক্ষমতার অধিকারী হতে পেরেছিলো। খালেদ তখন সেনাবাহিনীর প্রধান কিংবা প্রেসিডেন্ট—এমন কি দুটোই হতে পারতো। দুই হাতে সর্বময় ক্ষমতা তুলে নিতে ব্যর্থ হবার কারণেই তার পতন অনিবার্য হয়ে পড়েছিলো। তিনদিন ধরে জনগণ বুঝতেই পারেনি যে, খালেদ মোশাররফ আসলেই ক্ষমতায় এসেছে। রাজনৈতিক শূন্যতার কারণেই তার শত্রুরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ঐ শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে আসে। ৬ই নভেম্বর, দেশের নূতন প্রেসিডেন্ট এ. এস. এম. সায়েম যখন খালেদের অভ্যুত্থানের কারণ এবং তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাদানে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়েই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে চলে যায়। মহান সিপাহী বিদ্রোহের দাবানল ইতিমধ্যেই জ্বলে উঠে। এতেই তার করুণ পরিণতি ঘটে।

খালেদের অভ্যুত্থান বাদ দিলেও দেশে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত কুড়িটিরও বেশী অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সব কয়টা অভ্যুত্থানই ছিলো অদূরদর্শিতা আর অপরিপক্ক পরিকল্পনা দোষে দুষ্ট।

১লা নভেম্বরে খালেদ ও তার সঙ্গীরা ঢাকা স্টেডিয়ামের কাছে একটি চাইনিজ রেস্তোরাঁয় যখন ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত, তখনই অন্য একটি দল অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালায়। মোশতাক সরকারকে উৎখাতের জন্যে একটি অভ্যুত্থান অত্যাসন্ন বলে গরম গুজব সারাদেশের বাতাসকে ভারী করে রেখেছিলো। ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে বামপন্থী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল আর সর্বহারা পার্টি সৈন্যদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার উস্কানি দিয়ে গোপনে বিপ্লবী সেল গঠন করে। সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান, জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজেও একটি অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে আছেন বলে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো। সে সময় পাকিস্তান ভাবাপন্ন দলগুলো নূতন পাকিস্তান গড়ার মানসে খন্দকার মোশতাকের চেয়ে অধিক বিশ্বাসযোগ্য কোন নেতার সন্ধান করতে থাকে। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে বলে, তখন ঢাকার বাতাস একেবারে রমরমা হয়ে উঠেছিলো।

খালেদের চাইনিজ রেস্তোরাঁ পরিকল্পনাটি অত্যন্ত অসময়োপযোগী প্রমাণিত হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্যাবলীও ছিলো অনুদার। শান্তিপূর্ণভাবেই হোক কিংবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই হোক—মেজরবৃন্দ আর তাদের ট্যাংকগুলোকে সরিয়ে সরকারের ক্ষমতা দখল করাই ছিলো ঐ ষড়যন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, একই সঙ্গে জিয়াউর রহমানকে আটক করে জোরপূর্বক তাকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা। ঐ দু'টি কাজ সম্পন্ন হবার পর খালেদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে নামে মাত্র মোশতাককে রেখে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের চিন্তা করছিলো। কিন্তু শাফাত জামিল মোশতাকের নামটা একেবারেই সহ্য করতে পারতো না। অবশেষে ৩রা নভেম্বর প্রেসিডেন্ট হিসেবে মোশতাককে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু যখন পরের দিন জেলহত্যার ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়, খালেদ তাকে বাদ দেয়া ছাড়া

আর কোন উপায় খুঁজে পায়নি। এতে আপাততঃ খালেদের পরিকল্পনায় বেশ কিছুটা পরিবর্তন আনতে হয়।

এই ব্যাপারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাদের পরিকল্পনার কোন পর্যায়েই বিকল্প সরকার গঠনের জন্যে তাজউদ্দিন আহমেদ কিংবা জেলে নিহত চার নেতার কাউকে জড়ানোর চেষ্টা করা হয়নি। খালেদ গ্রুপের একজন প্রাণে বেঁচে যায়। সে তার পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছা পোষণ করে। তার ভাষায়, 'যেইভাবে আমাদের উপর অভিযোগ আনা হয়েছে, সেইভাবে খালেদ যদি তাজউদ্দিন কিংবা ঐ চারজনের যে-কোন একজনকে সরকার প্রধান করতে চাইতো, তাহলে মেজরদের আত্মসমর্পণের পরপর কি আমরা তাদেরকে মুক্ত করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ে জেলখানায় চলে যেতাম না? যেহেতু আমরা তা করিনি, এতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের পরিকল্পনায় তাদের কোন স্থানই ছিলো না। আমরা ৪ঠা নভেম্বর দুপুরের আগ পর্যন্ত তাদের কথা আমাদের একেবারেই মনে ছিলো না। অথচ এর একটু পরেই আমরা জানতে পারি যে, ৩০ ঘণ্টা আগেই তাদেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে খুন করা হয়েছে। ৩রা নভেম্বর তাজউদ্দিনকে উদ্ধার করতে গিয়ে যদি আমরা তার মৃত্যু দেথকে পেতাম, তাহলে মেজরের গোষ্ঠী কিংবা মোশতাক কেউই বেঁচে থাকতে পারতো না। এবং অভ্যুত্থানের ফলাফল হতো সম্পূর্ণ ভিন্নতর।'

এই বক্তব্যেই যুক্তি অকাট্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এই যুক্তিও খালেদ মোশাররফের কোন কাজে আসতে পারেনি। খালেদ পুনরায় মুজিববাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে বলে সকলের মনে তার প্রতি একটা ঘৃণা জন্মে যায়। তাছাড়া, দেশটিকে ভারতের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে বলেও জনমুখে তিক্ত ক্ষোভ প্রকাশ করতে শোনা যায়।

জাসদের প্রকাশিত 'সাম্যবাদ' পত্রিকায় খালেদের চারদিনের অভ্যুত্থান সম্পর্কে প্রচলিত ইতিহাস তুলে ধরে ঃ 'খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় এসেই দেশের উপর সোভিয়েত-ভারত রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কাজে লেগে যায়। আওয়ামী লীগ ও তার লেজুড় মনি-মোজাফফর চক্র প্রকাশ্যে শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে লেগে যায়।' আসলে খালেদ কি করেছিলো সেইটা বড় বিবেচ্য বিষয় নয়, ঐ রকম প্রতিকূল অবস্থায় সে কি করতে ব্যর্থ হয়েছিলো, সেটাই তার পতন নির্ধারণের মাপকাঠি বলে ধরা উচিত। ঐ সুযোগের চমৎকার সদ্ব্যবহার করে তার প্রতিপক্ষরা তার গায়ে ভারতীয় একখানা সীলমোহর লাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারে ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ও সরকারী রেডিও প্রচারণা খালেদ মোশাররফের গুণগানে মুখর হয়ে উঠে। ভুল বোঝাবুঝির জন্যে এটা খুব কম ছিলো না। জনগণ সন্দেহ করতে থাকে যে, এ অভ্যুত্থানের পেছনে নিশ্চয়ই ভারতের হাত থেকে থাকবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সন্দেহই জনমত তার বিরুদ্ধে যেতে সাহায্য করেছিলো।

মোশতাক আর মেজরদের উৎখাতের খবর শুনে উৎফুল্ল আওয়ামী লীগার, ছাত্র এবং মুজিব সম্পর্কিত দলগুলো রাস্তায় নেমে পড়ে। ৪ঠা নভেম্বর, মঙ্গলবার তারা 'মুজিব দিবস' হিসেবে পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, শহীদ মিনারসহ ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মিছিল বের হয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে মুজিবের বাসভবনে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। পরদিনই তাজউদ্দিনসহ চার নেতার হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। তারপর ৭ই নভেম্বর, শুক্রবার শেখ মুজিবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোকসভার আয়োজন করা হয়। এই সবই জনগণের মনে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে এই অভ্যুত্থানের সূচনা করা হয় বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তখন জনগণ মুজিব শাসনামলের দুঃস্বপ্ন সবেমাত্র কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে। পরন্তু ফারাক্কা বাঁধের জন্যে তাদের মধ্যে ভারত বিরোধী চেতনাও চরমে উঠেছিলো। সর্বোপরি, তারা যখন আবিষ্কার করলো আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদের মা ও ভাই নেতৃত্ব দিচ্ছে, তখন তারা বুঝে নেয় যে, অভ্যুত্থানের পেছনে ভারত আর আওয়ামী লীগ জড়িত—এতে কোন সন্দেহ নেই। জাসদ আর মুসলিম লীগ সমস্ত শহর এবং ক্যান্টনমেন্টে হাজার হাজার লিফলেট আর পোস্টারে ভরিয়ে দেয়। এই অভ্যুত্থানের পেছনে ভারত কাজ করছে বলে প্রচার তুঙ্গে উঠে। এর ফল হলো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

পরে এক সাক্ষাতকারে শাফাত জামিল আমাকে জানায়, 'পরের দিন বুধবারের পত্রিকা দেখে খালেদ খুবই ঘাবড়ে যায়। টেলিফোন তুলে সঙ্গে সঙ্গে তার মাকে জিজ্ঞেস করে, "এটা তোমরা কি করেছো? তোমরা মিছিলে গেছো আর পত্রিকায় তোমাদের ছবি ছাপা হয়েছে। এটা করে তোমরা আমার দিন ফুরিয়ে দিয়েছো। আমি আর নাও বাঁচতে পারি।" জামিলের ধারণা, খালেদ বুঝে নিয়েছিলো এ সবই তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তাদের কেহই এ ব্যাপারে পাল্টা কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কোন চেষ্টাই চালায়নি। অভ্যুত্থানের নেতারা আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে উৎসাহিত কিংবা নিরুৎসাহিত কোনটাই করেনি। প্রথম তিন দিন যেখানে তাদের বিভিন্ন সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা উচিত ছিলো, সেখানে তারা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। চতুর্থ দিন ছিলো ৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার। সেদিন বিকেলে নূতন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম অভ্যুত্থানকারীদের পক্ষে বেতার ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'আমার সরকার নিরপেক্ষ, নির্দলীয় ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আমার সরকারের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন।' তিনি বলেন যে, 'শেখ মুজিবের হত্যায় সেনাবাহিনী জড়িত ছিলো না।' তিনি আরো বলেন, 'আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হবে। এবং নিষ্কলুষ, নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলা হবে।' এই সকল উদ্দেশ্যাবলী এতই প্রচ্ছন্ন এবং বাগাড়ম্বরবহুল ছিলো যে, জেনারেল জিয়াউর রহমান,

খালেদ মোশাররফের স্থলে নূতন মিলিটারী লীডার হবার একদিন পরেই তাঁর শাসনের প্রথম বছরের জন্যে ঐ সবগুলো নীতি কোন পরিবর্তন ছাড়াই দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর সরকারের নীতি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েমের বয়স তখন ৫৯ বৎরসর। যে-কোন মাপকাঠিতেই তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। অত্যন্ত খ্যাতিমান উকিল হিসেবে বহুদিন কাজ করার পর তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ হাই কোর্টের প্রথম 'চীফ জজ' নিয়োজিত হন। ১৯৭৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের সৃষ্টি হলে, তিনি হন তার প্রথম প্রধান বিচারপতি। তিনি প্রেসিডেন্ট হয়ে মোশতাকের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে একেবারেই নারাজ ছিলেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ছিলেন নিবেদিত ও আন্তরিকতাপূর্ণ। সরকার প্রধান হিসেবে খালেদের অভ্যুত্থানকে তিনি মর্যাদার আসনে আসীন করেন। কিন্তু পরের দিন তাঁর ভাষণ সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার আগেই সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়ে যায় এবং খালেদ এতে নিহত হন।

স্বল্পস্থায়ী অভ্যুত্থানে খালেদের একটিমাত্র ফায়দা হয়েছিলো। ঐ ফায়দাটি হচ্ছে তার সামরিক পদোন্নতি। ঢাকায় অবস্থিত সামরিক ইউনিটগুলোর নিয়ন্ত্রণ করলেও সে কখনো নিরাপদবোধ করেনি। কর্নেল শাফাত জামিলের ৪র্থ ও প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বেশ শক্তিশালী করে গড়া হয়েছিলো। কিন্তু একই সেনানিবাসে ফারুকের ল্যান্সার আর রশিদের আর্টিলারীও অবস্থান করছিলো। তাদেরক নিরস্ত্র করা হলেও তাদের থেকে যথেষ্ট ভয়ের সম্ভাবনা ছিলো। সুতরাং তাদেরকে 'ব্লক' দিয়ে রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। খালেদ এই উদ্দেশ্যে রংপুর থেকে ১০ম ও ১৫তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ডেকে পাঠায়। ওরা মুক্তিযুদ্ধের সময় তার 'কে' ফোর্সের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। ঐ সময় সে তাদের সহায়তায় তার শক্তিবৃদ্ধি করতে প্রয়াস পায়।

৫ই নভেম্বর মিলিটারী ফরমেশন কমান্ডারদের এক সম্মেলন ডাকে খালেদ। কিন্তু সে নিজে বা শাফাত জামিল কেউই ঢাকার অন্যান্য অফিসার বা সৈন্যদের প্রভাবিত করার চেষ্টাটুকুও করেনি। তারা এদেরকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে। এটা ছিলো তাদের জন্যে একটা মারাত্মক ভুল। প্রকৃতপক্ষে, ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যে দু'জন অফিসারের প্রতি খালেদ অতিমাত্রায় আস্থাশীল ছিলো তারাই সিপাহী বিপ্লবের সময় তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

৩রা থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত খালেদ মোশাররফ দেশের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তই দিতে পারেনি। এই সময়ের মধ্যে বিদেশের সঙ্গে মাত্র দু'টি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তার মধ্যে বৃটেনের সঙ্গে এক কোটি পাউন্ড স্টারলিং-এর কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ চুক্তি এবং তুরস্কের সঙ্গে ৪৯টি রেলওয়ে মিটার গেজ প্যাসেঞ্জার কোচের জন্যে ৩০৯ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই দুটোই ঢাকার সিনিয়র কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত হয়। অভ্যুত্থানের নেতাদের এই ব্যাপারে কিছুই

করণীয় ছিলো না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'ভারতীয় দালাল' বলে খালেদ-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিলো, প্রেসিডেন্ট সায়েমের বেলায়ও তা হতে পারতো। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ কেউ তুলেনি।

৬ই নভেম্বর মধ্যরাতের কিছু পরেই সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। দু'দিন ধরে ক্যান্টনমেন্টে অস্থির চিত্তে বেঙ্গল ল্যান্সার আর দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারীর সৈন্যেরা জেনারেল জিয়া আর মোশতাকের পদত্যাগের ব্যাপারটি অবলোকন করে। ব্যাংকক ত্যাগের আগে ফারুক ও রশিদ তাদের আশ্বাস দিয়েছিলো যে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু জিয়া, মোশতাক আর পাপা টাইগার নামে খ্যাত জেনারেল ওসমানীর অবর্তমানে সেই আশ্বাস যেন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিলো। তাদেরকে ছায়া দেয়ার জন্যে আর কেউ বাকী রইলো না। সৈন্যেরা তখন ব্রিগেডিয়ার খালেদ আর কর্ণেল জামিলের করুণার পাত্রে পরিণত হয়ে পড়ে। জামিল বেশকিছু জায়গায় প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেছে যে, সে মুজিব হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। সৈন্যেরা মনে করলো, দশম ও পঞ্চদশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে নিয়ে আসা হচ্ছে।

সৈন্যদের মানসিক অবস্থা যখন বিপর্যস্ত, তখন অর্থাৎ ৫ই ও ৬ই নভেম্বর ক্যান্টনমেন্টসহ সারা শহরে হাজার হাজার প্রচারপত্র ছাড়া হয়। ডানপন্থী মুসলিম লীগ আর বামপন্থী জাসদ এই কাজগুলো করে। ঐ সময়ে জাসদ ছিলো নিষিদ্ধ রাজনৈতিকদল। কিন্তু এরা বসে থাকেনি। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও বিপ্লবী গণবাহিনীর ছদ্ম আবরণে জাসদ এ কাজগুলো পরিচালনা করেছিলো। একটি ব্যাপারে সকল রাজনৈতিক দলই (আওয়ামী লীগ ছাড়া) একমত পোষণ করেছিলো এই বলে যে, খালেদ একজন বিশ্বাসঘাতক, ভারতের দালাল এবং সে সকলের ঘৃণিত বাকশাল আর মুজিববাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।

জাসদ আরো একধাপ এগিয়ে যায়। তারা বলে যে, উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সৈন্যদেরকে তাদের স্বার্থের খাতিরে যথেচ্ছা ব্যবহার করছে। নির্যাতিত সাধারণ মানুষ আর সৈন্যদের দুঃখ-কষ্টের প্রতি উপরস্থ কর্মকর্তাদের কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ নেই। এই রকম দিক নির্দেশ করে গণজাগরণের ডাক দিয়ে জাসদ ১২টি দাবী পেশ করে। এগুলোর মধ্যে 'ব্যাটম্যান' প্রথা বাতিল করে পদমর্যাদা আর পোশাক-পরিচ্ছদে অফিসার-জোয়ানে ভেদাভেদ দূরীকরণ, সুবিধাভোগী শ্রেণী থেকে অফিসার নিয়োগ না করে জোয়ানদের মধ্য থেকে অফিসার নিয়োগ; উন্নত বাসাবাড়ী; বেতন বৃদ্ধিকরণ; দুর্নীতি দমন এবং রাজনৈতিক বন্দী মুক্তিদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জাসদের ঐ সকল দাবী সৈনিকদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়।

এই সকল সুচিন্তিত দাবীনামা একজন প্রাক্তন আর্মি অফিসারের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। তিনি আর কেউ নন লেঃ কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) আবু তাহের। তিনি কর্নেল তাহের হিসেবেই

সর্বসাধারণের কাছে সমধিক পরিচিত। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন কমান্ডো হিসেবে আমেরিকায় তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাকে পাকিস্তানে আটকে রাখা হলেও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি ভারতে আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকেই বিপুল বিক্রমে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত কামালপুর নামক একটি ছোট নদী বন্দরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে এক আক্রমণ পরিচালনা করতে গিয়ে তাহের তার একটি পা হারান।

১৯৭২ সালে তাহেরকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল নিয়োগ করা হয়। পরে ৪৪ পদাতিক ব্রিগেডের (কুমিল্লা) কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। সেই সময় কর্নেল জিয়াউদ্দিন আর তাহের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ব্রিটিশ আর্মি পদ্ধতির বদলে 'চাইনিজ' স্টাইলে উৎপাদনমুখী পিপলস আর্মি গঠনের ইচ্ছা পোষণ করলে, তাদেরকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়। তাকে একটি বেসামরিক চাকুরী প্রদান করা হয়। সেটি ছিলো ড্রেজার অর্গানাইজেশন-এর পরিচালকের পদ। কিন্তু জাসদের গোপনে সদস্যপদের মাধ্যমে তিনি সক্রিয়ভাবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলছিলেন। এই যোগসূত্রকে ভিত্তি করে তিনি সেনাবাহিনীতে অফিসার আর জোয়ানদের মধ্যে একটা ভাঙ্গনের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং খালেদ মোশাররফ-এর সময়েই জোয়ানরা তার বিরুদ্ধে এবং অফিসার শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সুযোগ পেয়ে যায়।

৭ই নভেম্বর সকাল বেলায় জোয়ানরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়ে। সময় ক্ষেপণ না করে তারা অস্ত্রাগারে ঢুকে পড়ে। সেখান থেকে তারা স্টেনগান, রাইফেল আর অন্যান্য যা তাদের হাতের কাছে পায়, তাই গোলাবারুদসহ লুট করে যার যার হাতে তুলে নেয়। এর পরই তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই' এবং 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই, সুবেদারের উপরে অফিসার নাই' ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত করে সমস্ত ক্যান্টনমেন্টে ছড়িয়ে পড়ে। স্পষ্টতঃই জাসদের শ্রেণী সংগ্রামের আহবানে সাড়া দিয়ে জোয়ানরা তাদের অফিসার নিধনে বেরিয়ে পড়ে। এইভাবে কর্নেল তাহের জোয়ানদের উস্কিয়ে দিয়ে তার নিজের বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।

এই সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম ধাক্কা লাগে ১০ জন তরুণ আর্মি অফিসারের উপর। ওরা তখন দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারী ব্যারাকের কাছে একটি অফিসার্স মেসে অবস্থান করছিলো। অফিসারদের একজনের 'ব্যাটম্যান' এই সময়ে বারান্দা দিয়ে চিৎকার করতে করতে বলতে থাকে, 'জীবন নিয়ে পালান। সিপাহীরা আপনাদের খুন করতে আসছে।' অফিসারেরা আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই সাদা পোশাকে মেসের পেছন দিকের দেয়াল টপকে চলে আসে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের পেছনে ধানক্ষেতে। তারপর তারা গ্রামের লোকজনের সহযোগিতায় মিরপুর রোডের মধ্য দিয়ে শহরের নিরাপদ স্থানে চলে

যায়। ঐ অফিসারদের একজন ছিলো বেগম জিয়ার ছোট ভাই সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সৈয়দ ইসকান্দার।

চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের সদর দফতর থেকে টেলিফোন করে খালেদ মোশাররফকে সিপাহী বিদ্রোহের খবরটি জানানো হয়। তিনি হয়তো ব্যাপারটি পূর্বেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। সে জন্যেই তিনি তার স্ত্রী আর পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে শহরের ভেতরে একটি গোপন জায়গায় পাঠিয়ে দেন। এদিকে শাফাত জামিলকে সঙ্গে নিয়ে খালেদ রাত সাড়ে এগারোটায় বঙ্গভবনে চলে যান বাকী দুই বাহিনী প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে। সেখানে বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনী প্রধান খালেদের সমমর্যাদায় ডেপুটি চীফ মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবার আশাবাদ ব্যক্ত করে। এবং প্রেসিডেন্টকে চীফ মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর করার প্রস্তাব করে। খালেদ তাদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং তিনি নিজেই সিএমএলএ হবার কথা প্রস্তাব করেন। এক ঘণ্টা ধরে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। এরই মধ্যে বিদ্রোহের খবর শুনে হঠাৎ করে তাদের সভা ভেঙ্গে যায়।

ঐ মুহূর্তেই খালেদ বঙ্গভবন ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শাফাত জামিল এখানে থেকে যাবার ইচ্ছা পোষণ করে। অভ্যুত্থানের নেতা তার ব্যক্তিগত গাড়ীতে কর্নেল হুদা আর লেঃ কর্ণেল হায়দারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তারা মিরপুর রোড ধরে শহর থেকে বাইরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, ফাতিমা নার্সিং হোমের কাছে এসে তাদের গাড়ী বিকল হয়ে পড়ে। খালেদ ক্লিনিক থেকে দশম ইস্ট বেঙ্গল সদর দফতরে ফোন করে জেনে নেন সেখানে যাওয়া তার জন্যে নিরাপদ কি না। সেখান থেকে তাকে নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করা হয়। তিন অফিসার মিলে শেরে বাংলা নগরে যান এবং দশ ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে রাত্রি কাটায়।

পরদিন সকালে নাস্তা খাবার কিছুক্ষণ পরেই বেঙ্গল ল্যান্সার আর দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারীর কয়েকজন জোয়ান এসে দশম ইস্ট বেঙ্গলকে বিদ্রোহে যোগ দিতে আহবান জানায়। সঙ্গে সঙ্গেই গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে। এর মাত্র কয়েক মিনিট পরেই ক্যাপ্টেন আসাদ আর ক্যাপ্টেন জলিল মিলে খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা আর হায়দারকে কমান্ডিং অফিসারের কক্ষে গুলি করে হত্যা করে।

বাংলাদেশের জনমত খালেদ মোশাররফের প্রতি নির্দয় প্রমাণিত হয়। অনেকের মতে, খালেদ ছিলো বিশ্বাসঘাতক। এবং দেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিতে চাইছিলেন। কিন্তু পরে এটা প্রমাণিত হয় যে, খালেদ আসলে বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসার। রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার অভাবে তিনি তার কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি।

১৯৮৪ সালে ঢাকায় প্রকাশিত 'দি রোড টু ফ্রিডম' বইয়ে ফারুক ও রশিদ তাদের

পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে খালেদকে তারা একজন সত্যিকারের দেশ প্রেমিক বীর বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা বলে, 'ষড়যন্ত্রকারীদের সৃষ্ট জাতীয় দুরবস্থা কাটানোর প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে তিনি পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন।' ফারুক ও রশিদের মতে 'আসল ষড়যন্ত্রকারী হচ্ছেন জেনারেল জিয়া। তিনি নভেম্বরের ২ তারিখে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু খালেদ তার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।' মেজরদের মতে, আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদের মা আর ভাইয়ের উপস্থিতিতে যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয় জেনারেল জিয়া তাকে পুঁজি করে ফায়দা আদায়ের সুযোগ নেন। এইভাবে ষড়যন্ত্র আর দুর্ভাগ্য—এই দুইয়ের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে খালেদ মোশাররফের মতো একজন দেশপ্রেমিকের মর্মান্তিক পতন ঘটে বলে মেজর মত প্রকাশ করে।

সারা ঢাকা শহরব্যাপী এই সিপাহী বিপ্লব দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। রাত একটার মধ্যেই সিপাইরা পুরো ক্যান্টনমেন্ট এলাকা দখলে নিয়ে আসে। এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ একের পর এক ফাঁকা গুলি আকাশে ছুঁড়তে থাকে। অন্যেরা উত্তেজিত শ্লোগান দিতে দিতে অফিসারদের খোঁজ করতে থাকে। হাবিলদার সারোয়ারের নেতৃত্বে বেঙ্গল ল্যান্সারের একদল সৈন্য চলে যায় জেনারেল জিয়াউর রমানের বাসভবনে। চারদিন ধরে গৃহে বন্দী জেনারেলকে তারা মুক্ত করে। নৈশ পোশাক পরিহিত অবস্থাতেই জিয়াকে উল্লসিত জোয়ানরা কাঁধে করে নিয়ে যায় দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারীর দফতরে। আকস্মিক ঘটনা পরিবর্তনে জেনারেল তখন বিস্ময়ে বিহ্বল। অজানা, অচেনা অনেক সৈনিকের সঙ্গে তিনি করমর্দন ও আলিঙ্গন করে। এই সকল নাটকীয়তার পরপরই তিনি জেনারেল খলিলকে টেলিফোন করে বলেন ঃ 'আমি মুক্ত। আমি বেশ আছি। আমার জন্যে কিছু ভাববেন না। আপনি দয়া করে খবরটা মার্কিন, ব্রিটিশ এবং ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের জানিয়ে দিন।'

জেনারেল খলিল অন্যান্য কাজে অধিক ব্যস্ত থাকায় খবরটা তিনি তখনই বিদেশী মিশনগুলোকে দিতে পারেননি। সকালবেলা যখন তিনি ঐ মিশনগুলোতে রিং করেন, জেনারেল খলিল জানতে পান যে, জেনারেল জিয়া ইতিমধ্যেই তাদের সঙ্গে কথা বলা শেষ করেছেন।

জেনারেল জিয়া তাঁর উদ্ধারকারীদেরকে বলেন, তারা যেন জেনারেল মীর শওকত আলী, জেনারেল আবদুর রহমান এবং কর্নেল আমিনুল হককে তাঁর কাছে হাজির করে। সৈন্যেরা তাদেরকে নিয়ে এলে, তিনি তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কোলাকুলি করেন। সৈন্যদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে তিনি তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। জিয়া তাদেরকে বলেন, 'আমি আর রক্তপাত চাই না।' তাদের সঙ্গে আলাপের কিছুক্ষণ পরে জিয়া বঙ্গভবনে তখনও অবস্থানরত কর্নেল শাফাত জামিলকে টেলিফোন করে বলেন, 'এখন সবকিছুই ভুলে যাও এবং সৈন্যদেরকে একত্রিত করো।' কিন্তু জামিল এর কিছুই করেনি। স্মৃতিচারণ করে জামিল জানায়, 'আমি সেদিন তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার

করি। আমি তাকে জানিয়ে দেই যে, আমি তাঁর জন্যে কিছুই করছি না। সকালেই আমরা এর একটা সুরাহা করবো।' জিয়া আর একটি কথাও না বলে টেলিফোন ছেড়ে দিলেন। জামিল আরো বলে, 'আমরা ভেবেছিলাম, সৈন্যেরা আমাদের সমর্থন করবে। কিন্তু ওরা তা করলো না। আসলে ওদেরকে আমরা বুঝতে পারিনি। ঐটাই ছিলো আমাদের মারাত্মক ভুল।' এর কিছুক্ষণ পরেই প্রায় দেড়শ' জোয়ান এবং কর্নেল তাহেরের বেসামরিক সমর্থক অভ্যুত্থানের নেতাদের খুঁজে বের করার জন্যে বঙ্গভবনে ঝঞ্ঝার বেগে ঢুকে পড়ে। পালাবার চেষ্টা করলে শাফাত জামিল পা পিছলে পড়ে যায় এবং সে তার একটি পা ভেঙ্গে ফেলে। পরে তাকে তিন মাস হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে। এই দুর্ঘটনার বদৌলতেই কোনক্রমে তার প্রাণরক্ষা পেয়েছিলো।

রাত দেড়টায় জোয়ানরা রেডিও স্টেশন দখল করে নেয়। তারা কর্মরত রাত্রিকালীন কর্মীদের জানায় যে, 'জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে এবং তা চলতে থাকবে।' বিস্মিত কর্মকর্তারা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তারা যখন বুঝতে পারলো যে, সৈন্যেরা এবার তাদের হুমকির কারণ নহে, তখন তারাও ওদের আনন্দ উল্লাসে যোগ দেয়। উল্লসিত কিছু সৈনিক আর বেসামরিক লোক নিয়ে কতকগুলো ট্যাংক ঢাকা শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় চলাচল করতে দেখা যায়। এবার ঐ ট্যাংক দেখে লোকজন ভয়ে না পালিয়ে, ট্যাংকের সৈনিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রাস্তায় নেমে আসে এবং উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে।

তিনদিন ধরে তারা মনে করছিলো যে, খালেদ মোশাররফকে নিয়ে ভারত তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা খর্ব করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এতক্ষণে তাদের সেই দুঃস্বপ্ন কেটে গেলো। জনতা সৈনিকদেরকে দেশের ত্রাণকর্তা বলে অভিনন্দিত করে। সর্বত্রই জোয়ান আর সাধারণ মানুষ খুশিতে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি শুরু করে। রাস্তায় নেমে সারা রাতভর তারা শ্লোগান দিতে থাকে। 'আল্লাহু আকবর, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ ইত্যাদি। অবস্থা দেখে মনে হয়েছিলো, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের গণজাগরণের মতো জনমত আবার জেগে উঠেছে। ঐটা ছিলো সত্যিই একটা স্মরণীয় রাত।

রেডিওতে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে জেনারেল জিয়া ঘোষণা করেন যে, তিনি সাময়িকভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার হাতে নিয়েছেন। দেশের এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর অনুরোধে তিনি এই কাজ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে তিনি এই দায়িত্ব পালন করত চেষ্টা করবেন। জিয়া একতা, কঠোর পরিশ্রম আর উৎসর্গের মানসিকতা সৃষ্টির ডাক দিয়ে দেশটিকে আবার সচল করে তুলতে সকলকে অনুরোধ জানান। গত ৩ তারিখ থেকে। খালেদের অভ্যুত্থানের সময়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া অফিস,

আদালত, বিমান বন্দর, মিল-কারখানা ইত্যাদি পুনরায় খুলে কাজ চালু করতে অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সাহায্য করুন।'

জিয়ার সংক্ষিপ্ত আবেগপূর্ণ এবং সময়োচিত ভাষণ সারাদেশে জাতীয়তাবাদের জোয়ার বইয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এর আগেও একবার তিনি জনমনে আশার সঞ্চার করেছিলেন। এবারও যেন তিনি আর একবার বাংলাদেশকে পুনঃস্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ দিলেন।

৭ই নভেম্বর ভোর ৫টা ৩০ মিনিট। ইতিমধ্যে অনেক সিনিয়র আর্মি অফিসার জেনারেল জিয়ার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিয়েছে। এরই মাঝে চলে আসে কর্নেল (অবঃ) আবু তাহের। জেনারেল তাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং অন্যান্যের মতো তার সঙ্গেও কোলাকুলি করেন। আরও কিছু কথাবার্তার পর তাহের জেনারেল জিয়াকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে যেতে চাইলে, উপস্থিত অন্যান্য অফিসাররা নিরাপত্তার কারণে জেনারেল জিয়াকে রেডিও স্টেশনে যেতে বারণ করে। এতে কর্নেল তাহের রেগে আগুন হয়ে উঠেন। কিন্তু তারাও কম গেলো না। জেনারেল জিয়াকে রেডিও স্টেশনে না পাঠিয়ে, তারা বরং একটি রেকর্ডিং ইউনিটকে জিয়ার বাসায় নিয়ে আসে। এইভাবে ঐ শুক্রবার সকালে জিয়ার রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

ঐদিন দুপুরের পরে কর্নেল তাহের জিয়াকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সেখানে রুম ভর্তি উত্তেজিত সৈন্যদের উপস্থিতিতে তাহের তাদের ১২ দফা দাবী সম্বলিত কাগজটি জিয়ার অনুমোদনের জন্যে সামনে এগিয়ে দেয়। জিয়া অনেকটা বাধ্য হয়েই ঐ দাবীনামায় সই করেন। তাকে আরো একবার রেডিওতে বক্তৃতা করার অনুরোধ জানানো হলো। জিয়া বক্তৃতা করলেন। কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তিনি ঐ ১২ দফা দাবী বেমালুম চেপে যান। তিনি বরং তাকে সমর্থন জানানোর জন্যে জনগণকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, তিনি কোন রাজনৈতিক দল বা গ্রুপের সদস্য নন। এবং আর বিলম্ব না করে, সৈনিকদেরকে তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যেতে আহবান জানান।

এদিকে কর্নেল তাহের আর একবার জিয়াকে দিয়ে তার ১২ দফা দাবী অনুমোদন করিয়ে নিতে চেষ্টা করে। সকাল ১১টায় দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারীর সদর দফতরে জিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করার উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্যে একটি সভা ডাকেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ওসমানী, জেনারেল খলিল, বিমান বাহিনীর প্রধান তোয়াব, নৌবাহিনীর প্রধান এম. এইচ. খান, প্রেসিডেন্টের সচিব মাহবুবুল আলম চাষী এবং কর্নেল তাহের। তাহেরকে এ সভায় ডাকা হয় এ জন্যে যে, সিপাহী বিপ্লবের সময়ে তাদের সমর্থকেরা সবচেয়ে বেশী তৎপর ও সোচ্চার ছিল। সভায় দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হবেন তা নিয়ে প্রথমেই আলোচনা শুরু হয়। জেনারেল ওসমানী আর চাষী, মোশতাককে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্বহাল করার প্রস্তাব করলে, জেনারেল খলিল আর তাহের তার

বিরোধিতা করে। পরে বিচারপতি সায়েমকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনঃস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় সিদ্ধান্ত পুরোপুরি জিয়ার ইচ্ছানুযায়ী গৃহীত হয়নি। দিনের সকালের দিকেই কেবল তিনি সিএমএলএ-এর দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। অভ্যুত্থানের নেতা হিসেবে জিয়া নিজেই সিএমএলএ হিসেবে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জেনারেল খলিল যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, প্রেসিডেন্টের হাতেই সিএমএলএ-এর দায়িত্ব থাকা উচিত। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার উপরে কারো ক্ষমতা থাকা ঠিক হবে না। কর্নেল তাহেরও জেনারেল খলিলের যুক্তিতে একমত হয়। সুতরাং প্রেসিডেন্ট সায়েমকেই সিএমএলএ বানানো হলো। জেনারেল জিয়া, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধানের ন্যায় ডেপুটি চীফ মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর ক্ষমতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। জিয়া তাঁর এই অবমাননা হজম করে নিলেও তিনি জেনারেল খলিলকে কখনো ক্ষমা করেননি।

তারপর আলোচনা হয় দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে। অবশেষে, কর্নেল তাহের সিপাইদের ১২ দফা দাবী অনুমোদনের জন্যে সভায় উত্থাপন করে। কিন্তু সভায় উপস্থিত কেউ এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেনি। পরবর্তী দিনগুলোতে তাহেরও তার প্রতি এই অবমাননা ভুলতে পারেনি। আর সে জন্যেই জাসদ এবং তার বিপ্লবী পিপলস আর্মিকে দিয়ে সে জিয়াকে উৎখাতের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো কয়েকবার।

৭ই নভেম্বর ঢাকার শেরে বাংলা নগরের কাছে খালেদ মোশাররফ ও তার দু'জন সঙ্গীর নিহত হওয়া ছাড়া তেমন কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। অফিসার হত্যা প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় পরের দিন অর্থাৎ ৮ই নভেম্বর। সেদিন কমপক্ষে ১২ জন অফিসারকে খুন করা হয়। এদের মধ্যে ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন, লেঃ মুস্তাফিজুর রহমান, মেজর আজিম, ডেন্টাল সার্জন করিম এবং আর্মির লেডী ডাঃ চেরী উল্লেখযোগ্য।

জেনারেল জিয়া এ হত্যাকাণ্ডের জন্যে জাসদকে দায়ী করে। এই ঘটনার ছয় সপ্তাহ পরে আমার সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে জিয়া বলেন, জাসদ তার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালায়। সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা হয়। দেশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়। কারণ এতে করে সেনাবাহিনীতে প্রয়োজনের তুলনায় অফিসারের সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগে নেমে আসে।

আবদুর রব, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জলিল এবং মোহাম্মদ শাহজাহান জেল থেকে মুক্তি পায় ৭ই নভেম্বর। মুক্তি পেয়েই তারা জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সৈন্যদের একত্রিত করার চেষ্টা চালায়। এই ধরনের প্রচারপত্রে এবং লিফলেটে ক্যান্টনমেণ্ট এলাকা প্লাবিত করে দেয়। সৈনিকদের ১২ দফা দাবী আদায়ের জন্যে কর্নেল তাহেরের 'বিপ্লবী সৈনিক সংঘের ' ছত্রছায়ায় সৈন্যদের একত্রিত হওয়ার আহবান জানানো হয়।

তাদের দাবী পূরণ না হাওয়া পর্যন্ত তাদের অস্ত্র জমা না দেয়ার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়। এইভাবে জেনারেল জিয়ার সঙ্গে বিপ্লবীদের মোকাবেলা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়।

ঢাকা সেনানিবাসের সেনা সদর অবরোধাধীন একটা ক্ষুদ্র দুর্গের রূপ ধারণ করে। জিয়া এবং তাঁর সেনা সদরে কর্মরত লোকজনকে ৭ দিন ধরে ঐ অফিসের ভিতরেই নাওয়া, খাওয়া এবং ঘুমানোর কাজ সেরে নিতে হয়। সুবিধের জন্যে তাঁরা এ কাজ করেননি, করেছিলেন বাধ্য হয়ে।

সেনা সদরের নিরাপত্তার জন্যে জেনারেল জিয়া যশোর ক্যান্টনমেণ্ট থেকে ৭ম, ৯ম, ১১তম ও ১২তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডো দলকে অতি দ্রুতগতিতে ঢাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। ৯ তারিখের মধ্যেই ঐ কমান্ডো দলগুলোকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। তাদেরকে সেনা সদর দফতরের আশেপাশে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। এতে করে জাসদের ক্রমাগত হুমকির মোকাবেলায় আর্মি হেড কোয়ার্টার যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠে। ইতিমধ্যেই জেনারেল জিয়া সেনাবাহিনীর বেতন বৃদ্ধি, বাসস্থান ও পোশাকের প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণসহ অবমাননাকর সৈনিকদের 'ব্যাটম্যান' প্রথা বাতিল করার ঘোষণা প্রদান করেন। এতে সেনাবাহিনীর জোয়ানদের মধ্যে যথেষ্ট স্বস্তি ফিরে আসে এবং বিপ্লবী ভাব কেটে যেতে থাকে। এছাড়া, জেনারেল জিয়া ঐ সময়ে রেডিও এবং টিভিতে ভাষণের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকার জন্যে দেশবাসীর প্রতি আহবান জানিয়ে পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে আনার প্রয়াস পান। তিনি আরও বলেন যে, তিনি নিজে এবং তার সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ আর তাঁর সরকারও নির্দলীয় এবং অরাজনৈতিক। উপরন্তু, গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে তাঁর সরকার নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করবে বলে তিনি দেশবাসীকে আশ্বাস প্রদান করেন।

বাঙ্গালীর অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং দোদুল্যমান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যেই জেনারেল জিয়া ঐ অবস্থায় নিজেকে সঠিক স্থানে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাঙ্গালী জাতি তাদের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিবর্তনে অত্যন্ত তৎপর হলেও প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশীরা 'মধ্যপন্থী'। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক চরমপন্থা তারা পছন্দ করে না। সম্ভবতঃ শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জনগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বুঝে নিতে পেরেছিলেন। সে জন্যেই তিনি তাঁর মৃত্যুর মাত্র তিন দিন আগে 'বাকশাল' পার্টির এক বিরাট সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর কর্মীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'আজকের ভয়ের কারণ হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত বেশী প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। তোমরা তোমাদের সারাজীবন ধরে জীবন বিলিয়ে দিয়ে তাদের জন্যে কাজ করতে পার। কিন্তু যদি একটা ভুল করে ফেলো, তাহলে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে যাবে। এটাই বাংলাদেশের আইন।'

কর্নেল তাহের আর জাসদ বাংলাদেশের মানুষকে তাদের স্বাভাবিক ইচ্ছার বাইরে

ঠেলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। সে কারণেই তারা ব্যর্থ হয়েছিলো। আর্থিক সুবিধে আর হেয় ভাবাপন্ন 'ব্যাটম্যান' প্রথা উঠিয়ে নেয়ার ফলে জোয়ানদের মনে বিপ্লবের পক্ষে সমর্থন দ্রুত লোপ পেয়ে যায়। ক্যান্টনমেন্ট পরিপূর্ণভাবে শান্ত হয়ে পড়ে। ২৩শে নভেম্বরের মধ্যে জেনারেল জিয়া জাসদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি ঐ রাতে রেডিও এবং টেলিভিশনে যখন বলছিলেন, 'আমরা আর কোন বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করবো না। আর কোন রক্তপাতকেও সহ্য করা হবে না, তখনই সশস্ত্র পুলিশ শহরে বেরিয়ে পড়ে নির্দেশিত লোকজনের খোঁজে। প্রথমেই যাদেরকে আটক করা হয় তারা হলো—রব, জলিল, হাসানুল হক ইনু এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট আবু ইউসুফ (তাহেরের বড় ভাই)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় কর্নেল তাহেরকে বন্দী করা হয়। এতে করেই মহান 'সিপাহী বিপ্লবের' কার্যতঃ সমাপ্তি ঘটে।

দুইদিন পরে কর্ণেল তাহেরকে উদ্ধার করার এক নাটকীয় অভিযান চালানো হয়। ভারতীয় হাই কমিশনার, সমর সেনকে হাইজ্যাক করে জিম্মি রেখে তাহেরকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অথচ অভিযান চালনাকারী ছয়জনের মধ্যে চারজনই ঘটনাস্থলে নিহত হয়। এর ফলে জনমত তাহের এবং জাসদের বিপক্ষে চলে যায়। জেনারেল জিয়া সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং প্রায় ১০,০০০ জাসদ কর্মীকে জেলে পাঠিয়ে দেন।

কর্নেল তাহেরকে ১৯৭৬ সালের ২১শে জুন, প্রায় সাত মাস আটক থাকার পর, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিশেষভাবে ঘটিত একটি 'সামরিক আদালতের' সামনে বিচারের জন্যে হাজির করা হয়। তার সঙ্গে আরো ৩৩ জনকে হাজির করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। তাদের মধ্যে ২০ জনেরও বেশী সৈনিকসহ জাসদের ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ ছিলো। কর্নেল তাহের বিপ্লবী গণবাহিনী আর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতৃত্বের কথা বিচারকদের কাছে অস্বীকার করেনি। তার স্বীকারোক্তিতে সে সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালানোর কথাও উল্লেখ করে। ঐ অবস্থায় তাহেরকে যে কোন একটি সাধারণ কোর্টে বিচার করেও দোষী সাব্যস্ত করা যেতো। কিন্তু তাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানোর বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্যেই বিশেষ সামরিক আদালত গঠনের পদক্ষেপ নেয়া হয়।

কর্নেল তাহেরের বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অভিযোগটিই আশ্চর্যজনকভাবে অসম্ভব ব্যাপার ছিলো। অভিযোগটি হচ্ছে—১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর 'বৈধভাবে' গঠিত সরকার উৎখাতের প্রচেষ্টা চালানো। ব্যাপারটি কি আসলে সত্যি? আসল সত্যি তো অন্য জায়গায়! ৭ই নভেম্বর কর্নেল তাহের তার বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে নিয়ে সিপাহী বিপ্লব ঘটিয়ে তখন ক্ষমতার অধিকারী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে হত্যা করে, জেনারেল জিয়াকে বন্দী দশা থেকে মুক্তি করে এবং তাকে ক্ষমতায় বসতে অন্যান্যের সঙ্গে সহযোগিতা প্রদান করে। সুতরাং অভিযোগটি পরিপূর্ণভাবে উল্টো করে সাজাতে হয়েছিলো। তাহেরকে তার

আত্মপক্ষ অবলম্বনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগও দেয়া হয়নি। বিচারের দিনই কেবল তাকে তার অভিযোগগুলো সম্বন্ধে অবহিত করা হয়। বাকী সব কাজই আশ্চর্যজনক ও রহস্যজনক তড়িঘড়ির মধ্যে সমাপন করা হয়। কর্ণেল তাহেরকে ১৭ই জুলাই, ১৯৭৬ সালে ভোরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুর দন্ডাদেশ জারি করা হয়। প্রেসিডেন্টের কাছে তার 'ক্ষমার আবেদন' ২০শে জুলাই নাকচ করা হয় এবং পরদিন অর্থাৎ ২১শে জুলাই ভোরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাকে মহাপ্রয়াণে ঠেলে দেয়া হয়।

তাহেরের মৃত্যু একটি 'হুকুমের হত্যা'। এটি ছিলো বিচার বিভাগীয় পদ্ধতির এক অমার্জনীয় লঙ্ঘন। ঘটনাটি জিয়ার এবং এ কাজে তাঁর সহযোগীদের গায়ে প্রচুর কালিমা লেপে দেয়।

আমি প্রেসিডেন্ট সায়েমের সঙ্গে কয়েকবার চেষ্টা করেও ঐ পরিস্থিতির উপর একটি সাক্ষাতকার নিতে ব্যর্থ হই। জিল্লুর রহমান খান তাঁর বই 'লীডারশীপ ক্রাইসিজ ইন বাংলাদেশ'-এ প্রেসিডেন্ট সায়েমকে বিচারক হয়ে অবিচারকসুলভ আচরণের জন্যে সমালোচনা করেন। এই ঘটনাটি বিচারপতি সায়েমের প্রশংসনীয় ইতিহাসকে ম্লান করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

তাহেরের স্ত্রী, লুৎফা একটি চিঠিতে তার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোর এক মর্মভেদী বর্ণনা দিয়েছিলো। চিঠিটি কিশোরগঞ্জ থেকে ১৮ই আগস্ট, ১৯৭৬ সালে লেখা হয়। চিঠিটি লিফ্‌সুলজের বাংলাদেশ ঃ 'দি আনফিনিশড রেভুল্যশন' গ্রন্থে ছাপা হয়। চিঠিটির মতে ঃ

২০শে জুলাই ১৯৭৬ বিকেলে তাহেরকে জানানো হয় যে, ২১ তারিখ সকালে তার মৃত্যুর দন্ডাদেশ কার্যকরী করা হবে। তিনি তাদের সংবাদ গ্রহণ করেন এবং সংবাদ বাহকদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি তার রাতের ডিনার শেষ করেন, পরে একজন মৌলভীকে আনা হয়। সে এসে তাকে তার পাপের জন্যে ক্ষমা চাইতে বলে। তাহের বলেন, "তোমাদের সমাজের পাপাচার আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। আমি কখনও কোন পাপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। আমি নিষ্পাপ। তুমি এখন যেতে পার। আমি ঘুমবো।" তিনি একেবারে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে গেলেন। রাত তিনটার দিকে তাকে জাগানো হলো। কতক্ষণ সময় বাকী আছে, জিজ্ঞেস করে সে জেনে নিলো। সময়টা জেনে নিয়ে তিনি তার দাঁত মাজলেন। তারপর সেভ্ করে গোসল করলেন। উপস্থিত সকলেই তার সাহায্যে এগিয়ে এলো। সকলকে মানা করে দিয়ে তিনি বললেন, "আমি আমার পবিত্র শরীরে তোমাদের হাত লাগাতে চাই না।" তার গোসলের পর অন্যদেরকে তিনি তার চা তৈরী করতে ও আমাদের প্রেরিত আম কেটে দিতে বললেন। তিনি নিজেই তার কৃত্রিম পাখানি লাগিয়ে প্যান্ট, জুতা ইত্যাদি পরে নিলেন। তিনি একটি চমৎকার শার্ট পরে নিলেন। ঘড়িটা হাতে দিয়ে সুন্দর করে মাথার চুল আঁচড়ে নিলেন।

তারপরে উপস্থিত সকলের সামনে তিনি আম খেলেন, চা পান করলেন এবং সিগারেট টানলেন। তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন "হাসো। তোমরা এমন মনমরা হয়ে পড়েছো কেন? মৃত্যুর চেহারায় আমি হাসি ফুটাতে চেয়েছিলাম। মৃত্যু আমাকে পরাভূত করতে পারে না।" তার কোন ইচ্ছা আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, "আমার মৃত্যুর বদলে, আমি সাধারণ মানুষের শান্তি কামনা করছি।" এরপর তাহের জিজ্ঞাসা করেন, "আরো কি কিছু সময় বাকী আছে?" তারা উত্তর দিলো। "সামান্য বাকী।" তিনি তখন বললেন, "তাহলে আমি তোমাদেরকে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনাবো।" তিনি তখন তার কর্তব্য আর অনুভূতির উপর একটি কবিতা পাঠ করে শুনালেন। তারপর তিনি বললেন, "ঠিক আছে, এবার আমি প্রস্তুত। সামনে চলো। তোমরা তোমাদের কাজ সমাধান করো।" তিনি ফাঁসি কাষ্ঠে আরোহণ করে দড়িটা তার গলায় নিজেই পরে নিলেন এবং তিনি বললেন, "বিদায় দেশবাসী। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।"

আ. স. ম. আবদুর রবকে ঐ আদালতেই দশ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। কিন্তু পরে এক ক্ষমা ঘোষণায় তিনি মুক্তি লাভ করেন। তিনি তাহেরের ফাঁসি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জানান, জেনারেল জিয়ার পক্ষে কর্নেল তাহেরকে বাঁচতে দেয়া সম্ভব ছিলো না। কারণ, তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক জোয়ান আর জুনিয়র অফিসারদের 'প্রতীক স্বরূপ।' তাহের নিজেও তার মৃত্যুকে 'শাহাদাত বরণ' বলে আলিঙ্গন করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তার স্ত্রী আর ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ "এইভাবে যদি জীবনকে উৎসর্গ করা না যায়, তাহলে সাধারণ মানুষের মুক্তি আসবে কিভাবে?" আবু তাহের যা চেয়েছিলেন তা আর হলো কৈ? কিন্তু তাহেরের প্রেতাত্মা, জিয়ার পাঁচ বছরের শাসনামলে বিশটিরও বেশী অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় জিয়াকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে। এবং পরিশেষে যুব অফিসারদের বন্দুকের গুলির বৃষ্টিতে জিয়াকে ধরাশায়ী করে তাহেরের প্রেতাত্মা অনন্তের পথে পাড়ি জমায়।

১১

জিয়া একটি নাম একটি কিংবদন্তী

আমি ক্ষমতা দখল করিনি। আমাকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিলো।
—জেনারেল জিয়াউর রহমান

তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি তাঁর এক হাতে হত্যা এবং অন্য হাতে আহার করতে পারতেন।
—চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন জিয়ার এক সহকর্মী

১৯৭১ সাল। ২৬শে মার্চের ভোরবেলা। রেডিওর কিছু স্ক্রিপ্ট লেখক, শিল্পী, প্রযোজক ও একজন কুশলীর একটি ছোট দল বাংলাদেশের জন্যে কিছু একটা করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মিলিত হয়। এই ধরনের লোকদের জন্যে এটি একটি অভিনব ও সাহসী পদক্ষেপ বৈকি—এর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই শুধু চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেণ্টে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এক রক্তাক্ত হত্যালীলায় এক হাজার নিরস্ত্র করা বাঙ্গালী সৈন্যকে খুন করে। শুধুমাত্র দশজনের এই ক্ষুদ্র দল এই খবরে কিছুটা শঙ্কিত হলেও তারা তাদের উদ্দেশ্যে অটল। প্রথমেই তারা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে রেডিও পাকিস্তানের খবর প্রচার বন্ধ করে দেয়। পরে তারা চট্টগ্রাম শহর থেকে কিছু দূরে কালুরঘাট থেকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। দু'দিন পরে অবশ্য 'বিপ্লবী' শব্দটি পরিহার করে তারা 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' নামে প্রচার চালিয়ে যেতে থাকে।

বেতার কেন্দ্রের সুষ্ঠু প্রচার কার্যের জন্যে এই ক্ষুদ্র দলের একজন নেতা, বেলাল মোহাম্মদ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) রফিকুল ইসলামের কাছে নিরাপত্তা চায়। ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম তখন শহরের মধ্যস্থিত রেলওয়ের পাহাড় থেকে পাকিস্তানীদের সঙ্গে লড়ছেন তিনি কথা দিলেও সম্ভবতঃ তার অন্যত্র ব্যস্ততার জন্যে কথা রাখতে পারেননি। পরদিন বেলাল ও তার বন্ধুরা জানতে পায় যে, চট্টগ্রামের ১৬ মাইল দূরে পাটিয়াতে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা অবস্থান নিয়েছে। ওরা পাকিস্তানী সরবরাহ জাহাজ 'সোয়াত' থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ খালাসের

আদেশের উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। বেলাল মোহাম্মদ জানায়, "আমরা বগুড়ার জনৈক মাহমুদ হোসেনের টয়োটা গাড়ী করে পটিয়া গিয়ে আমরা বেশ কিছু সশস্ত্র সৈন্য দেখতে পাই। তাদের অধিপতির কথা জিজ্ঞেস করলে তারা জানায় যে, তাদের অধিপতির নাম মেজর জিয়া। ঐ সময় পর্যন্ত আমরা তাঁর নামও শুনতে পাইনি। তাকে প্রস্তাব করায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। এবং বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ আমরা তিন ট্রাক সৈন্য নিয়ে কালুরঘাটে ফিরে এলাম। মেজর জিয়া তাঁর জীপে এবং আমরা আমাদের সাদা টয়োটা গাড়ীতে চড়ে এলাম। "বেলাল ও তাঁর বন্ধুরা জিয়ার আত্মবিশ্বাস দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। রাস্তায় বাঙ্গালীদের সঙ্গে দেখা হলেই জিয়া বলছিলেন, আমরা পাকিস্তানী হানাদারদের খতম করতে দু'দিনের বেশী সময় নেবো না। উর্দু ভাষীরাও আমাদের শত্রু। কারণ এরা পাকবাহিনীর সমর্থক। আমরা তাদেরও ধ্বংস করে দেবো।" রেডিও স্টেশনের চারিদিকে সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েনের কায়দা দেখে তারা আরো অভিভূত হয়েছিলো। সুতরাং স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে জড়ো হয়ে তার প্রধান কর্মকর্তার চেয়ারটা সৌজন্যতায় জিয়াকে এগিয়ে দেয়। বেলাল স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'আমি বললাম, মেজর সাহেব, এখানে আমরা সবাই 'মাইনর' কেবল আপনি মেজর।' আমাদের জন্যে আপনি স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার করেন না কেন? আমি ঠাট্টাচ্ছলে কথাগুলো বলেছিলাম। কিন্তু তিনি সেটা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন। তিনি নিজ পকেট থেকে কলমটা বের করে তাঁর ভাষণের খসড়া তৈরী করে ফেললেন। 'আমি মেজর জিয়াউর রহমান, এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।' এইভাবে ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চের ঘোষণার মাধ্যমে জিয়া ইতিহাসে তাঁর স্থান করে নিলেন।

জিয়া এইভাবে অনেকগুলো সৌভাগ্যের সমাহার আর সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মাত্র সাত বছরের মধ্যে একজন নাম না জানা মেজর থেকে লেঃ জেনারেল ও বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হবার গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেখা গেছে, জিয়া কখনো কোন ব্যাপারে অতি উৎসাহী হয়ে নাক গলায়নি। সব সময়ই তিনি কারো না কারো উপর ভর দিয়ে ক্ষমতার দিকে পা বাড়িয়েছেন।

শেখ মুজিবকে হত্যার পাঁচ মাস আগে মেজর ফারুক যখন তাকে উৎখাতের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তখন জিয়া তাকে বিরত করার কোন চেষ্টা করেননি। শেখ মুজিবের হত্যার পর, জেনারেল জিয়া দ্বিধাহীনচিত্তে সেনাবাহিনী প্রধানের পদটি গ্রহণ করেন। কিন্তু এরপরে, খালেদ মোশাররফ আর শাফাত জামিল যখন, প্রেসিডেন্ট মোশতাক এবং মেজরদের সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করে এবং তা চূড়ান্ত রূপ দেয়, তখনো তিনি আর একবার নীরব ভূমিকা পালন করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁর জীবন রক্ষা এবং পরে সেনাবাহিনী প্রধানের পদ প্রাপ্তির

জন্যে তিনি জোয়ানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু তারপরেই আবার তিনি তাদের নেতা, লেঃ কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) তাহেরকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়েছিলেন।

১৯৭৬-এর নভেম্বর প্রেসিডেন্ট সায়েমকে দিয়ে তিনি জাতির প্রতি সরকারের পবিত্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ব্যবস্থা করেন। তারপর সায়েমকে অনানুষ্ঠানিকভাবে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই ক্ষমতা দখল করেন।

১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ তাঁর ঘোষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা, জিয়াকে খ্যাতির শীর্ষে উঠিয়ে দেয়, যদিও আসলে এর ত্রিশ ঘণ্টা আগেই ঐ একই বেতারকেন্দ্র থেকে অন্য একজন দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

বেলাল মোহাম্মদ জানান যে, মোহাম্মদ আবদুল হান্নান নামে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী, ২৬শে মার্চ দুপুরবেলা কালুরঘাট রেডিও স্টেশনে দৌড়ে আসেন। তিনি দাবী করেন যে, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট থেকে একটি 'সংবাদ' নিয়ে এসেছেন। এই সংবাদটি রেডিওতে প্রচার করতে হবে। তিনি স্টেশনের সবাইকে চাপ দিতে থাকেন। কর্তৃপক্ষ প্রথমে এটাকে একটা বানোয়াট বার্তা মনে করলেও পরে অনেক পীড়াপীড়ির কারণে বেলা আড়াইটায় বার্তাটি সম্প্রচার করতে দেয়া হয়। বার্তাটির ভাষায়, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পীলখানা (তৎকালীন ইপিআর সদর দফতর) আকস্মিকভাবে আক্রমণ করেছে। সেখানে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেছে। এই অবস্থায় আমি শেখ মুজিবুর রহমান, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। জয় বাংলা। খোদা হাফেজ।"

তার পরদিন জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা ছিলো একটি সাহসিকতাপূর্ণ ও সুচিন্তিত প্রচেষ্টার ফসল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হান্নানের প্রচারিত ঘোষণা চট্টগ্রাম এলাকার কিছু লোক ছাড়া আর কেউ শুনতে পায়নি। চট্টগ্রাম বেতারের ট্রান্সমিটার ছিলো মাত্র ১০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন এবং তার শব্দ পৌঁছানোর এলাকা ছিলো মাত্র ৬০ মাইল। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আক্রমণের প্রথম দিনে সবাই শক্তিশালী ঢাকা রেডিও স্টেশন কর্তৃক প্রচারিত সামরিক আইনের ঘোষণা শুনতে ব্যস্ত ছিলো। তাছাড়া, বেলাল এবং তার দল কালুরঘাট যাওয়ার আগে রেডিওর সুইচ বন্ধ করে যায়। যার ফলে জনগণ চট্টগ্রাম বেতারের কিছুই শুনতে পায়নি।

জিয়ার ভাগ্য ছিলো সত্যিই সুপ্রসন্ন। পরের দিন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় জিয়ার ঘোষণা দেয়ার সময় চট্টগ্রামবাসীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খোঁজ পেয়ে যায়। তাছাড়া, আরো সৌভাগ্যের ব্যাপার এই যে, ভারত কর্তৃক সারা দুনিয়ায় এই ঘোষণা সম্প্রচারিত হয়ে যায়। এইভাবে অপরিচিত মেজর জিয়া সর্বত্র এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অথচ ২৬শে মার্চ পর্যন্ত এটিকে একটি রাজনৈতিক এবং বেসামরিক ব্যাপার বিবেচনায় 'জিয়া' বাংলাদেশ-আন্দোলনে নিজেকে জড়াতে চাননি।

মেজর রফিকুল ইসলাম সেনাবাহিনীতে জিয়ার সমসাময়িক এবং চট্টগ্রামে দু'জন একসঙ্গেই কাজ করছিলেন। মেজর রফিক পরে আমাকে জানান যে, সে সময় খালেদ মোশাররফ ঢাকায় কোন একটি ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর হিসেবে কর্মরত। দেশের এই পরিস্থিতিতে খালেদ তার চট্টগ্রামস্থ সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে চলে আসেন অন্যান্যের সঙ্গে আলাপ শেষে তিনি মেজর জিয়ার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ করেন এবং তাকে চট্টগ্রামে অবস্থানরত পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে অনুরোধ জানান। ঘটনাটি ২৪ তারিখে ঘটে। খালেদের ভাষায়, "আমাদের উপর আঘাত হানার আগেই "আমাদেরকে তাদের উপর আঘাত হানতে হবে—তা' না হলে ওরা আমাদের সবাইকে জবাই করে ফেলবে।" জিয়া খালেদকে নিরস্ত করতে গিয়ে মন্তব্য করেন, "ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ওরা অতদূর যাবে না।"

মেজর রফিক আরো জানান যে, ২৬ তারিখে জিয়া চট্টগ্রাম বন্দরে 'এম ভি সোয়াত' থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ খালাসের কাজ তদারকি করার জন্যে রওয়ানা হয়ে যান। পথিমধ্যে তিনি শুনতে পান যে, পাকিস্তানী হানাদারেরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট কেন্দ্রে আক্রমণ চালিয়ে বহু নিরস্ত্র বাঙ্গালী সৈন্য হত্যা করেছে। এই খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গেই জিয়া ফিরে যেয়ে এবং বিদ্রোহে যোগ দেন। তারপরই তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তিনি পটিয়ায় চলে যান, যেখানে বেলাল তাকে আবিষ্কার করেন।

স্পষ্টতঃই দেখা গেছে যে, জিয়া সবসময়ই কাজে-কর্মে তড়িঘড়ি এড়িয়ে চলতেন। কোন ব্যাপারেই হঠাৎ করে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন না। সব কাজই তিনি ধৈর্য ও খুব সতর্কতার সাথে করতেন। তিনি কোন ঝুঁকি নিতে চাইতেন না। এবং কাউকে বিশ্বাসও করতেন না। তিনি আবেগকে দারুণভাবে সামলিয়ে নিতে পারতেন। এমনকি রাতের বেলায়ও তিনি কালো 'সানগ্লাস' পরতেন যাতে করে কেউ তাঁর চোখ স্টাডি করে তাঁর মনের গতি অনুধাবন করতে না পারে। জিয়া ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে রাষ্ট্রীয় সর্বময় ক্ষমতা তাঁর হাতে তুলে নিয়েছিলেন এবং যতদূর সম্ভব কাজ একাই করতে চেষ্টা করতেন। পাকিস্তানী মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে অনেকদিন কর্মরত থাকার ফলেই সম্ভবতঃ তিনি এইসব গুণাবলী অর্জন করে নিয়েছিলেন।

কমিশন প্রাপ্তির চার বছর পরই বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে জিয়াকে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে নিয়োগ করা হয়। সেখানে তিনি ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। ১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করার সময় তার এই পূর্ব অভিজ্ঞতা যথেষ্ট কাজে লাগে।

অন্যান্য সবকিছু বাদ দিলেও, জিয়া ছিলেন একজন পেশাদার সৈনিক। কেউ কেউ তাকে আবার 'সৈনিকদের সৈনিক বলেও ডাকতেন'। জিয়ার জন্ম ১৯৩৬ সালে এবং তিনি ১৯৫৩ সালে কাকুলে অবস্থিত পাকিস্তানের মিলিটারী একাডেমীতে যোগদান করেন।

কিন্তু জিয়া সামরিক বিদ্যার পড়াশোনায় তেমন মেধার পরিচয় দিতে পারেননি। তবে, সম্ভবতঃ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর জীবন বৃত্তান্তে রেকর্ড করা আছে, "১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তিনি খেমকারান সেক্টরে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে তিনি ফার্স্ট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা কোম্পানীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।" ১৯৬৬ সালে জিয়াকে পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ঐ সময়ে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ফারুক আর রশিদও ছিলো। জিয়া কোয়েটার স্টাফ কলেজে যোগ দেন এবং রাইনে অবস্থানরত বৃটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে তিন মাস নিয়োজিত থাকেন। বিদেশে জিয়ার এটাই ছিলো একমাত্র নিয়োগ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে জিয়া একজন কিংবদন্তীর নায়ক। দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার গৌরব তাকে আরো বেশী মহিমান্বিত করে তুলেছিলো। জিয়া অত্যন্ত সফলতার সাথে তাঁর 'জেড ফোর্স' পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরিচালিত করেন। সিলেটের রাউমারী থেকে তাঁর 'জেড ফোর্স' অভিযান পরিচালনা করতো। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে স্বাধীনতার পর তাঁকে "বীর উত্তম" খেতাবে ভূষিত করা হয়। সাহসিকতা, ব্যক্তিগত সততা এবং ভদ্র ব্যবহারের জন্যে তিনি সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। স্বাধীনতার পর অন্যান্যদের মধ্য থেকে তাকে আলাদা করে বিবেচনা করা হয়। প্রমোশন আসতে থাকে দ্রুতগতিতে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীতে তাকে কর্ণেল পদে উন্নীত করা হয়। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি ব্রিগেডিয়ার এবং একই বছর ১০ই অক্টোবর তাঁকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২০শে আগস্ট তিনি সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান নিয়োজিত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৯ বছর।

সেনাবাহিনীতে এতে চমৎকার ক্যারিয়ারের সুবাদে সৈনিকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই জনপ্রিয় জেনারেলই তাঁর সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনামলে ২০টি বিদ্রোহ আর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সম্মুখীন হন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, সিপাহী বিপ্লবের সময়ে যে সেন্যরা জিয়াকে কাঁধে চড়িয়ে নাচতে নাচতে ক্ষমতায় বসায়, সেই সৈন্যেরাই বারংবার তাকে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। অন্যদিকে, জিয়াও সাংঘতিক হিংস্র হয়ে উঠেন। ১৯৭৭ সালের ২রা অক্টোবর জিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভ্যুত্থান ব্যর্থায় পর্যবসিত হলে, জেনারেল জিয়া যেভাবে তাঁর নিজের সৈন্যদের উপর ব্যাপকহারে বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চালান। এই উপমহাদেশের ইতিহাসে কোন জেনারেল এমনটি করেছেন বলে নজির নেই।

প্রথমদিকেই আমি এর প্রমাণ পেলেও এই শান্ত, সুশীল আর চমৎকার ব্যবহারের লোকটি অতটা নৃশংস হতে পারেন, আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। ঘটনাক্রমে, জিয়াকে খুব কাছে থেকে জানতো এমন একজন লোকের সঙ্গে আমার আলাপচারিতা হয়।

"জিয়া কেমন লোক ছিলেন?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করি।

লোকটি তার পরিচয় গোপন রেখেছিলো। সে অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তারপর অনেকটা ফিসফিস করে আমাকে বললো, "জিয়া এমন এক মানুষ ছিলেন, যিনি এক হাতে হত্যা আর অন্য হাতে আহার করতে পারতেন।"

১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে বাংলাদেশের সপ্তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐ সময়ের প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম এক ঘোষণায় তাঁর দায়িত্বভার জিয়ার হাতে তুলে দেন। ঘোষণার ভাষায় ঃ

"আমি, আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। সুতরাং আমি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করছি। এবং তাঁর কাছে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার অর্পণ করছি।"

এই ঘোষণার মর্মার্থ অনুযায়ী বিচারপতি সায়েম তাঁর শারীরিক অসুস্থতার, অক্ষমতার জন্যে জিয়াকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ ঘোষণা প্রদান করেননি। জেনারেল জিয়া, বিচারপতিকে ঐ ঘোষণা দেয়ার জন্যে বল প্রয়োগে বাধ্য করেছিলেন।

এর আগের বছর ২৮শে নভেম্বর জিয়া সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রেসিডেন্ট সায়েমকে এক সঙ্গে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে রাখা তাঁর জন্যে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। দু'টি পদেই প্রেসিডেন্ট সায়েম তাঁর ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করে আসছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ করে সায়েমের মতের বিরুদ্ধে পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন স্থগিত করতে বাধ্য করেন। এর পেছনে প্রকৃত কারণ ছিলো, জিয়া ঐ সময়ে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়ার পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি নির্বাচন দিয়ে তাঁর ঐ পরিকল্পনার মূলে কুঠারাঘাত করতে চাইলেন না। অথচ বিচারপতি সায়েম প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন দিতে চাইছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই প্রেসিডেন্ট সায়েম জিয়ার প্রতি খুশী থাকতে পারেননি। প্রেসিডেন্টের একজন নিজস্ব লোকের মাধ্যমেই জিয়ার কাছে খবর চলে যায় যে, দেশে গণতন্ত্র কায়েমের জন্যে প্রেসিডেন্ট, জিয়াকে সরিয়ে অন্য একজন অধিকতর কম উচ্চাভিলাষী লোককে নিয়ে আসতে পারেন। ব্যাপারটিতে আদৌ কোন রকম সত্যতা ছিল কি-না, আমি নিশ্চিত করতে পারিনি। তবে, তা চির সন্দেহভাজন জিয়ার মনে তড়িৎ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তিনি সায়েমকেই পাল্টা সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন।

উপরন্তু যতজন সামরিক কর্তাব্যক্তিকে সমবেত করতে পেরেছিলেন তাদের সবাইকে নিয়ে জেনারেল জিয়া বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের কাছে চলে আসেন এবং প্রধান সামরিক

আইন প্রশাসকের পদটি তাঁর নিকট ছেড়ে দিতে বলেন। দিনটি ছিলো রোববার। তখন কেবলই সন্ধ্যে ৭টা বেজেছে। জিয়ার সঙ্গে যারা এলেন তারা হচ্ছেন—ডেপুটি চীফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল এরশাদ, চীফ অব স্টাফ জেনারেল আবুল মঞ্জুর, নবম ডিভিশনের কমান্ডার জেনারেল মীর শওকত আলী এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর দুই প্রধান, প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী বিচারপতি আবদুস সাত্তারও সেই সময় উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় উপস্থিত একজন আমাকে পরে জানায় ঃ সায়েম জেনারেল জিয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদটি জিয়াকে না দেয়ার জন্যে তিনি চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি বলেন, "আমি দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিয়েছি। দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার কাজ আমাকে শেষ করতে দিতে হবে।" জিয়াও তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তিনি অন্যান্যদেরকেও এ ব্যাপারে কাজে লাগাচ্ছিলেন। বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট খাবার এবং বিশ্রাম না নিয়েই মধ্যরাতের পর পর্যন্ত এ নিয়ে যুক্তি, পাল্টা-যুক্তি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অথচ সায়েম ঐ সভায় উপস্থিত কারো সমর্থন পেলেন না। অবশেষে বিচারপতি সাত্তার সায়েমকে বলেন, "ভাই, জিয়া যখন সিএমএলএ-এর পদটা নিতে চাইছে, পদটি আপনি তাকে দিয়ে দিন।" রাত ১টার দিকে সায়েম একটু নরম হলেন। এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ হস্তান্তরের কাগজে স্বাক্ষর করেন। এরপর সায়েমকে সরিয়ে বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট পদ দখল করা জিয়ার জন্যে শুধু সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

ঐ কাগজে সই করার আগে প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রতি আরো একটি বিরাট প্রস্তাব রাখেন। প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে উন্নীত করার প্রস্তাব করেন। আমাকে জানানো হয় যে, জিয়া ঐ প্রস্তাবে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরই তাঁর জটিল, ব্যক্তিত্বের মাঝে গোয়েন্দা মানুষটি মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে। একটু চিন্তা করে তিনি লেঃ জেনারেল হবার প্রস্তাবটি সবিনয়ে ফিরিয়ে দেন। তাঁর ধারণা, মানুষ যেন তাকে বলতে না পারে যে, কেবল লেঃ জেনারেল হবার জন্যেই তিনি সিএমএলএ হতে চাইছিলেন। আসলে জিয়ার দরকার ছিলো কেবল ক্ষমতা আর প্রকৃত ক্ষমতা। গালভরা সুন্দর উপাধিতে তার মন ভরেনি।

সিপাহী বিদ্রোহ চলাকালে জোয়ানরা তাকে এনে সেনাবাহিনী প্রধানের পদে পুনর্বহাল করলে, জিয়া সম্ভবতঃ এটাকে দেশ শাসনের জন্যে তাঁর প্রতি এক রকম দৈব ইঙ্গিত বলে গ্রহণ করলেন। কয়েক বছর পরে জিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, "আমি ক্ষমতা দখল করিনি। আমাকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিলো।" সুযোগ আর ক্ষমতার সদ্ব্যবহার সকলেই করতে চেষ্টা করে। এবং কোন জেনারেলই হয়তো দেশের সর্বোচ্চ পদের সুযোগটি হেলায় ছেড়ে দিতো না। কিন্তু জিয়ার উচ্চাভিলাষের সীমা ছিলো না। তিনি প্রেসিডেন্ট হবার পর আজীবন প্রেসিডেন্ট থাকার বাসনা মনে পোষণ করতে থাকেন।

১৯৭৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছিলো যাতে জিয়া সামরিক প্রেসিডেন্ট নন, বেসামরিক পোশাকে সামরিক প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। একজন সাংবাদিক তাকে 'সাফারী স্যুট পরিহিত জেনারেল' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে জিয়া জনগণের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে থাকেন। সন্দেহ নেই, তাঁর ক্ষমতার প্রধান উৎস ছিলো সামরিক বাহিনী। ঐ সময়ে তিনি একাধারে সেনাবাহিনীর প্রধান ও প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর সর্বাধিনায়ক বহাল থেকে সেনাবাহিনীর উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেছিলেন। ১৯৭৭ সালের এক ঘোষণায় জিয়া সংবিধানের কয়েকটি সংশোধন করেন। এর মধ্যে সংবিধানের প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' সংযোজন করে জনগণকে এমন একটি ধারণা দেন যে, দেশটির সংবিধান ও পরবর্তী কার্যক্রম ইসলামী রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠে। যদিও প্রকৃতপক্ষে দেশের 'ধর্মনিরপেক্ষ' চরিত্রটির কোন পরিবর্তনই করা হয়নি। আর একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধনী হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণকে এখন থেকে 'বাঙ্গালী' না বলে 'বাংলাদেশী' বলা হবে। শেখ মুজিবের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রভাব ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও পড়তে পারে বলে দিল্লীর কর্তাব্যক্তিরা মনে করতেন। এদিক থেকে জিয়ার 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' দিল্লীতে সাদরে গৃহীত হয়।

বিচারপতি সায়েমকে সরিয়ে জেনারেল জিয়া প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার নেয়ার পরের দিনই এই পরিবর্তনগুলোর ব্যাপারে পদক্ষেপ নেন। এক মাস পরে অনুষ্ঠিত রেফারেন্ডামে তাঁর পক্ষে রায় পেতে ঐ পদক্ষেপগুলো কাজে আসে। এমনকি, ১৯৭৮ সালের জুনে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভের ব্যাপারেও এই পদক্ষেপগুলো যথেষ্ট গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই সকল অনুকূল পরিস্থিতির পরেও জেনারেল জিয়া তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল ওসমানীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপির আশ্রয় নিতে একটুও দ্বিধাবোধ করেননি। জিয়া বিরোধী দলগুলোকে মাত্র ৪০ দিনের নোটিশে নির্বাচনে আহবান করেন এবং মাত্র ২৩ দিন তাদের প্রচারণার সুযোগ দেন। অন্যদিকে তিনি নিজের নির্বাচনী প্রচারণার জন্যে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে পুরোপুরি কাজে লাগান। সরকারী মালিকানাধীন টিভি, রেডিও এবং সংবাদপত্রকে একচ্ছত্রভাবে কাজে লাগানো হয়। সর্বোপরি, জেনারেল জিয়া একাধারে প্রেসিডেন্ট, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান ছিলেন। আর কিছু ঘটুক বা নাই ঘটুক, এই সকল ক্ষমতার বলে এটা নিশ্চিত হয়েছিলো যে, পুলিশ এবং সরকারী কর্মচারীরা তাঁর পক্ষে কাজ করবে। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল খলিলুর রহমানের মতে, একজন সিনিয়র জেনারেল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে নির্দেশ প্রদান করেন যে, "যে কোন উপায়ে হোক" নির্বাচনে জেনারেল জিয়ার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে। তবে শতকরা ৭০ ভাগের বেশী ভোট যেন জিয়ার পক্ষে না দেখানো হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

জিয়া নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করলেন। কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহ থেকে যায় যে, জিয়া ১৯৭৮-এর ঐ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে আদৌ যোগ্য ছিলেন কিনা। এই সন্দেহের পক্ষে প্রমাণসমূহ এতো শক্তিশালী যে, তাতে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে আসলেই যোগ্য ছিলেন না বলে প্রমাণিত হয়।

জিয়া কর্তৃক ঘোষিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে পারবেন না ঃ

(১) যার বয়স ৩৫ বৎসরের কম।

(২) যিনি এমপি নির্বাচনের জন্যে অযোগ্য।

(৩) যিনি সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এমনকি, সংবিধান অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হবেন না, যিনি সরকারী চাকুরী করেন এবং এতে করে বেতন গ্রহণ করে থাকেন।

জিয়া সেনাবাহিনীর চাকুরী থেকে ইস্তফা দেননি এবং তিনি তখন সেনাবাহিনী প্রধানের সক্রিয় দায়িত্বে নিয়োজিত। যা' সংবিধান অনুযায়ী তাঁর ঐ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবার অযোগ্যতাকে প্রমাণ করে। এই পরিস্থিতিকে এড়ানোর জন্যে ১৯৭৮ সালের ২৯শে এপ্রিল তিনি দ্বিতীয় ঘোষণা (ত্রয়োদশ সংশোধনী), ১৯৭৮, জারি করেন।

ঐ অধ্যাদেশে বলা হয় ঃ

(১) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে বহাল থাকবেন এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে কিংবা তাদের স্টাফ প্রধানদের মাধ্যমে তাদের পরিদর্শন, নির্দেশ প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ব্যবহার করবেন।

(২) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক অত্র প্রজাতন্ত্রের কোন চাকুরীতে নিযুক্ত এবং বেতন ভাতাদি ভোগ করছেন বলে বিবেচিত হবেন না।

এই দু'ট ধারা সংযোজন করে জিয়া সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা বহাল রাখলেন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অধ্যাদেশে নিজেকে সকল ত্রুটির ঊর্ধ্বে রাখতে প্রয়াস পেলেন। কিন্তু ১৯৭৮-এর ২রা মে, মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখে এবং নির্বাচনের দিনেও জিয়া সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধানের পদে বহাল ছিলেন। তার অর্থ এই যে, তিনি তখনও সেনাবাহিনীর সক্রিয় তালিকায় এবং সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত বেতনভোগী একজন কর্মচারী। তিনি ঐ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেননি। সুতরাং ঐ রকম সক্রিয়ভাবে সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত থেকে সংবিধানের ধারা মোতাবেক তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন না।

এ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, জেনারেল জিয়া, সেই সময়ের ডেপুটি চীফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল এরশাদকে, ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে চীফ অব আর্মি স্টাফ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করলেও তিনি ১৯৭৮-এর ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত চীফ অব আর্মি স্টাফের

দায়িত্বভার নিজ হাতে রেখে দিয়েছিলেন। ১৯৭৮-এর ১লা ডিসেম্বর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের উপস্থিতিতে জেনারেল এরশাদকে তাঁর অফিসে ডেকে এনে হাতে লিখে ১৯৭৮-এর এপ্রিল মাসের তারিখ দিয়ে তাকে চীফ অব আর্মি স্টাফ নিয়োগের পত্র জারি করেন। আমাকে জানানো হয়েছিলো যে, কিছু সাংবিধানিক সমস্যা কাটানোর জন্যেই এই রকম 'ব্যাক-ডেট' দিয়ে কাজটা সমাধা করা হয়।

জিয়া তাঁর নিজের প্রমোশনের ব্যাপারেও কয়েকবার সেই আদেশ সংশোধন করে সর্বশেষ ৯/৪/১৯৭৯ ইং তারিখে ৭/৮/ডি-১/১৭৫-২৭০ নম্বর বিশিষ্ট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজেকে ২৯/৪/১৯৭৯ ইং থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে উন্নীত করেন। এবং ৯/৪/১৯৭৯ ইং তারিখে আর একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২৯/৪/১৯৭৮ ইং থেকে লেঃ জেনারেল হিসেবে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই দলিল থেকেও এটা প্রমাণিত হয় যে, ১৯৭৮-এর জুনে তাঁর নির্বাচন ছিল অবৈধ এবং অসাংবিধানিক।

এই বৈধতা নিয়ে নির্বাচনের পূর্বে সেনাবাহিনীর একটা অংশ প্রশ্ন তুলে যে, জেনারেল জিয়া একই সঙ্গে সিইনসি, সিএমএলএ এবং সিএএস হিসেবে বহাল থেকে নির্বাচনে অংশ নিলে, তা সংবিধানের পরিপন্থীকে এবং তা আইন ও গণতন্ত্রের মূলনীতির বরখেলাপ বলে বিবেচিত হবে।

জিয়া ঐ সকল অভিযোগ অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলেন। তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "ওসমানী এমপি হয়েও কমান্ডার ইন চীফ পদে বহাল ছিলেন। আমি তো সিইনসি হয়ে তিন বাহিনী প্রধানের মাধ্যমে আমার ক্ষমতার ব্যবহার করছি মাত্র। আমার পদত্যাগ দেশের জন্যে খুব ভাল হবে না।"

মার্শাল ল রেগুলেশন বলবৎ থাকায় সেদিন কোন কোর্টই তাঁর এই বৈধতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তুলতে পারেনি। শুধু এই ক্ষেত্রেই জিয়া আইনকে তুচ্ছ ভেবে দূরে সরিয়ে রাখেননি। তিনি একের পর এক এই ধরনের কাজ করে যেতে থাকেন এবং মার্শাল ল কিংবা রাবার স্ট্যাম্প রূপী পার্লামেন্টকে তাঁর এ ধরনের প্রয়োজনে কাজে লাগান।

এই পদ্ধতিতে জেনারেল জিয়া সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে সংবিধানে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করেন। এবং এ কাজে তিনি মার্শাল ল-কে অত্যন্ত সুন্দরভাবে যথেচ্ছা ব্যবহার করেন।

তাঁর পরিবর্তিত নূতন পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ জেনারেল জিয়া প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর চাকুরী তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিলো না। প্রেসিডেন্টকে পার্লামেন্ট-এর বহির্ভূত এক-পঞ্চমাংশ মন্ত্রীদের নিয়োগ করার ক্ষমতা দেয়া ছিলো। যে-কোন বিলে তিনি তাঁর অসম্মতি দিতে পারতেন। পার্লামেন্টকে প্রেসিডেন্টের মতের বাইরে যাবার কোন উপায় ছিলো না। কেবল জাতীয় রেফারেন্ডাম-এর মাধ্যমেই

পার্লামেণ্ট প্রেসিডেণ্টকে ডিঙ্গাতে পারতো। জাতীয় স্বার্থে প্রেসিডেণ্ট পার্লামেণ্টকে না জানিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারতেন। তিনি তাঁর ইচ্ছেমত জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডাকতে, স্থগিত রাখতে এবং বাতিল করতে পারতেন। জিয়া কেবল তাঁর জন্যে আজীবন প্রেসিডেণ্ট থাকার ব্যবস্থাকরণ বাকী রেখেছিলেন।

জেনারেল ওসমানী অভিযোগের সুরে বলেছিলেন, "ক্ষমতার পরিপূর্ণ কেন্দ্রীয়করণের ফলে প্রেসিডেণ্ট জিয়া স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হয়েছিলেন। খন্দকার মোশতাক বলেছিলেন, "জিয়াউর রহমানের গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিলো। জনগণকে স্বপথে পরিচালিত করার জন্যে তিনি সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিলেন।"

বাংলাদেশের মুকুটহীন রাজা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার পর জেনারেল জিয়া দেশ ও সমাজ উন্নয়নের সর্বাত্মক মনোনিবেশ করেন। প্রথমেই তিনি তাঁর ক্ষমতার উৎস সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলেন। সেনাবাহিনীতে তিনি নূতন ডিভিশন গঠন করেন। প্যারা মিলিটারী যেমন—পুলিশ, বিডিআর, আনসার ইত্যাদিকে শক্তিশালী করার জন্যে তিনি এগুলোর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণে উন্নীত করেন।

শেখ মুজিবের আমলে যেখানে প্রতিরক্ষা বাজেট ছিলো মোট রাজস্ব বাজেটের শতকরা ১৩ ভাগ, সেখানে জিয়ার আমলে তা বেড়ে প্রায় তিনগুণে উন্নীত হয়। জিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন ছিলো গ্রাম উন্নয়নে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং সবাইকে বিশেষ করে যুব সমাজকে উন্নয়নে শরীক করা। তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন ঃ আমাদের সকলের জন্যে একটি মাত্র শ্লোগান ঃ "কাজ, কাজ, আর কাজ"।

উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং যুক্তিযুক্ত শ্লোগানের মাধ্যমে জিয়া দেশপ্রেমিক জনগণের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। খাল খনন, রাস্তা তৈরী, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে নিজে নেমে পড়েন এবং অন্যদেরকেও জড়িত করেন। এ সব কর্মসূচীর কিছু কাজ হয় স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে আর কিছু কাজ হয় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ভিত্তিতে। কিছু কাজ আবার নগদ অর্থের বিনিময়েও সম্পাদন করা হয়। প্রেসিডেণ্ট নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ সকল কাজে অংশগ্রহণ করেন। কয়েকজন মন্ত্রী বলেন, এ সকল কাজে তাঁর সঙ্গী হবার জন্যে তাদেরকে ভোর চারটায় ডেকে পাঠানো হতো।

এই ধরনের প্রশংসনীয় উদ্যোগ এক নাটকীয় সুফল বয়ে আনে। ঢাকা শহর আগের তুলনায় অনেক বেশী সুন্দর হয়ে উঠে। বিদেশী সৌখিন জিনিসে বাজার ভরে উঠে। সর্বত্র বেশ একটা উন্নয়নের ছোঁয়া লেগে যায়। কিন্তু সে সময় দুর্নীতির মাত্রা দারুণভাবে বেড়ে যায়। জিয়া নিজেকে আজীবন প্রেসিডেণ্ট হিসেবে দেখার মানসে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক করে তুলেন।

সাভারে অবস্থিত একটি সোশ্যাল ইনস্টিটিউট-এর বরেণ্য প্রধান, ডঃ জাফরুল্লাহ

চৌধুরী আমাকে জানায়, এক সময়ে আমরা সকলেই তাকে বিশ্বাস করতাম। আমরা সকলেই বিশ্বাস করতাম যে, জেনারেল জিয়া সত্যিই দেশটিকে একটি প্রগতিশীল, সাম্যবাদী এবং জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান। কিন্তু শীঘ্রই আমরা বুঝতে পারলাম যে, তিনি কেবল বড় বড় বুলি আওড়িয়ে চলছেন। তিনি ঐ সকল কথাকে জনগণের প্রতি তাঁর শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করতেন। তিনি কেবলই তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কাজ করে যাচ্ছিলেন।

জেনারেল জিয়া ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সৎ এবং অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করার ব্যাপারে সকল দুর্নীতির উর্ধ্বে ছিলেন। সরকারের অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের লোকদের মতো ঢাকায় তাঁর কোন বাড়ী ছিলো না। প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি একবার বেতন থেকে অগ্রিম উঠিয়ে কিছু আসবাবপত্র কিনেছিলেন। পরে তিনি সেই টাকা তাঁর বেতন থেকে কিস্তিতে কেটে পরিশোধ করেন। জিয়া মদ পান করতেন না। তিনি জুয়া খেলতেন না কিংবা তাঁর আর কোন সামাজিক অপরাধের সঙ্গে কোন রকম যোগসূত্র ছিলো না। কিন্তু তিনি তাঁর লোকজনকে এ ব্যাপারে দীক্ষা দান করেননি কিংবা তা প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি। উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, এতে তাঁর সহচরগণ তাঁর প্রতি দুর্বল ও নির্ভরশীল হয়ে থাকবে। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সৎ থাকলেও তাঁর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি ঐ সকল দুর্নীতি মেনে নিয়েছিলেন।

এগুলোর একটি হচ্ছে জিয়ার সৃষ্ট যুব কমপ্লেক্স। এই যুব কমপ্লেক্স দেশের বড় বড় হাট-বাজারের সংগৃহীত টাকা গায়েবের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সরকারী হিসেব মতে, ১৯৭৯-'৮০ ও ১৯৮০-'৮১ এই দুই অর্থ বছরে প্রায় সাড়ে বারো কোটি টাকা দেশের যুব কমপ্লেক্সগুলো আত্মসাত করতে সক্ষম হয়। পরে, ১৯৮২ সালে ক্ষমতায় এসে জেনারেল এরশাদ যুব কমপ্লেক্স বাতিল ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে জেনারেল জিয়ার চরম অপব্যয়ের আর এক উদাহরণ হচ্ছে—খাল খনন কর্মসূচী। সরকারীভাবে বিপ্লবের প্রথম পর্যায় হিসেবে সংসদে এর জন্যে বিল আনয়ন করা হয়।

১৯৭৯ সালের ১লা ডিসেম্বর এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। গ্রীষ্মকালীন সেচের সুবিধার্থে ৯০০ মাইল নতুন খাল খনন ও পুরনো খাল পুনঃখনন করা কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। এর লক্ষ্য ছিলো, ৬০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এই কর্মসূচী চালানোর পরিকল্পনা ছিলো। এ উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট নিজে এবং মন্ত্রীবর্গ ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা খাল খনন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, বিনা পারিশ্রমিকে কেউ কাজ করছে না। ফলে, বিনিময়ে খাদ্য এবং অন্যান্য সূত্র থেকে এই কর্মসূচীতে অর্থ যোগান দেয়া হয়। অথচ ঐ অর্থের সিংহভাগ চলে যায় বিএনপি কর্মীদের পকেটে কিংবা স্থানীয় কর্মকর্তাদের পকেটে। অবশেষে জিয়ার

মৃত্যুতে এই কর্মসূচীর অবসান ঘটে। এই কর্মসূচীর বদৌলতে সরকারকে কোটি কোটি টাকা গচ্চা দিতে হয়।

১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে লন্ডনের স্পীকারস কর্ণার-এর অনুকরণে জিয়া ঢাকায় একটি 'মুক্তাঙ্গন'-এর উদ্বোধন করেন। মন্ত্রী তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'যে কেউ তার অভিযোগ, আপত্তি সবকিছু খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করতে পারবে। একমাত্র রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আক্রমণাত্মক উক্তি ছাড়া কোন বক্তব্যের জন্যে কারো বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা নেয়া হবে না।' কিন্তু 'মুক্তাঙ্গনে' গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনের ব্যাপক উপস্থিতির কারণে কেউ সেখানে কোন বক্তব্য রাখতে সাহস পায়নি। কারণ জিয়ার প্রতি সকলেরই বিশ্বাস ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং 'মুক্তাঙ্গন' সংক্রান্ত পুরো ব্যাপারটিই হাসির খোরাকে পরিণত হয়।

জিয়ার আর একটি কাজ সকলের হাসির উদ্রেক করে। বিষয়টি ছিলো একটি রাজনৈতিক পরীক্ষা। 'বিএনপি'র আদর্শ ও দর্শনের' উপর তিনি মন্ত্রী ও দলীয় এমপিদের একটি লিখিত পরীক্ষা নেন। অন্য কেউ যাই মনে করুক, অন্ততঃ তিনি তা গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেন। তিনি শিক্ষক হিসেবে তাদের সঙ্গে অনেকগুলো ক্লাসও নিয়েছিলেন। জিয়ার মৃত্যুর মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ১২ই এপ্রিল, ১৯৮১ সাল, তিনি ঐ লিখিত পরীক্ষা নেন। এতে ৫০ জন মন্ত্রী ও দলীয় নেতা ঐ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু পাশ করেন মাত্র ১০ জন। অকৃতকার্যদের মধ্যে ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী জামালুদ্দিন আহমেদ। এই ছিলো বিএনপি'র রূপ।

তবে বাংলাদেশের জন্যে জিয়ার যে সত্যিকার অবদান ছিলো তা হচ্ছে তিনি প্রথমবারের মতো দেশের লোকদের 'বাংলাদেশী' হিসেবে গর্ববোধ করার পরিচয়ে পরিচিত করে তুলেন। ১৯৭৭ সালের এক ঘোষণায় তিনি জারি করেন যে, এখন থেকে দেশের জনগণ 'বাঙ্গালী' এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' বলে গণ্য হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা এ নিয়ে না ভাবলেও জিয়া এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে চিন্তা-ভাবনা করেন। তিনি সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছিলেন যে, 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদ-সৃষ্টির লক্ষ্যেই জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে চরম আত্মত্যাগ স্বীকার করেছিলো।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ আসলে ঐ সকল ঘটনাবলীরই মূল কথা। এটা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানীদের পছন্দের কোন ব্যাপার ছিলো না। বহু বছরের বঞ্চনা আর গঞ্জনা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী পাঞ্জাবী শাসকচক্র পূর্ব পাকিস্তানীদের মন একেবারে বিষিয়ে তুলেছিলো। সেই বঞ্চনার শিকার পূর্ব পাকিস্তানী বাঙ্গালীরা পাঞ্জাবীদের নজরে পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছিলো। ঐ সবের প্রতি প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশই হলো 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের' গোড়ার কথা। এটা অনস্বীকার্য যে, সে সময় পূর্ব বাংলার বাঙ্গালীরা প্রবল চাপের সৃষ্টি না করলে বৃটেন হয়তো কোনমতেই 'পাকিস্তান' সৃষ্টিতে

সম্মত হতো না। ইতিহাসে পাকিস্তানই প্রথম রাষ্ট্র বা সৃষ্টি হয়েছিলো ধর্মের ভিত্তিতে। পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা অনেক বেশী হলেও পাকিস্তানী শাসকরা কখনো বাঙ্গালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নেয়নি। তারা পূর্ব পাকিস্তানের কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও মেনে নেয়নি। বিশ বছর এক সঙ্গে থাকার পরও তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং পাকিস্তানের ১৯৬৯ সালের সাধারণ নির্বাচন 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের' উপর 'গণভোটের' আকার ধারণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা সেই গণভোটের রায়ও মেনে নেয়নি। তারা তার জবাবে বাঙ্গালীদের উপর সামরিক শক্তির চরম প্রয়োগে লিপ্ত হয়। ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় একটি নূতন দেশ, বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশে বসবাসকারী বাঙ্গালীরাই 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের' অধিকারী। জিয়ার দর্শনও ছিলো তাই।

জেনারেল জিয়া দেশের জনগণকে 'বাংলাদেশী' আখ্যা দিয়ে এবং সংবিধানকে কিছুটা ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জনগণের মনে অনেকটা তৃপ্তির ছোঁয়া লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তা সমাদৃত হতে থাকে। অন্ততঃ এ কারণে প্রেসিডেন্ট জিয়া দেশের মানুষের মনে একটু জায়গা পাবেন।

জেনারেল জিয়া তাঁর দল বিএনপিতে সকল দল ও মতাদর্শের লোকদের একত্রে জমায়েত করেন। অসময়ে শেখ মুজিবের মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হয় বিএনপি। জিয়ার বিএনপি পাকিস্তানী দালালদের জন্যে তার সবগুলো সদর দরজা খুলে দিয়েছিলো। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে পদপ্রার্থীদের মধ্যে ২৫০ জনই ছিলো ঐ দালালগোত্রের রাজনীতিবিদ। তাদের অধিকাংশই শেখ মুজিবের আমলে পাকিস্তানী শাসকচক্র ও হানাদার বাহিনীর সঙ্গে দালালীর অভিযোগে অভিযুক্ত হয় এবং সাজা ভোগ করে। অর্থাৎ দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, জিয়া প্রথম মন্ত্রীসভা এমনভাবে সাজিয়েছিলেন; যেখানে পাকিস্তানী মনোভাবাপন্ন দালালের গোষ্ঠী আর মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানীরা একই সঙ্গে বসে দেশের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ করছিলেন। অনেকে জিয়ার এই কার্যকলাপকে ধিক্কার জানায়। বাংলাদেশীরা যুক্তিসঙ্গত মানুষ। তারা ভাল করেই জানে যে, প্রতিহিংসা অনেকদিন ধরে বুকের ভেতর চেপে রাখা যায় না। এতে আরো বেশী রক্তপাতের সম্ভাবনা থেকে যায়। দালালদের ব্যাপারটারও ছিলো অনেকটা ঐ রকম। তাই জেনারেল জিয়া ক্ষোভ চেপে না রেখে, তাদের জন্যে তাঁর পার্টির দরজা খুলে দেন। এনং নিজেকে 'সমঝোতার ধারক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে এটা ঠিক যে, জিয়া এ ধরনের সমঝোতা চাননি। নিজের সমর্থনকে ভারী করার উদ্দেশ্যেই তিনি এ পথ বেছে নিয়েছিলেন।

অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, জিয়ার সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনামলে দেশে তেমন কোন বড় ধরনের বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়নি। জিয়ার আমলে এ রকম সৌভাগ্য থাকা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতিতে চরম দুরবস্থা বিরাজ করতে থাকে। স্বনির্ভর

আন্দোলনের নেতাকেই বিদেশী সাহায্যের জন্যে হাত পেতে বসে থাকতে হয়। জিয়া দেশে একরকম এবং বিদেশে অন্যরকম ভাবমূর্তি দেখাতে শুরু করেন। তিনি দেশের জনগণকে স্বনির্ভরতার দীক্ষা দান করতে থাকলেও একই সময়ে তিনি বিদেশী সংস্থাগুলোকে অধিক থেকে অধিকতর সাহায্য প্রদানের জন্য ফুসলাতে থাকেন। তার এই দ্বিমুখী চরিত্র সহজেই ফাঁস হয়ে পড়ে। জনগণ এসব বুঝতে পেরে আসন্ন দুর্দিনের চিন্তায় শঙ্কিত হয়ে উঠে।

পাকিস্তানের পাঁচজন নামকরা সাংবাদিক এম. বি. নাক্‌ভি জিয়া হত্যার মাত্র মাসখানেক আগে বাংলাদেশে বেড়াতে এসে, দেশের রাজনীতি আর দুর্নীতির এক করুণ চিত্র তুলে ধরেন।

মারকাস ফ্রান্ডা তার 'জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ' নামক সমীক্ষা গ্রন্থে বলেন, "একটি ক্ষুদ্র নব্যধনী শ্রেণীর হাতে বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থের নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ায় দেশের পরস্পর বিরোধী দুই ধরনের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে, একদিকে ঢাকা কেন্দ্রিক একটি শ্রেণী দিন দিন উন্নত ও ধনবান হচ্ছে। অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চলের অবস্থা খারাপ থেকে অধিকতর খারাপ হয়ে পড়ছে।"

এ ধরনের অবস্থায় সন্ত্রাস, অপরাধজনিত ঘটনা আর হতাশা বৃদ্ধি পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। জিয়া আর জনগণ—এই উভয়পক্ষের জন্যেই রঙিন স্বপ্ন ম্লান হয়ে যেতে থাকে। রাজনৈতিক হত্যা আর ডাকাতি প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। কুষ্টিয়ায় পুলিশ কনস্টেবলের হাতে জেলা প্রশাসক প্রহৃত হয়। স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে যায় এবং এতে পুলিশের হাত থাকার প্রমাণও পাওয়া যায়। এ ধরনের অপকর্ম বাংলাদেশে এর আগে এমন ব্যাপকহারে ঘটতে কখনো শোনা যায়নি। ১৯৮০ সালের শেষে এবং পরবর্তী সালের প্রথমদিকে মুক্তিযুদ্ধ আর দালালগোষ্ঠীর মধ্যে একটা মুখোমুখি সংঘর্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। সেই সময়ে প্রায় প্রতিদিনই এই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের খবর পাওয়া যেতে থাকে। পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিলো যে, দু'দলই দেশব্যাপী এক মহাসমরের লক্ষ্যে বারবার অস্ত্রশস্ত্র যোগানের কাজ চালিয়ে যাচেছ। জেনারেল জিয়ার 'সমঝোতা নীতি'র ফলস্বরূপ এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

১৯৮১ সালের জানুয়ারীর গোড়ার দিকে সরকারী ইঙ্গিতে পত্র-পত্রিকাগুলো জেনারেল জিয়া ও আওয়ামী লীগের মাঝে কোন একটা বুঝাপড়া চলছে বলে মত প্রকাশ করে। সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ একটি সংবাদ দেয় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, জেনারেল জিয়াকে শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর অনুরোধ করেছেন। ঐ সময়ে শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থানরতা। ইত্তেহাদের মতে, আওয়ামী লীগ সমঝোতার জন্যে দু'টি শর্ত আরোপ করে। একটি হচ্ছে, শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা ঘোষণা করতে হবে। এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটি

নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে। পত্রিকাটি বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে জানায় যে, জিয়া দু'টি শর্তই মেনে নিতে রাজী হয়েছেন। ইত্তেহাদে বলা হয় যে, জিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তিনি মুজিব হত্যাকারী দলের অন্যতম সহযোগী লেঃ কর্নেল পাশাকে মুজিব হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করবেন। এ সময়ে আরেকটি অভ্যুত্থান ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে পাশার বিচার চলছিলো।

ভারতীয় প্রধানন্ত্রীর হস্তক্ষেপের কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, জেনারেল জিয়া শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরে আসার অনুমতি প্রদান করেন। হাসিনা ৭ই মে, ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে এলে তাকে এক বিরাট বিজয়ীর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। হাসিনার প্রত্যাবর্তন ও তার সম্বর্ধনার বহর দেখে 'দালালগোষ্ঠী' যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা মনে মনে ভাবতে থাকে যে, এবার তাদেরকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হবে। এ সময়ে বেশ কয়েকটি প্রকাশ্য ও গুপ্ত ঘটনা ঘটে। অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় হত্যাকান্ডগুলো ঘটানো হয়, যার কারণে জনগণ এতে সরকারের ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করে এবং এ জন্যে সরকারকে অভিযুক্ত করে। কয়েকদিন পর জেনারেল জিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করেন যে, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। এ ধরনের বহু গুপ্ত হত্যার তদন্ত করার জন্যে গঠিত তদন্ত কমিটিগুলোর রিপোর্ট প্রকাশে ব্যর্থ হওয়ায় সকলেই সরকারকে অভিযুক্ত করে এবং বলতে থাকে যে, এ ধরনের গুপ্ত হত্যাগুলোর ব্যাপারে সরকার ইচ্ছে করেই চোখ বন্ধ করে রাখার ভান করছেন। ঐ সকল হত্যার তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না করার হেতু জিজ্ঞেস করা হলে জিয়া বলেন যে, 'এর জন্যে একটু সময়ের প্রয়োজন হবে। কারণ প্রশাসনকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

প্রশাসন পরিবর্তনের কথা জিয়া এর আগেও কয়েকবার উল্লেখ করেছেন। তার পূর্বসুরি শেখ মুজিবের মতো জিয়াও নিজের নীতির ব্যর্থতার কথা স্বীকার করতে পারেননি। এই রকম পর্বত প্রমাণ অসন্তোষের জন্যে তিনি প্রশাসন এবং সাংবিধানিক গঠনকে দায়ী করেন। বিএনপি'র এক কাউন্সিল অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে জিয়া বলেন, "ঔপনিবেশিক শাসকের কাছ থেকে পাওয়া আইন-কানুন দিয়ে বিপ্লব সফল হতে পারে না। আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের আইন-কানুনকে সংশোধন ও ঢেলে সাজাতে হবে। আমরা প্রশাসনকে ধাপে ধাপে পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করছি।"

ডঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী আমাকে জানান, "ঠিক শেখ মুজিবের শেষ দিনগুলোর মতো, রিপোর্ট এবং গুজব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিলো যে, অচিরেই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। জিয়া মারা না গেলেও ছয় মাসের মধ্যে দেশের ভেতরে একটা মারাত্মক গোলযোগের সৃষ্টি হতো। জিয়ার প্রশাসন যন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। জিয়া যেহেতু সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে অক্ষম ছিলেন, সেজন্যে তার প্রশাসন আরো অধিক দুর্বল হয়ে পড়তো।" জেনারেল জিয়ার সঙ্গে ডঃ জাফরুল্লাহর একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি জিয়ার মৃত্যুর

মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। জাফরুল্লাহ নিজেও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন এবং সেই সম্বন্ধে একটি গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, জিয়া অতি সত্বর জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। এবং তিনি তাঁর সরকার পরিচালনার জন্যে একটি 'বিপ্লবী কাউন্সিল' গঠন করবেন। এর আগে সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকাতেও এর একটা পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিলো।

মুজিব হত্যার ছয় বছর পর জিয়ার ভাগ্যের চাকা পুরোপুরি একবাক ঘুরে গেলো। জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশ আবার আগের অবস্থায় ফিরে এলো। এবং শেখ মুজিবের মতো, জিয়াও সংবিধান বহির্ভূত পদক্ষেপ গ্রহণ করে ঐ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালান।

জিয়ার চরিত্রে যে একটা সন্দেহ প্রবণতা কাজ করছিলো, সে জন্যে তিনি তার সর্বময় ক্ষমতার সামান্য একটুও হাতছাড়া করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। তিনি রাজনৈতিক সুবিধের বন্দীপাশে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করতে পারেননি, যা তাকে এবং তার বাংলাদেশকে রক্ষা করতে পারতো। শেষেরদিকে তাঁর সন্দেহ প্রবণতা চরমে পৌঁছে। জেনারেল জিয়া অত্যন্ত শক্ত হাতে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে 'আজীবন প্রেসিডেন্ট থাকার অভিলাষ মনে মনে পোষণ করতে লাগলেন। কিন্তু সেই অভিলাষ স্থায়ী হলো না।'

১২

অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ আর প্রাণদন্ড

যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা না মরে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের গলায় ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলিয়ে রাখো।

—জেনারেল জিয়াউর রহমান

১৯৭৬ সাল। ১৪ই এপ্রিল রোজ বুধবার। লেঃ কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) খন্দকার আবদুর রশিদ আয়েশের সঙ্গে দুপুরের লাঞ্চটা সেরে নিয়ে লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে এসে পৌঁছেছে। লন্ডন থেকে রোম হয়ে তার ব্যাংকক যাবার কথা। সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সের ফ্লাইট এসকিউ ৭৩৪-এ ধরার জন্যে আনুষঙ্গিক কাজ-কর্ম সম্পাদন করে সে কাউন্টারে এসে কাউন্টারের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'আমরা কখন রোমে পৌঁছাব?'

'না স্যার', মেয়েটি জবাব দিলো। 'এই ফ্লাইটে আমরা রোম যাচ্ছি না বরং রোমকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। কারণ, রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বিমান বন্দরের কর্মীরা ধর্মঘট করেছে।'

হঠাৎ করে বিমানের রুট পরিবর্তনের জন্যে রশিদের ব্যাংককে যাওয়া পণ্ড হতে বসেছে। রশিদ অস্থির হয়ে উঠলো। অস্থির স্বরে সে মেয়েটিকে বললো, 'আমার ব্যাগগুলো ফিরিয়ে দিন। আমি আমার মত পরিবর্তন করেছি। আমাকে অন্য ফ্লাইট ধরতে হবে।'

তার ব্যাগগুলো নিয়ে রশিদ নিকটস্থ টেলিফোন কাউন্টারে ঢুকে পড়ে। রোম এয়ারপোর্ট-এর কাছে হোটেল জলিতে ফারুক তখন অবস্থান করছিলো। হোটেল জলিতে টেলিফোন করে ফারুককে সংযোগ দেয়ার জন্যে সে অনুরোধ করে। অপারেটর তাকে জানায় যে, ফারুক কিছুক্ষণ আগেই হোটেল থেকে বাইরে গেছে।

নিজে নিজে পণ করে ট্যাক্সি ধরে রশিদ কেনসিংটন হিল্টন হোটেলের ১০২৪ নম্বর রুমে চলে আসে। হিল্টনে এসে আবারো সে হোটেল জলিতে ফোন করে। দ্বিতীয়বারও ঠিক একই উত্তর পাওয়া গেলো। ফারুক আপাততঃ সেখানে নেই। জানালা দিয়ে চেরী ফুলের সুবাস মিশ্রিত ঠান্ডা বাতাস আসা সত্ত্বেও রশিদ ভীষণভাবে ঘামছিলো। সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সের ফ্লাইট রোম পৌঁছলে, সেই ফ্লাইটে তিন সদস্য বিশিষ্ট 'হত্যাকারী দলের

সঙ্গে ফারুকের একত্রে মিলিত হবার কথা। এখন, ঐ দলের মিলন হতে পারছে না এবং দু'মাস ধরে সযত্নে পরিকল্পিত ঢাকায় অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারটি ভেস্তে যাবার উপক্রম হয়েছে। রোমের বিমান বন্দর কর্মচারীদের ধর্মঘটই তাদের জন্যে বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

এইটি মেজরদের (তখন ওরা লেঃ কর্নেল) দ্বিতীয় অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা। খালেদ মোশাররফের পাল্টা অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে তাদেরকে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর দেশত্যাগী হতে হয়। ফারুক, রশিদ এবং শেখ মুজিবের পরিবারকে খতম করার সঙ্গে জড়িত দলের অন্যান্যরাও ভেবেছিলো যে, লিবিয়ায় তাদের প্রবাস জীবন খুব সংক্ষিপ্ত হবে। 'মাস দুই এক-এর বেশী হবে না', ফারুক আমাকে জানিয়েছিলো। কিন্তু ডিসেম্বরের শেষের দিকে তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার চিরদিনের জন্যে না হলেও অনির্দিষ্টকালের জন্যে তাদের প্রবাস প্রত্যাশা করছিলো। প্রবাসীরা প্রচুর পরিমাণে প্রতিনিধি প্রেরণ, আবেদন-নিবেদন করলেও তার কোন জবাবই ঢাকা থেকে আসছিলো না। তাদেরকে পুরোপুরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো। এমনকি, তাদের পরিবার-পরিজনকে তাদের প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। স্পষ্টতঃই তাদের অবগিত ছাড়াই এই দু'জনকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করানো হয়। এখন তাদের আর উর্দি পরিধান করার আইনসঙ্গত অধিকার রইলো না। বেদনাদায়ক হলেও ফারুক আর রশিদ এখন ডালিম, নূর আর হুদার মত অবসরপ্রাপ্ত অফিসাররা কাতারে চলে এলো। যাদেরকে ওরা অন্ততঃ মনে মনে এককালে ছোট চোখে দেখতো।

১৯৭৬ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি তাদের মনোবল একেবারে নিম্নস্তরে নেমে আসে। ঐ সময়ে বিমান বাহিনী প্রধান, এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্যে কিছু জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করার জন্যে লিবিয়ায় আসেন। অবশ্য তিনি এর কিছুই পাননি। তিনি ত্রিপলিতে থাকাকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ফারুক, রশিদ আর ডালিম তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পায়। সেই সময়ে ওরা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতা কামনা করে। তোয়াব তাদের জন্যে 'কিছু একটা করবে' বলে কথা দেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বিমান বাহিনী প্রধান তাদের জন্যে সম্ভবতঃ কিছুই করতে পারেননি কিংবা করার চেষ্টাই করেননি। সুতরাং ১৫ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশে ফিরে যাবার অনুমতি চেয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমানের কাছে রশিদ একটি দু'পৃষ্ঠার চিঠি লিখে। চিঠিটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জামির-এর মাধ্যমে কূটনৈতিক ব্যাগে করে পাঠানো হয়েছিলো। চিঠিটির অংশ বিশেষ নিম্নরূপ ঃ

"কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে এখানে আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমাদের মানসিক অবস্থা এবং মনোবল উভয়েরই দারুণভাবে অবনতি ঘটছে। এতে করে সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলা এবং অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি করছে, যার ফলে এখন আমাদের

মাঝে প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এমন কিছু একটা ঘটলে তার জন্যে আমাদেরকে দায়ী করা উচিত হবে না। অনেকগুলো ব্যক্তিগত কারণ এবং বিব্রতকর পরিস্থিতির জন্যে এখন আর আমাদের পক্ষে লিবিয় সেনাবাহিনীর যে-কোন পদে চাকুরী করা সম্ভব নহে। তাছাড়া, কিছু আর্থিক ও মানসিক জরুরী কারণে আমাদের অবিলম্বে ঢাকায় আসা একান্ত প্রয়োজন।"

রশিদ আরো দু'টি দাবীর প্রতি জোর দেয়। একটি হলো—জেনারেল জিয়া তাদের প্রত্যাবর্তনে রাজী হলে, তিনি যেন সত্বর তাদের যাতায়াত খরচ বাবদ ১৫,০০০ পাউন্ড স্টার্লিং পাঠিয়ে দেন। অপরপক্ষে, তিনি যদি নারাজ হন, তাহলে তাঁর অস্বীকৃতির কারণ তিনি যেন লিখিতভাবে জানিয়ে দেন। রশিদ আরো জানিয়ে দেয় যে, তিন সপ্তাহ অর্থাৎ ৭ই মার্চের মধ্যে যদি তারা এর কোন জবাব না পায় তাহলে, 'তারা দল বেঁধে বা ব্যক্তিগতভাবে' ঢাকায় ফিরে আসার জন্যে কোন বাধা নেই বলে মনে করবে।

তাদের এই শেষ প্রস্তাব আশাপ্রদ ফল দেয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী জেনারেল জিয়ার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ব্রিগেডিয়ার (পরে মেজর জেনারেল) নূরুল ইসলাম শিশুকে সমস্যার সমাধান কল্পে বেনগাজীতে পাঠিয়ে দেন। শিশু তাদের সঙ্গে দলীয়ভাবে এবং এককভাবেও মিলিত হয়ে সমস্যার সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা চালায়। তাদেরকে বাংলাদেশ দূতাবাসে কূটনীতিকের পদসহ আরো অনেক সুবিধাদি প্রদানের প্রস্তাব করা হলেও শিশুর প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করে। তখন শিশু বাংলাদেশে ফিরে যাবার ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে বলে আশ্বাস দেয়। কিন্তু এর জন্যে সময় লাগবে বলেও সতর্ক করে দেয়া হয়। রশিদ তখন দলের পক্ষ থেকে জিয়াকে একটি চিরকুট লিখে দেয়। এ চিরকুটে তাদের প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তের জন্যে জিয়াকে আরো দু'সপ্তাহ সময় বাড়িয়ে দেয় এবং তাতে লেখা থাকে যে, দেশে ফিরে এসে দেশের উন্নতি আর গৌরবের স্বার্থে তারা তাদেরকে জিয়ার নেতৃত্বে সোপর্দ করবে। ২১শে মার্চ চলে গেলো। কিন্তু কোন জবাব এলো না। এতে প্রবাসী মেজররা সিদ্ধান্ত নেয় যে, জেনারেল জিয়াকে সরিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে উৎখাত করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করবে।

আরো একবার ফারুক আর রশিদ মনে-প্রাণে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে দেশের ভেতরে কিছু ঘটানোর জন্যে টেলিফোন ছাড়া আর কোন মাধ্যম তাদের জন্যে বাকী রইলো না। লিবিয়া থেকে টেলিফোনে ঢাকাকে ধরা কষ্টকর বলে ফারুক ২৪শে মার্চ ফ্রাঙ্কফুর্টে চলে যায়।

ফারুকের অনুপস্থিতিতে রশিদ দেশের একটি উৎসাহজনক বার্তা পায়। বার্তায় জানানো হয়, সরকার তাকে একটি সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকা এসে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঢাকার সফরে রশিদ তার স্ত্রী এবং সন্তানদের সঙ্গে আনতে

পারবে। ফারুক ফ্রাঙ্কফুর্টে থাকায় তার স্ত্রীকেও রশিদের সঙ্গে দেশে ফেরার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু বার্তাটিতে জোর দিয়ে বলা হয়, এ সময়ে ফারুক কিংবা তাদের অন্য কেউ দেশে ফেরার চেষ্টা করতে পারবে না। রশিদ ভাবলো এটা একটা শুভ লক্ষণ। হাজার মাইল দূরে বসে আর পরিকল্পনা করার দরকার হবে না। দেশে বসেই সে সবকিছু করে নিতে পারবে।

সময় ক্ষেপণ না করে রশিদ ফ্রাঙ্কফুর্টে ফারুকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ফারুক সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে দেশে ফেরার আগে লন্ডনে যাবে। কারণ, সেখানকার পোর্টম্যান হোটেলে সাময়িকভাবে অবস্থানরত এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াবের সঙ্গে তার দেখা করা প্রয়োজন। ২৯শে মার্চ ফারুক লন্ডনে যায়। সে পোর্টম্যান হোটেলের কাছে অবস্থিত চার্চিল হোটেলে উঠে। তোয়াব সে সময় দুই কর্নেলের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু তারা যে কিছু একটা করতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে তিনি মোটামুটি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তাঁর সঙ্গে জিয়ার ব্যবহার তিনি ভুলেননি। কাজেই তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে ফারুক-রশিদের সঙ্গে তাল মিলালেন। ফারুক তোয়াবের কাছ থেকে সেনাবাহিনীর বর্তমান অবস্থান ও পরিবর্তনের তথ্যাবলীসহ রাজধানীর বর্তমান পরিস্থিতির একটা পূর্ণ ধারণা লাভ করে।

ফারুক আর তোয়াব তিনটি বৈঠকে মিলিত হন। সাভার ক্যান্টনমেন্টে ১৩টি ট্যাংক মোতায়েন আছে জানতে পেরে ফারুক বেশী খুশি হন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে জেনারেল জিয়া বেঙ্গল ল্যান্সারকে দু'ভাগে ভাগ করেন। ৫০০ সৈন্য এবং ১৪টি ট্যাংক নিয়ে তিনি প্রথম বেঙ্গল ক্যাভালরি গঠন করেন। বেঙ্গল ল্যান্সারকে তিনি পাঠিয়ে দেন বগুড়াতে। ফারুকের অনুগত এই বাহিনীকে জিয়া ঠিক মতই বিভক্ত করে রাখেন। জিয়া ব্যক্তিগতভাবে ওদের উপর নজর রাখার জন্যে তিনি প্রথম বেঙ্গল ক্যাভালরিকে সাভারে রেখেছিলেন। তোয়াব ফারুককে জানান যে, কিছুদিন ধরে নূতন রিক্রুটদের প্রশিক্ষণের জন্যে সাভার ক্যান্টনমেন্টের ট্যাংগুলো প্রতিদিন সকাল ৫টা থেকে ৯টা পর্যন্ত সময়ে বাইরে আনা হয়। ফারুক এটাকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করে। কারণ, প্রতিদিন ট্যাংক বের করার ফলে বিশেষ উদ্দেশ্যে কেউ যদি এগুলো বের করে তাহলে তা কারুর নজরে পড়বে না। ফারুক সিদ্ধান্ত নেয় যে, সাভার পৌঁছে সে তার লোকদের তালিম দিয়ে সুযোগ বুঝে ট্যাংকগুলো নিয়ে ঢাকা রওয়ানা দেবে। এইভাবে ট্যাংক দিয়ে জিয়াকে অপসারণ করে সরকারের ক্ষমতা দখল তার জন্যে তেমন কোন শক্ত কাজ হবে না।

ফারুক বেনগাজীতে ফিরে গিয়ে রশিদের সঙ্গে আলোচনা করে অতিদ্রুত একটি 'অভিযান পরিকল্পনা' তৈরী করে ফেলে। তাঁরা স্থির করে, দু'একদিনের ব্যবধানে তারা পৃথকভাবে লিবিয়া থেকে বাংলাদেশে ঢুকে পড়বে। ফারুক তার 'ঘাতকদল' নিয়ে সিঙ্গাপুরে

যাবে। ঐ দলে রয়েছে—মুসলেহউদ্দীন, মারফত আলী আর হাশিম। ওরা শেখ মনি আর জেল হত্যার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলো। তারা সিঙ্গাপুরে রশিদের সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করবে। রশিদ একাই ঢাকায় চলে যাবে এবং স্ত্রীদ্বয় ও সন্তানেরা লিবিয়াতেই থেকে যাবে। কেননা, অযথা তাদেরকে নিয়ে ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়া ঠিক হবে না বলে রশিদ মনে করেন।

ঢাকা পৌঁছে রশিদ লিবিয়াতে অবস্থানরত সামরিক অফিসারদের ফেরত নেবার আলোচনার ফাঁকে সে অভ্যুত্থানের প্রথম পর্যায়ের কাজগুলো সম্পন্ন করে নেবে। অভিযানে নামার আগে রশিদ দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি, বেঙ্গল ল্যান্সার আর বেঙ্গল ক্যাভালরিতে তাদের সমর্থনের লোক চিহ্নিত করে দল পাকানোর কাজটা করে ফেলবে। এরপরে দুই কর্নেলের জন্যে দু'টি বিকল্প থাকবে। প্রথমটি হচ্ছে, দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারী আর আর্মড ইউনিট সিঙ্গাপুর থেকে ফারুকের ঢাকা পৌঁছানোর সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঢাকা বিমান বন্দর অবরোধ করবে। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ফারুক জিয়াকে অপসারণ ও সরকার দখলের চেষ্টা চালাবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ঢাকা বিমান বন্দরে বি আর্টিলারী ও ক্যাভালরির লোকেরা গোপনে অপেক্ষা করতে থাকবে। ফারুক বিমান থেকে নামার পর তারা গোপনে ফারুককে সাভার ক্যান্টনমেন্টে ট্যাংকের আশ্রয়ে নিয়ে যাবে। সুযোগ বুঝে ফারুক সাভার ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাংক বের করে ঢাকায় পৌঁছাবে এবং সরকারকে উৎখাত করবে।

এই অভিযান পরিকল্পনাটি এতই সাদামাটা ছিলো যে, একটা অদ্ভুত কিছু না ঘটলে তা বাস্তবে পরিণত হওয়া সম্ভব ছিলো না। এতে চরম গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিলো। তাদের একটা সমস্যাও ছিলো। লিবিয়াতে থাকাকালে প্রবাসী অফিসারদের মধ্যে সম্পর্ক খুব সুন্দর ছিলো না। অন্যান্যরা তাদের প্রবাস জীবনের জন্যে ফারুক আর রশিদকে দায়ী করতো। কিন্তু মুসলেহউদ্দীন, মারফত আলী আর হাশিমের অযোগ্যতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন ছিলো না। এই জন্যে অন্যান্যদের না জানিয়ে কেবল ঐ তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে এই পরিকল্পনার কাজ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

বেনগাজীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুই ব্যক্তির সঙ্গে তাদের অত্যন্ত চমৎকার সম্পর্ক বিরাজ করছিলো। এদের একজনের নাম মেজর সালিম ইব্রাহিম। বেনগাজীতে পোর্ট ডাইরেক্টরের আবরণে তিনি ছিলেন আসলে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন অফিসার। অন্যজনের নাম মেজর সোলায়মান।

তিনি ছিলেন সিরেনিকা প্রদেশের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি গাদ্দাফীর বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। এই দুই লিবিয় অফিসার বিশেষ করে মেজর ইব্রাহিম বাংলাদেশী এই দুই কর্নেলের যথেষ্ট কাজে আসেন। তাদের সহযোগিতায় ফারুক রোমের জলি হোটেলে এবং রশিদ লন্ডনের কেনসিংটন হোটেলে যাবার সুযোগ পায়। রশিদের লন্ডন যাবার উদ্দেশ্য ছিলো তখন তথায় অবস্থানরত ডালিমকে তার পরিকল্পনায়

টানার চেষ্টা করা। ডালিম রশিদের প্রস্তাবে সম্মতি জানালে, সেদিন রাতেই রশিদ ঢাকায় সেনাবাহিনীর এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ব্রিগেডিয়ার নূরুল ইসলাম শিশুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। রশিদ ব্রিগেডিয়ার শিশুকে অনুরোধ জানায় ডালিমকে দেশে ফেরার অনুমতি দিতে। রশিদের অনুরোধে কাজ হয়। এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল রাজী হলে, রশিদ ডালিমকে ২০শে এপ্রিলের মধ্যে দেশে পৌঁছার নির্দেশ দেয়। ঐ সময় ফারুক আর রশিদ ঢাকায় অবস্থান করবে। রশিদ ১৫ই এপ্রিল লন্ডন থেকে ঢাকা যাবার কথা। কিন্তু রোমের ঐ বিমান কর্মীদের ধর্মঘট তার পরিকল্পনা ওলটপালট করে দেয়। অনেক চেষ্টার পর রোমে ফারুকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। দু'জনে টেলিফোনে আলোচনা করে নূতন কর্মসূচী ঠিক করে। পরিবর্তিত সময়সূচী অনুযায়ী রশিদ ১৬ই এপ্রিল সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সের ফ্লাইট নম্বর এসকিউ ৭৪২-এ ফ্লাইটে লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দর থেকে বিমানে উঠে। রোম বিমান বন্দরের এই ফ্লাইটে উঠে ফারুক আর তার তিন সহযোগী। ব্যাংকক পৌঁছানোর আগে তারা বিমানে পুরো পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।

রশিদ ২০শে এপ্রিল ব্যাংকক থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছায়। সে ঢাকায় এলে তাকে তার আত্মীয়-স্বজন, ফারুকের মা-বাবা এবং প্রচুর বন্ধু-বান্ধব বিপুল সংবর্ধনা জানায়। ঐ সময়ে মিলিটারী গোয়েন্দা বাহিনী ও এনএসআই-এর অনেক অফিসার বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়। তারা সবদিকেই কড়া নজর রাখে। রশিদ তার জন্যে রক্ষিত ক্যান্টনমেন্টের বাসায় চলে যায়। পরে, ঐ রাতেই সে ব্রিগেডিয়ার নূরুল ইসলাম শিশুকে নিয়ে জেনারেল জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করে। বন্ধুত্বমূলক পরিবেশে এই বৈঠক বেশ কিছুক্ষণ চলে। মাঝে নৈশভোজের জন্যে তাদের আলোচনা কিছুক্ষণের মত স্থগিত থাকে। জিয়া তাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলে, রশিদ সবকিছু খুলে বলে। জিয়া কথা প্রসঙ্গে ফারুক কোথায় এবং কেমন আছে জানতে চান। রশিদ বলে, ফারুক বেনগাজীতে আছে।' জিয়া বললেন তাই নাকি। আমি তো রিপোর্ট পাচ্ছি, ফারুক এখন সিঙ্গাপুরে।' কিন্তু রশিদ এসব অস্বীকার করে জিয়াকে বলে, আপনি সঠিক রিপোর্ট পাননি।' জিয়া ততোধিক দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন, আমি বিশ্বস্তসূত্রে এ খবর পেয়েছি। আমেরিকান সূত্রও একই তথ্য দিচ্ছে।' রশিদ বুঝতে পারলো, থলির বেড়াল বেড়িয়ে গেছে। যে কোনোভাবেই হোক, তাদের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেছে। দ্রুত এই পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে এবং আরো অনেক সতর্কতার সাথে সামনে এগোতে হবে।

সিঙ্গাপুর থেকে ফারুকের ঢাকা আসার সময় ঠিক হয় ২৩শে এপ্রিল, শুক্রবার (শুক্রবারে জাতক তখনও ঐ দিনটাকে শুভ বলে মনে করছিলো)। রশিদ ঢাকায় এসে তার পরবর্তী দু'টি দিন ফারুকের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যে গোপনে কাজ করে যাচ্ছিল। গোয়েন্দা সংস্থার নাকের ডগার উপর দিয়ে কাজ করে সে তার নিজের দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারীকে, বগুড়ায় অবস্থানরত বেঙ্গল ল্যান্সারের প্রয়োজনীয় অংশকে আর সাভারে

অবস্থানরত ফার্স্ট বেঙ্গল ক্যাভালরিকে চাঙ্গা করে তুলে। ঢাকা বিমান বন্দরে ফারুক নামার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাভার ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাবার জন্যে রশিদ একটা 'ওয়াচ পার্টির' ব্যবস্থা করে। এতসব প্রতিকূলতার মাঝেও কাজগুলো সম্পন্ন করে রশিদ বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়।

সিঙ্গাপুরে ফারুকের অবস্থান সম্পর্কে জেনারেল জিয়ার অবগতি থাকলেও ঠিক পরিকল্পনা মত ফারুক ঢাকায় এসে পৌঁছায়। সাভারে পৌঁছালে সেখানকার প্রায় দু'হাজার সৈন্য তাকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। সৈন্যরা তাকে কাঁধে নিয়ে শ্লোগান দিতে থাকে 'ফারুক জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা বিষয়টি জেনারেল জিয়ার কানে দিলে, তিনি তখনকার মত চোখ-কান বন্ধ করে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং সাময়িকভাবে ফারুককে ঢাকায় থাকতে অনুমতি দেন।

ডালিম আসে ২৫শে এপ্রিল । এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াবও দুবাই থেকে একই প্লেনে এসেছিলেন। জিয়া বিষয়টিকে অন্যভাবে নেন এবং এটিকে তোয়াবের অপসারণের অন্যতম কারণ হিসেবে কাজে লাগান। 'খুনী মেজরদের' ঢাকায় অবস্থান করার ফলে, রাজনৈতিক অঙ্গনে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে চরম উত্তেজনার ফলে বিরাট এক ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যেতে থাকে আর ক্যাভালরির সৈনিকরা উপরস্থদের নির্দেশ অমান্য করে ফারুক আর রশিদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করে। এদিকে তারা সীমাহীনভাবে একের পর এক জেনারেলদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মহড়া চালিয়ে যাচ্ছিলো। আবার অন্যদিকে ঢাকা, সাভার আর বগুড়ায় তারা বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। অবশেষে ২৭শে এপ্রিল বগুড়ায় অবস্থানরত বেঙ্গল ল্যান্সারদের এনসিও সিপাইদের কাছ থেকে জেনারেল জিয়ার কাছে এক সংবাদ এলে অবস্থা চরমে পৌঁছে। 'ফারুককে আমাদের কাছে বগুড়ায় পাঠিয়ে দিন নতুবা আমরাই ট্যাংক নিয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা দেবো।'

সংবাদটি সেনাবাহিনী হেড কোয়ার্টারে প্রচুর অস্থিরতার সৃষ্টি করে। জেনারেল জিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আরিচা ফেরী ঘাটে একটি ইনফান্ট্রি রেজিমেন্ট পাঠিয়ে দেন যাতে করে নদী পার হতে চাইলে তাদেরকে তারা প্রতিহত করতে পারে। পরে বেঙ্গল ল্যান্সারদেরকে শান্ত করার জন্যে জেনারেল জিয়া ফারুককে বগুড়ায় পাঠিয়ে দেন। এ সিদ্ধান্তটি দিয়ে জিয়া এক বিরাট ভুল করেছিলেন। বেঙ্গল ক্যাভালরি আর বেঙ্গল ল্যান্সারের সমর্থন ও নেতৃত্ব পেয়ে ফারুক খুশী হলো। দুই সশস্ত্র ব্রিগেডের বলে বলীয়ান হয়ে ফারুক জিয়ার উপর আঘাত হানার প্রয়োজনীয় শক্তি হাতে পেলো।

লেঃ কর্নেলের চিহ্ন কাঁধে ঝুলিয়ে ল্যান্সারের কালো উর্দি পরে রাজকীয় চালে ড্রাইভার-চালিত জীপে চড়ে ফারুক বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছায়। ল্যান্সারের অফিসারেরা এসব দেখে ঘাবড়ে গেলেও সৈন্যেরা উৎফুল্ল হয়ে উঠে। ফারুক সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলে,

'বগুড়া আমাদের অবস্থানের জায়গা নয়। আমাদের জায়গা ঢাকয়। আমরা সেখানেই ফিরে যাবো।' ফারুকের প্রাক্তন কমান্ডিং অফিসার কর্নেল মোমিন তাকে পরামর্শ দেয় যে, তার এমন কোন বোকামি করা উচিত হবে না, যার ফলে সৈন্যরা মারা পড়তে পারে। কারণ, ইতিমধ্যেই ওদের এ ধরনের ভয়ঙ্কর ভোগান্তির চরম অভিজ্ঞতা হয়েছে। ফারুকের তখন ঐ সমস্ত কথা শোনার মানসিকতা ছিলো না। কিন্তু রশিদের কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল' না পাওয়া পর্যন্ত ফারুক বগুড়াতেই থেকে যেতে সিদ্ধান্ত নেয়। জেনারেল জিয়া একটা বড় ধরনের বিদ্রোহের আঁচ করতে পেরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবার আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যায় রশিদ আশ্চর্যের সঙ্গে দেখতে পায় যে, সে তার নিজ বাসায় বন্দী হয়ে গেছে। বাড়ীটা পুরোপুরিভাবে মিলিটারী গার্ড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। ভেতরের কাউকে বাইরে যেতে এব বাইরের কাউকে ভেতরে আসতে দেয়া হচ্ছিলো না।

রশিদ বুঝতে পেরেছিলো, এমন একটা কিছু ঘটতে পারে। তাই সে গোপনে সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিলো। ঐ গোপন পথেই সে বগুড়ায় ফারুক আর সাভারে মুসলেহউদ্দীনের কাছে বিপদ সংকেত পাঠিয়ে সতর্ক ও তৈরী থাকতে বলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই তারা যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু সে জন্যেও জেনারেল জিয়া পরবর্তী দাবার গুটি সঠিক অবস্থানে দাঁড় করে রেখেছিলেন।

জেনারেল জিয়ার গার্ড রেজিমেন্ট থেকে কিছু লোক আর চারজন অফিসার মিলে রশিদকে তার বাসভবন থেকে সেনা সদর দফতরে নিয়ে আসে।সেখানে তাকে ছ'ঘন্টা আটকে রাখা হয়। পরে সেখান থেকে রশিদকে জেনারেল জিয়ার অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। রশিদ জানায়, জিয়া অত্যন্ত সহজভাবে কথা বলছিলেন। খন্দকার মোশতাক প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান হতে সাহায্য করায় তিনি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তিনি জাতীয় স্বার্থে তাদের দলের সকলকে কিছু সময়ের জন্যে দেশের বাইরে অবস্থান করার উপর জোর দেন। জিয়া তাদেরকে বাংলাদেশ দূতাবাসে তাদের পছন্দনীয় পদে নিয়োগ করার আশ্বাস দেন। তিনি পরিষ্কার করে বলেন যে, কোন অবস্থাতেই অনুমতি ছাড়া তারা আর দেশে ফিরে আসতে পারবে না। জিয়া রশিদকে জানান যে, এখন থেকে প্রথম যে ফ্লাইটটি পাওয়া যাবে তাতে করেই তাকে দেশত্যাগ করতে হবে। রশিদ তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু এতে করে সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই সময়ে থাই এয়ার লাইন্স-এর একটি ফ্লাইট ব্যাংকক যাচ্ছিলো। মিলিটারী পাহারায় তাকে বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে গিয়ে সে ডালিমকেও দেখতে পেলো। দু'ঘন্টার মধ্যে তাদের দু'জনকে বিমানে উঠতে বাধ্য করা হলো। রশিদের দ্বিতীয় অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা এভাবেই নস্যাৎ করে দেয়া হলো।

ঢাকায় ফিরে আসার কড়া নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ফারুক ল্যান্সারের ট্যাংক নিয়ে বগুড়ায়

ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকে। কর্নেল হান্নান শাহ্র নেতৃত্বে ৬ষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আক্রমণাত্মক অবস্থান নেয়। সাভারেও একই অবস্থা গৃহীত হয়। মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীর অধীনে ৪তম পদাতিক ব্রিগেড বেঙ্গল ক্যাভালরিকে তিনদিন ধরে ঘিরে রাখে। তার পর এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, পদাতিক বাহিনী জিয়ার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। বিদ্রোহীদের অবস্থা নৈরাশ্যজনক। ফারুকও বুঝতে পারলো যে, তার ভাগ্য তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সুতরাং একটি হেলিকপ্টারে করে তার পিতা আর তার বোনকে বগুড়ায় পাঠিয়ে দিলে তারা তাকে বুঝাতে সক্ষম হয় এবং ফারুক নীরবে হেলিকপ্টারে এসে বসে। সৈন্যদের হতোদ্যম করে রক্তপাত এড়ানোর নামে ফারুক তাদেরকে ফেলে চলে আসে। এভাবেই ক্যাভালরি আর ল্যান্সারের বিদ্রোহের অবসান ঘটে। দু'মাস পর ১৫ই জুলাই, ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়া বেঙ্গল ল্যান্সার ভেঙ্গে দেন। এই বিদ্রোহে ফারুক-রশিদের কিছুই ঘটেনি। অথচ তাদের অনুগত সৈনিকদের বহুসংখ্যক ফাঁসিতে ঝুলেছিলো। আর অনেককে পাঠানো হয়েছিলো জেলে।

জেনারেল জিয়া বিদ্রোহীদের শাস্তিদানের ব্যাপারে যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব করেন। বিদ্রোহের দায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরসেনানী, কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে চড়ানো হলেও তার চেয়ে বেশী পরিমাণ অপরাধে অপরাধী ফারুক, রশিদ আর ডালিমসহ অন্যান্য সহযোগীদের আরামে বিমানে চড়িয়ে দেশত্যাগের সরকারী ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ফারুক আর রশিদ দূতাবাসের চাকুরী নিতে অস্বীকৃতি জানালেও দলের অন্যান্যরা তা সানন্দে গ্রহণ করে।

অন্যদিকে, ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকার ব্যাপারে এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াবের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া না গেলেও তাকে ঐ বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত করানো হয় এবং সেই অভিযোগে তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। বঙ্গভবনে ডেকে জিয়া তার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগের কথা বলেন সেগুলো হচ্ছে—বিদ্রোহীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ, আল-বদরদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকরণ এবং বিমানের একটি ৭০৭ বোয়িং কেনার ব্যাপারে অবৈধভাবে দেড় লাখ ডলার কামানোর অভিযোগ। তোয়াব ঐ সবগুলো অভিযোগ অস্বীকার করলেও ঐ সময়ে ঐখানেই তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। এবং সেদিনই বিকেলে তাকে একটি লন্ডনগামী বিমানে জোর করে তুলে দিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। এইসব অপমান তোয়াব ভুলতে পারেননি।

১৯৭৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জেনারেল জিয়া মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত-এর সঙ্গে পরবর্তী বছর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্য পদের ব্যাপারে আলোচনা ও সমর্থন আদায়ের জন্যে কায়রোতে যান। বাংলাদেশ ঐ পদের জন্যে শক্তিশালী জাপানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা। সেই সময়ে প্রেসিডেন্ট জিয়ার জীবন-মৃত্যুর সমস্যা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিশরীয় প্রেসিডেন্টের অবগতিতে ছিলো। সৌভাগ্যক্রমে, মিশরীয় গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদেরকে

হত্যা করে বামপন্থী একটা দল ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালাবে বলে খবর পেয়ে যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা ২৮ এপ্রিল বিমান বাহিনী দিবসে আঘাতটি হানার পরিকল্পনা করে। জাসদ ও কমিউনিস্ট পার্টির উস্কানীতে ব্যাপারটি পরিচালিত হয় বলে জানা যায়। কায়রো থেকে জিয়া দেশে ফিরবেন ২৭শে সেপ্টেম্বর। পরদিন অর্থাৎ ২৮ তারিখে বিমান বাহিনী দিবস। ঐ দিবসে জিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হবার পরপরই ঘটনাটি ঘটানো হবে বলে পরিকল্পিত তথ্যটি জিয়াকে জানানো হয়।

প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের এই তথ্য শুনে জিয়া ঘাবড়ে যান। এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে মিশরীয় গোয়েন্দা সূত্রটি জানায়, বিপ্লবী সিপাইরা এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জিয়াসহ সকল পদস্থ অফিসারদের গুলি করে হত্যা করবে। মিশরীয় গোয়েন্দা সূত্রটি অবশ্য কোন্ ইউনিট এই ষড়যন্ত্রে জড়িত তা নিশ্চিত করে বলতে পারেনি।

২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জিয়া বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদকে হাতে লিখে একটি ছোট নোট পাঠিয়ে দেন। তিনি ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারছেন না বলে নোটে উল্লেখ করেন। এতে কোন কারণ তিনি দেখাননি। কিংবা সাদাতের সতর্কবাণীর কথাও উল্লেখ করেননি। সম্ভবতঃ জিয়া বিমান বাহিনী প্রধানের আনুগত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না বলেই তিনি তাকে সবকিছু খুলে বলেননি।

শেষ মুহূর্তে জিয়ার অস্বীকৃতিতে বিমান বাহিনী প্রধান বিপদে পড়েন। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিলো যে, প্রেসিডেন্ট কোন কারণে মনক্ষুণ্ন হয়ে এই অনুষ্ঠানে আসতে অসম্মতি জানিয়েছেন। ঐ অবস্থায় মাহমুদ জিয়ার জায়গায় অন্য কাউকে দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপন করবেন, না কি অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত এমন কি ঘটনা ঐদিন ঘটে গেলো যার জন্যে অনুষ্ঠান আপনা-আপনিই মুলতবী হয়ে গেলো।

জাপান এয়ার লাইন্সের একটি ডিসি-৮ বিমান ১৫৬ জন যাত্রী নিয়ে বোম্বে থেকে উড্ডয়নের পরপরই হাইজ্যাক হয়। জাপানী রেড আর্মির হিদাকা কমান্ডো ইউনিটের পাঁচজন হাইজ্যাকার বিমানটি হাইজ্যাক করে ঢাকায় অবতরণ করতে বাধ্য করে। তারা তাদের দলের ৯ জন কর্মীকে জাপানের জেল থেকে মুক্তিদানের দাবী এবং যাত্রীদের-জিম্মী করে তাদের মুক্তিপণ হিসেবে ৬০ লাখ মার্কিন ডলার দাবী করে। মধ্যরাতের মধ্যে তাদের দাবী মানা না হলে তারা একে একে সবগুলো যাত্রীকে খুন করবে বলে হুমকি দেয়।

ঢাকায় এই ধরনের আন্তর্জাতিক ঘটনা আর কোনদিন ঘটেনি। এই ঘটনায় কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত সে জন্যে মন্ত্রীসভার জরুরী বৈঠক ডাকা হয়। মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত মতে বিমান বাহিনী প্রধান এ. জি. মাহমুদ, বিচারপতি সাত্তার (ভাইস প্রেসিডেন্ট) এবং দু'জন ঊর্ধ্বতন বেসামরিক অফিসার নিয়ে কণ্ট্রোল টাওয়ারে চলে যান। সেখান থেকে

হাইজ্যাকারদের সঙ্গে দর কষাকষি করতে থাকেন। এভাবেই বিমান বাহিনী দিবস স্থগিত হয়ে যায়।

২৮শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠান স্থগিত হয়ে যাবার কারণে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের সৈন্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারলো না। দু'দিন পর বগুড়ায় ২২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিপাইরা বিদ্রোহ করে এবং তারা দু'জন নবীন লেফটেন্যান্টকে হত্যা করে। কয়েকজন অফিসারকে আটকও করে তারা।

পরদিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টেও গোলযোগ দেখা যায়। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকেও একই ধরনের উত্তেজনার খবর আসে। জেনারেল জিয়া অবিলম্বে উচ্চপদস্থ সামরিক কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে এক বৈঠকে বসেন। বৈঠকে অস্ত্রভান্ডার ও স্ব স্ব সেনা ইউনিটের প্রতি কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর জিয়া তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ শহরের একটি গোপনীয় নিরাপদ স্থানে চলে যান এবং সেখানেই তিনি তাঁর অস্থায়ী হেড কোয়ার্টার চালু করেন। সম্ভবত ঃ এতেই তাঁর জীবন রক্ষা পায়।

আর্মি ফিল্ড সিগন্যাল ব্যাটেলিয়নের সৈন্যেরা এ বিদ্রোহের আয়োজন করে। ঢাকার সিগন্যাল কমপ্লেক্স এর নেতৃত্ব দেয়। এদের বিদ্রোহ শুরুর সংকেত ছিলো—একটা পটকা বিস্ফোরণ ও পরে একটি রাইফেলের গুলি। সংকেত পাবার পরপরই সৈন্যেরা তাদের ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং তাদের ইউনিটের অস্ত্রভান্ডার লুট করে। আকাশে ফাঁকা গুলি চালাতে চালাতে ওরা 'সিপাহী বিদ্রোহের' নামে শ্লোগান দিতে দিতে একত্রে মিলিত হয়।

সিগন্যালম্যানদের সঙ্গে নিকটবর্তী কুর্মিটোলা এয়ারবেইস থেকে কয়েকশত এয়ারম্যান এসে যোগ দেয়। রাত পৌঁছে তিনটার দিকে ৭০০ আর্মি ও ২৫ ট্রাক ভর্তি বিমান বাহিনীর স্টাফ কেন্দ্রীয় অর্ডন্যান্স ডিপো লুট করে সব অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যায়। হাজার হাজার লিফলেটে সৈন্যদের বিদ্রোহের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়। এর আগের বিদ্রোহের সময়ে জিয়া ছিলো নায়ক' আর এবারের বিদ্রোহে তাকে বিশ্বাসঘাতক' বলে আখ্যায়িত করে তাঁর 'অবসান' চাওয়া হয়।

সকাল ৫টায় ৭টি ট্রাকে ভর্তি হয়ে সৈন্য আর এয়ারম্যানরা রেডিও স্টেশন দখল করে নেয়। তারা বিপ্লবী সরকারের নামে ঘোষণা দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাদের নেতার নাম ঘোষণা করার আগেই নবম ডিভিশনের হেড কোয়ার্টারের নির্দেশে রেডিও ট্রান্সমিশন বন্ধ করে দেয়া হয়। ইতিমধ্যে বিদ্রোহ বিমান বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে এবং নৃশংস আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীরা প্রথমে বিমান বন্দরের হ্যাঙ্গারের সামনে দু'জন বিমান বাহিনীর তরুণ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে। তারপর গ্রুপ ক্যাপ্টেন মাসুদকে বিমান বাহিনী প্রধানের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়। বিমান বাহিনীর প্রধান অলৌকিভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। সেখানে আরো যারা মারা যান তারা হচ্ছেন—গ্রুপ ক্যাপ্টেন

আনসার আহমেদ চৌধুরী, উইং কমান্ডার আনোয়ার শেখ, স্কোয়াড্রন লীডার মতিন, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শওকত জান চৌধুরী এবং সালাহউদ্দিন, ফ্লাইং অফিসার মাহবুবুল আলম এবং আক্তারুজ্জামান এবং তিনজন পাইলট অফিসার এম. এইচ. আনসার, নজরুল ইসলাম এবং শরিফুল ইসলাম। বিদ্রোহীরা স্কোয়াড্রন লীডার সিরাজুল হকের ষোল বছরের ছেলে মোহাম্মদ এনামকেও হত্যা করে। বিদ্রোহীদের নৃশংস হত্যাকান্ডে মুহূর্তের মধ্যে বিমান বাহিনীর উড্ডয়ন ক্ষমতা অর্ধেকে নেমে আসে।

এই বিদ্রোহ মূলতঃ সেনাবাহিনীর সিগন্যাল ও বিমান বাহিনীর এয়ারম্যানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কোন পদাতিক ইউনিট এতে অংশগ্রহণ করেনি। জেনারল জিয়া ৪৬তম পদাতিক ব্রিগেড ও ৯ম ডিভিশনের সাহায্যে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনেন।

জেনারেল জিয়াকে বিদ্রোহীরা খুঁজে পায়নি বলে সেদিন তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। ২রা অক্টোবর সকাল ৮টার দিকে বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে থেমে যায়। কুর্মিটোলা এয়ারবেইস থেকে তিন ট্রাক ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এরই মধ্যে জাপানী সন্ত্রাসীরা হাইজ্যাক করা প্লেনটি নিয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে যায়। যাবার আগে ওরা দুই-তৃতীয়াংশ জিম্মীকে মুক্ত করে দিয়ে যায়। সেদিনই এই বিদ্রোহ দমনে সফলতার জন্যে মিশরের প্রেসিডেন্ট জিয়াকে অভিনন্দন জানান।

প্রেসিডেন্ট জিয়া সহজেই অনুমান করতে পারলেন যে, এখন তাঁর কেবল সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করলেই চলবে না। এজন্যে তাঁর বেসামরিক দিক থেকেও সমর্থনের প্রয়োজন। তিনি প্রথমেই সেনাবাহিনীর মধ্যে কোন্দল এবং বিরোধ সৃষ্টিকারী লোকদের বাছাই করে অত্যন্ত কঠোর হস্তে তাদের উপর চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি ডাইরেক্টর জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স, এয়ার ভাইস মার্শাল ইসলামকে বিদ্রোহের ব্যাপারে তাকে আগে থেকে সতর্ক করতে ব্যর্থ হবার কারণে বরখাস্ত করেন। তারপর তিনি একের পর এক দ্রুতগতিতে বগুড়ার ২২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ঢাকার চারটি সেনা ইউনিটকে বাতিল ঘোষণা করেন।

জেনারেল জিয়া বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকেও বাতিল করার চিন্তা করছিলেন।

এয়ার ভাইস মার্শাল মাহমুদ আমাকে জানিয়েছিলেন যে, দুই মাসেরও বেশী সময় ধরে বিমান বাহিনীর ভাগ্য দোদুল্যমান অবস্থায় কাটে। জিয়া তখন বিমান বাহিনীকে বাতিল করে দিয়ে এটিকে সেনাবাহিনীর একটি অঙ্গ হিসেবে আর্মি এভিয়েশন উইং নামে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন চীফ অব জেনারেল স্টাফ, মেজর জেনারেল মঞ্জুর, জেনারেল জিয়াকে এ ধারণাটি দিয়েছিলেন। ঐ অবস্থায় জিয়া কয়েক সপ্তাহ ধরে বিমান বাহিনীর প্রধান ও তার স্টাফদেরকে ঢাকা বিমান বন্দরের অপারেশনাল এলাকাতেই আসতে দেননি। বিমান বাহিনীর প্রধান ঐ বিদ্রোহের কবর থেকে রক্ষা পাওয়ায় জেনারেল

জিয়া তাকে অবিশ্বাস করতে থাকেন। বিদ্রোহের উপর বিচার বিভাগীয় কমিশন তদন্ত করে মাহমুদকে নির্দোষ প্রমাণ করলেও তিনি জিয়ার অধীনে কাজ করা অসম্ভব বলে মনে করেন। তিনি ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে পদত্যাগ করেন।

জিয়া ঐ সুযোগে তাঁর নিরাপত্তার জন্যে সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কমান্ডে কিছু রদবদল করেন। তিনি জেনারেল মীর শওকত আলীকে যশোরে আর জেনারেল মঞ্জুরকে পাঠিয়ে দেন চট্টগ্রামে। সাড়ে তিন বছর পর সেখানে বসেই জেনারেল মঞ্জুর জিয়া হত্যার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

জেনারেল জিয়া এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত সৈনিক আর এয়ারম্যানদের উপর ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য প্রতিশোধ নিয়ে তাঁর মনে প্রজ্জ্বলিত প্রতিহিংসার আগুন নির্বাপিত করেন। সরকারী হিসেব মতে তিনি ১৯৭৭ সালের ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত মাত্র দু'মাসের মধ্যে ১১৪৩ (এগারশত তেতাল্লিশ) জন সৈনিককে ফাঁসির দড়িতে লটকিয়ে হত্যা করেন। তাছাড়া বহুশত সৈনিককে তিনি দশ বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করে জেলে পাঠিয়ে দেন। আইনগত পদ্ধতি আর ন্যায় বিচারের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে এ শাস্তির কাজ সমাপন করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর চেয়ে চড় পৈশাচিক সাজার আর কোন নজির নেই। তিন/চারজনকে একবারে বিচারের জন্যে ডেকে ফাঁসির দন্ডাদেশ দেয়া হলো। জেনারেল জিয়া বসে বসে সেগুলো অনুমোদন করতেন এবং তার পরপরই তাদেরকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হতো। উল্লিখিত পদ্ধতির সকল কাজই মাত্র ৪৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সম্পন্নকরা হলো। তাঁর সহযোগীদের একজন আমাকে জানিয়েছিলো, জেনারেল জিয়া, প্রেসিডেন্ট আর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দ্বৈত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে তাঁর নিজের হাতে লিখে ঐ সকল হতভাগা সৈনিকদের দন্ডাদেশ অনুমোদন করতেন। বেসামরিক বন্দীরা স্মৃতিচারণ করে বলে, 'কয়েক সপ্তাহ ধরে জেলখানার রাতগুলো সৈনিকদের আর্তচিৎকারে বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছিলো। তাদেরকে ফাঁসির মঞ্চে ঠেলে নিয়ে যাবার সময় তারা নির্দোষ বলে বুকফাটা চিৎকারে ভেঙ্গে পড়তো।

এই সকল হত্যালীলার জন্যে বিমান বাহিনী বা সেনাবাহিনীর কোন প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুনকে মেনে চলা হয়নি। বিধি মোতাবেক, শান্তির সময়ে কেবল জেনারেল কোর্ট মার্শাল মৃত্যুর দন্ডাদেশ প্রদান করতে পারে। জেনারেল কোর্ট মার্শালে কমপক্ষে পাঁচজন মিলিটারী জজ থাকে। এদের মধ্যে একজনকে অন্ততঃপক্ষে লেঃ কর্নেল হতে হবে এবং বাকী চারজনের কেউই ক্যাপ্টেনের নীচে হতে পারবে না এবং কমিশন প্রাপ্তির পর ক্যাপ্টেনদেরকে কমপক্ষে তিন বছর চাকুরী সম্পন্ন করতে হবে। অভিযুক্তদেরকে তাদের আত্মপক্ষ অবলম্বনের জন্যে পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। জেনারেল জিয়া দেখলেন যে, এই সকল নিয়ম-কানুন তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পথে বিরাট অন্তরায়। সেজন্যে একটি 'মার্শাল

ল অর্ডার' ঘোষণা করলেন। ঐ ঘোষণায় বিশেষ আদালতের নামে এমন কোর্ট তিনি সৃষ্টি করলেন, যেগুলোতে বিচারের জন্যে একজন লেঃ কর্নেলের সঙ্গে হাবিলদার ও তার কাছাকাছি পদমর্যাদার লোকেরা বসতে পারতো। দ্রুতগতিতে মামলার কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এভাবেই ব্যবস্থা গৃহীত হলো।

এই উপমহাদেশের কোথাও এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে নজির নেই। এক কলমের খোঁচায় জেনারেল জিয়া রাতারাতি দুই ডজনেরও বেশী এই ধরনের কোর্ট সৃষ্টি করলেন। ন্যায় বিচারের কোন প্রশ্নই সেখানে উঠতে পারে না। বিচারকের লাইসেন্স নিয়ে সৈন্যদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো মাত্র। এমন একটি কোর্টের উদাহরণ নিম্নে বর্ণিত হলো। ঐটির নাম মার্শাল ল ট্রাইব্যুনাল নং—১৮, ঢাকা। কেস নং—১/১৯৭৭, তাং—৮ই অক্টোবর, ১৯৭৭ সাল।

সংশ্লিষ্ট জজদের নাম :

১। লেঃ কর্নেল কাজী সলিমুদ্দীন মোঃ শাহরিয়ার

২। সুবেদার মো আবদুল হালিম

৩। নায়েক সুবেদার আবদুল হাকিম

৪। হাবিলদার আনোয়ার হোসেন

৫। হাবিলদার এম. এফ. আহমেদ ১৯৭৭ সালের ১লা/২রা অক্টোবর রাতে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্তরা ছিলো :

১। ৬২৭৪০২৮ নায়েক এনামুল হক

২। ৬২৮৪৫৪ সিগন্যালার কাজী সাঈদ হোসেন

৩। ৬২৮১১৮৬ নায়েক আবদুল মান্নান

৪। ৬২৮৪৭৩৬ সিগন্যালার এস. কে. জাবেদ আলী

তারা সবাই নিজেদেরকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু তার কোন উপায় ছিলো না।

তিনজন অভিযোগকারী, সুবেদার সিরাজুল ইসলাম, নায়েক আবুল বাশার এবং ল্যান্স নায়েক আবদুল আলী দৌড়ে এসে উপস্থিত হয়ে যায়।

অভিযুক্তদের পক্ষে কোন সাক্ষী, প্রমাণাদি ছিলো না।

একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে দোষী বক্তিদেরকে অস্ত্রাগারে ঢুকে রাইফেল নিয়ে একটি আর্মির গাড়ীতে উঠে চলে যেতে দেখেছে। আর একজন অভিযুক্তদেরকে ব্যারাকের বারান্দায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখেছে। তাদের কেউ 'বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে' বলে চিৎকার করেছিলো।

অভিযুক্তদের একজন বলে সে ব্যারাকের সকলের শেষে ঘুম থেকে জেগেছিলো এবং সে সম্পূর্ণভাবে নিরপরাধ। আর একজন অভিযুক্তকারী বলে যে চিৎকার শুনতে পেয়ে

অন্যান্যদের সঙ্গে অস্ত্রাগার থেকে সেও একটি রাইফেল হাতে নিয়েছিলো। কিন্তু তারপরেই সে দেখতে পায় যে কোথাও কোন রকম যুদ্ধ বেঁধে যায়নি। সুতরাং সে তার অধিনায়কের নির্দেশে পরে অস্ত্র জমা দিয়ে দেয়।

এই সকল সাক্ষী প্রমাণ আর অভিযুক্তদের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বিশেষ সামরিক আদালত চারজনের সবাইকে দোষী বলে সর্বসম্মতিক্রমে রায় দেয় এবং মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেন। পরদিন, ৯ই অক্টোবর, স্বয়ং জেনারেল জিয়া ঐসব মৃত্যুদন্ডাদেশ অনুমোদন করে মন্তব্য দেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা না মরে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের গলায় ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলিয়ে রাখো।' এই চারজন হতভাগাকে ১০ই অক্টোবর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

১৯৭৯ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল পাশা ছুটিতে দেশে ফেরার পথে ইসলামাবাদে যাত্রা বিরতি করে। তিনি তখন আংকারায় বাংলাদেশ দূতাবাসে ফার্স্ট সেক্রেটারী । ইসলামাবাদে বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারী মেজর (অবঃ) হুদার সঙ্গে তার দেখা করার ইচ্ছা। পাশা আবার হুদার বোনকে বিয়ে করার সুবাদে আত্মীয়তার সূত্রেও বাঁধা ছিলো। তারা দু'জনেই ১৯৭৫ সালের আগস্টে শেখ মুজিব আর তাঁর পরিবারকে হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলো। ঐ সময় পিকিং-এ বাংলাদেশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী লেঃ কর্নেল ডালিমও ইসলামাবাদে পৌঁছায়।

আবারো, প্রাক্তন মেজররা ঢাকা থেকে হাজার মাইল দূরে বসে বাংলাদেশ সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনায় লিপ্ত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে তারা পরিকল্পনা স্থির করবে এবং পরে ফারুক ও রশিদ এতে যোগ দেবে। তাদেরকে বার বার ক্ষমতা করে বিদেশে লোভনীয় চাকুরী দেয়া হলেও এতে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। তারা আর এক দফায় ক্ষশতার লোভে লালায়িত হয়ে পড়ে।

পাশা, ডালিম আর হুদা দ্রুত একটি অভিযান পরিকল্পনা তৈরী করে ফেলে। স্থির হয়, তারা একটি রাজনৈতিক দল গঠন করবে যার একটি গোপন সেল থাকবে সামরিক বাহিনীতে। তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্যে গোপন কোড উদ্ভাবন করে। পাশার মতে, সরকার পরিবর্তন করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো না। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো ক্ষমতা দখল করে সবার জন্যে ন্যায় ও সুবিচারের ব্যবস্থা করা। স্পষ্টতঃই তারা চাচ্ছিলো একটি বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু পাশা তার বন্ধুদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে কোন কমিউনিজম বাংলাদেশে চলবে না। ইসলামিক ধাঁচের সমাজতন্ত্র আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। কারণ দেশের অধিকাংশ লোকই মুসলমান এবং ধর্মভীরু।

তারপরেই ষড়যন্ত্রকারীরা ঢাকার দিকে তাদের নজর ফিরায়। তাদের দলে নিয়ে আসে আর্টিলারীর লেঃ কর্ণেল দিদারুল আলম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লেঃ কর্নেল

নূরুন্নবী খানকে। সেনাবাহিনীর জোয়ানদের হতাশাকে কাজে লাগিয়ে তাদের দলে টানার জন্যে দায়িত্ব দেয়া হয় জগন্নাথ কলেজের বামপন্থী ছাত্রনেতা মুনির এবং জাসদ কর্মী ও কৃষি ব্যাংকের ট্রেনিংরত অফিসার মোশাররফ হোসেনকে। ডালিম ও পাশার ইচ্ছে ছিলো তাদের মাধ্যমে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনও তারা আদায়ের চেষ্টা করবে। এ সময়ে ডালিম আর পাশা জাসদ এবং সর্বহারা পার্টির কয়েকজন নেতার সঙ্গেও দেখা করে।

পরিকল্পনার প্রাথমিক অগ্রগতিতে সন্তোষজনক ফল পেয়ে ডালিম ও পাশা তাদের কর্মস্থলে ফিরে আসার আগে তারা তাদের বামপন্থী বন্ধুদেরকে কিছু পরিমাণ অর্থ দিয়ে আসে যাতে করে তারা তাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়াও তারা তাদেরকে একটি প্রেস বা বাস কেনার অর্থ পাঠাবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রেস দেয়ার উদ্দেশ্য ছিলো বিপ্লব সংক্রান্ত কাগজপত্র ও লিফলেট ছাপিয়ে তা জনসমর্থনের জন্যে কাজে লাগানো এবং বাসের আয় দিয়ে গোপন কর্মকান্ড চালানো ।

১৯৭৯ সালের ২৬ থেকে ২৯শে ডিসেম্বরের মধ্যে 'ঘাতকদল' তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ও বাংলাদেশে পরিচালিত কাজের জন্যে অর্থ যোগানোর উদ্দেশ্যে আংকারায় মিলিত হয়। পাশা আংকারায় কর্মরত। তার সঙ্গে যোগ দেয় লিবিয়া থেকে রশিদ, ইসলামাবাদ থেকে হুদা আর তেহরান থেকে নূর। কিন্তু ডালিম আর শাহরিয়ার অনিবার্য কারণবশতঃ যোগদান করতে পারেনি। তাছাড়া, ফারুক জানুয়ারী/১৯৭৭-এ একক প্রচেষ্টায় সরকার উৎখাতের প্রচেষ্টা চালানের দায়ে তখন পাঁচ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হয়ে জেলে ছিলো।

পাশার মতে, রশিদ তার এক লিবিয় বন্ধুর সহযোগিতায় ষড়যন্ত্রকারী দলকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এ কথাটি দিদারুল আলম এবং শাহরিয়ারকে জানিয়ে দেয়া হয় যাতে ষড়যন্ত্রের কাজ এগিয়ে নিতে ওরা অনুপ্রেরণা পায়। আংকারায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, মেজর জেনারেল (অবঃ) মামুন ব্যাপারটি বুঝে ফেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাটি পররাষ্ট্র দফতরকে জানিয়ে দেন। ওদিক থেকে এই ঘটনা প্রবাহের উপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ পান জেনারেল মামুন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, পাশাও জেনারেল মামুনের কর্মকাণ্ডের বিষয় জেনে ফেলে। তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে পাশা রাষ্ট্রদূতকে অপদস্থ করে। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার এই যে, পাশার অতটা বেয়াদবির পরেও সে আংকারাতেই থেকে যায়। পররাষ্ট্র দফতর তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। তার ঠিক ৫ মাস পরেই পাশা আংকারাতে আরেকটি বৈঠকের আয়োজন করে।

বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ২৭শে মে, ১৯৮০ সালে। এই সময়ে ডালিম, শাহরিয়ার আর হুদা বৈঠকে উপস্থিত থাকে। রশিদ কোন কারণে আসতে পারেনি। তার জায়গায় আসে

ফারুক। ফারুককে কিছুদিন আগে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে লিবিয়ায় প্রবাসে পাঠানো হয়। দ্বিতীয় বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য ছিলো, বাংলাদেশে পরিচালিত কর্মকান্ড সম্বন্ধে দলের সকলকে অবহিত রাখা। দিদারুল আলম আর তার দল জুন মাসেই অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফেলার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলো। সে ভয় পাচ্ছিলো যে, তাদের গোপন সংস্থার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে গোপনীয়তা বেশীদিন রক্ষা করা যাবে না। কারণ, ততক্ষণে তাদের গোপন সংস্থা বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

ষড়যন্ত্রকারী দলটি জানতে পারেনি যে, ইতিমধ্যেই মিলিটারী গোয়েন্দা বাহিনী তাদের ব্যাপারটির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে চলছিলো। সেনাবাহিনীর কর্মরত জোয়ান আর এনসিওদের বিপথগামী করার প্রচেষ্টার সময়ে তারা নিজেরাই ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় মেতে উঠে। লেঃ কর্নেল দিদারুল আলমের বিচারের শুনানী থেকে জানা যায়, প্রবাসী মেজরদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকালে কর্নেল দিদার কিছুসংখ্যক জাসদ নেতার সান্নিধ্যে এসে সশস্ত্র বাহিনীর ভেতরে গোপন বিপ্লবী সেল সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। দিদারুল আলম ও তার দল সিদ্ধান্ত নেয়, ১৯৮০ সালের ১৭ই জুন তারা আর্টিলারীর ইউনিটগুলো আর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করবে। প্রথমেই তারা মেসের এবং বাসার অফিসারদের বন্দী করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। জেনারেল জিয়া তখন বিদেশ সফরে। সুতরাং তারা সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান জেনারেল এরশাদকে হত্যা করে রেডিও স্টেশন দখল করবে বলে মনস্থ করে। অন্য কোন দিক থেকে প্রতিরোধ আসলে তা তারা আর্টিলারী আর পদাতিক বাহিনীর শক্তি দিয়ে প্রতিহত করবে বলে স্থির করে। এরপর তারা একটি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করবে এবং ঐ বিপ্লবী কাউন্সিল দিয়ে দেশ পরিচালনা করা হবে। আর ১৯৭৫-এর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সিপাহী বিদ্রোহের অসম্পূর্ণ দাবীগুলো বাস্তবায়িত করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কাগজে-পত্রে এটি একটি সুপরিকল্পিত প্লান অব এ্যাকশন বলে মনে হলেও আসলে তা অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ লোকদের নিয়ে গঠিত দলের একটি অসীমিত প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। কারণ, তারা কি করছে, তা তারা অনুধবান করতে পারেনি। জোয়ানরা একে অন্যকে বলাবলি করছিলো। 'চলো বিপ্লব করি। ভাবখানা এমন যেন তারা কোন একটা বনভোজনের প্রস্তাব করছে।' মে মাসের শেষের দিকে কর্ণেল দিদার কাজী মুনিরকে জানায় ঃ সৈন্যরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

২৬শে মে একজন গোয়েন্দা নন-কমিশন্ড অফিসার ষড়যন্ত্রকারীদের বিলি করা একটি প্রচারপত্র আটক করলে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ে। জোয়ানরা যখন বুঝতে পারে যে, তাদের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেছে তখন তারা কর্নেল দিদারকে পরিকল্পিত বিপ্লবের দিন এগিয়ে আনতে অনুরোধ করে। কিন্তু দিদারুল আলম তার মন স্থির করতে পারছিলো না। সম্ভবতঃ সে আরো একবার ভেবে নিচ্ছিলো। দিদার এক পর্যায়ে তার লোকদেরকে

আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলে। অন্য এক সময়ে বলে যে, 'এই সময়ে বিপ্লব সম্ভব নয়।' কারণ জাসদের মধ্যে যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে দেশের শাসনভার চালানো খুব কষ্টকর হয়ে পড়বে। এই কথা শুনে একজন সৈন্য ক্ষেপে গিয়ে বলে, 'লাইবেরিয়ায় যদি ক'জন সার্জেন্ট দেশ পরিচালনা করতে পারে, তাহলে একজন লেঃ কর্ণেল বাংলাদেশ চালাতে পারবে না কেন?' দিদার কোন জবাব দেয়নি। জোয়ানেরা ১৭ই জুন আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। অফিসাররা রাজী না হলে, সৈন্যেরা পালিয়ে যায়। দিদার ভারতে পালিয়ে যায়। ১৯৮০ সালের ১১ই নভেম্বর বাংলাদেশে ফেরার পর কুষ্টিয়ার এ্যামব্যাসেডর হোটেলে সে গ্রেফতার হয়। পাশাকে আংকারা থেকে আলোচনা করার জন্যে ঢাকায় ডেকে পাঠানো হয়। ১৮ই নভেম্বর ঢাকায় এলে পাশাকে তৎক্ষণাৎ আটক করা হয়। বাকীদেরকেও কিছুদিনের মধ্যেই আটক করা হয়।

সেনাবাহিনীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং ষড়যন্ত্র করে সরকারের ক্ষমতা দখলের অভিযোগের প্রথমে পাঁচজনকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৯৮১ সালের ১০ই মার্চ মাত্র তিনজনকে বিচারের জন্যে সামরিক আদালতে হাজির করা হয়। তারা হচ্ছে ঃ লেঃ কর্নেল দিদারুল আলম, লেঃ কর্ণেল নূরুন্নবী খান আর কৃষি ব্যাংকের প্রশিক্ষণার্থী অফিসার মোশাররফ হোসেন। কর্ণেল পাশা আর ছাত্রনেতা মুনির হোসেন সমস্ত দোষ স্বীকার করে রাজসাক্ষীতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ষড়যন্ত্রের গোড়ায় থেকেও পাশা তার সঙ্গীদের ফাঁসিয়ে দেয়। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সরকারী কৌঁসুলী অভিযুক্তদের জন্যে সর্বোচ্চ শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড প্রদানের সুপারিশ করেন। কিন্তু ২০শে মে বিচার শেষে রায়ে দেখা যায় যে, দিদারুল আলমের ১০ বছর কারাদণ্ড, মোশাররফ হোসেন দু'বছর কারাদণ্ড এবং নূরুন্নবী খান এক বছর কারাদণ্ড পায়। কাজী মুনির হোসেনকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। আর 'ঘাতক মেজর' পাশা তার চাকুরীস্থল আংকারায় সসম্মানে ফিরে যায়, যেন কিছুই ঘটেনি। এই ছিলো জেনারেল জিয়ার খামখেয়ালির ধরন। তিনি তার মাত্র নয়দিন পরেই অন্য একটি অভ্যুত্থানে নিহত হন।

১৩

জেনারেল জিয়ার হত্যাপর্ব

'কাজটা এখনই করতে হবে। কিভাবে করবে, কি দিয়ে করবে, তা আমি জানি না------।'

—মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর

'ভাগ্যের লিখন, না যায় খন্ডন।' ভাগ্যই জেনারেল জিয়াকে ঘটনার রাতে মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা রাজশাহীতে থাকতে দেয়নি। মরণের অমোঘ নির্দেশেই ছুট যান বন্দর নগরী চট্টগ্রামে।

১৯৮১ সাল। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়া আর তাঁর স্ত্রী খালেদা (ডাক নাম পুতুল) বেলজিয়ামের রাজা বাদুইন এবং তাঁর সুন্দরী স্ত্রী, রাণী ফ্যাবিওলাকে রাষ্ট্রীয় অতিথির পূর্ণ মর্যাদায় বাংলাদেশে স্বাগত জানান। এর আগে বহু রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রী এদেশ সফরে এলেও বাস্তব জীবনের রাজা-রাণী এদেশে খুব কমই এসেছেন। সুতরাং তারা চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে এলে, তাদেরকে পূর্ণ রাজকীয় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বেলজিয়ামের রাজা-রাণী বাংলাদেশে সফর শেষ করে ২৩ তারিখে তাঁরা ঢাকা ত্যাগ করেন। পরদিন জেনারেল জিয়ার জেদ্দা যাবার কথা। ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত শান্তি কমিটির ঐ সভায় ইরান-ইরাক যুদ্ধ নিয়ে একটা সমঝোতায় পৌছানোর উদ্দেশ্যে সংস্থার সদস্য ও সংশ্লিষ্টদের জেদ্দায় মিলিত হবার পরিকল্পনা ছিলো, কমিটির ২৫ তারিখে মিলিত হবার কথা। নির্ধারিত সময়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে, তেহরান আর বাগদাদ ইত্যাদি সফর সমাপন করে দেশে ফিরে আসতে তাঁর এক সপ্তাহের বেশী সময় লেগে যেতো। তাহলে ঐ ২৯ তারিখ বা তার পরেও তাকে দেশের বাইরে অবস্থান করতে হতো। কিন্তু জেদ্দার সম্মেলন অজানা কোন কারণে স্থগিত ঘোষিত হলে, জেনারেল জিয়া তাঁর বিদেশ সফর বাতিল করেন। তার পরিবর্তে তিনি রাজশাহী জেলা পরিদর্শনে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল সাদিকুর রহমান চৌধুরীকে ২৯ তারিখের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু ঐ সফরের পরিকল্পনাও তাকে বাতিল করতে হয়। চট্টগ্রামে তখন

পরিস্থিতি খুবই খারাপ আকার ধারণ করে। তাঁর বিএনপি তখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ঐ দু'ভাগের মধ্যে বিরোধিতা চরমে পৌছে। একটি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দিন আহমেদ আর একটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ডেপুটি স্পীকার সুলতান আহমেদ চৌধুরী। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে চলে যায়, যখন জিয়া অনুভব করলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তাকেই সেখানে যাওয়া উচিত। ২৫শে মে জেনারেল জিয়া তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারীকে তাঁর রাজশাহী সফরসূচী বাতিল করতে নির্দেশ দেন। এর পরিবর্তে ২৯ তারিখে তাঁর চট্টগ্রামে যাবার ব্যবস্থা করতে বলে দেন।

এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো বিপাকে পড়ে। যেদিন জিয়া তাঁর চট্টগ্রাম যাবার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন, সেদিনই তনি চট্টগ্রামের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) মেজর জেনারেল এম, এ, মঞ্জুরকে ঢাকায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের কমান্ডান্ট হিসেবে বদলির আদেশ জারি করেন। জেনারেল মঞ্জুর একজন উচ্চাভিলাষী এবং বেয়াড়া গোছের জেনারেল হিসেবে সুপরিচিত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বকনিষ্ঠ জেনারেল হলেও তার সামাজিক জীবনে এই প্রথমবারের মত সৈন্যদের কমান্ড করা থেকে দূরে সরানোর ব্যবস্থা করা হয়।

জেনারেল মঞ্জুর চট্টগ্রামে জিওসি হিসেবে সাড়ে তিন বছর থাকার পরেও তার বদলিতে তিনি খুশী হতে পারেননি। তারপর ২৯ তারিখে জেনারেল জিয়া পতেঙ্গা বিমান বন্দরে আসলে সেখানে জেনারেল মঞ্জুরকে উপস্থিত থাকতে মানা করে দেয়া হয়। এ নির্দেশটি জেনারেল মঞ্জুরের কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত কাজ করে। স্থানীয় গ্যারিসন কমান্ডার হিসেবে প্রেসিডেন্টের আগমনে উপস্থিত থাকা প্রটোকল ডিউটি হলেও, প্রেসিডেন্টের ঐ সফরকে একটি রাজনৈতিক সফর বলে আখ্যা দিয়ে ঐ রাজনীতির সঙ্গে জিওসিকে না জড়ানোর উদ্দেশ্যেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে মঞ্জুরকে জানানো হয়। কিন্তু মঞ্জুর এ সিদ্ধান্তকে একটি অপমান বলে মনে করেন। আসলে এ ধরনের সিদ্ধান্ত মনে করার কারণও ছিলো। অন্যান্য সামরিক কমান্ডাররা ঠিকই ঐ সময় উপস্থিত থাকছেন। নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার এ্যাডমিরাল এম. এ. খান প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হয়ে আসছেন। আর বিমান বাহিনীর প্রধানও প্রেসিডেন্টকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে পতেঙ্গা বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকছেন। অথচ মঞ্জুরকে আসতে মানা করা হলো। এসব ব্যাপারে মঞ্জুর রেগে একেবারে আগুন হয়ে যান এবং তার এই ক্ষোভকে মনের ভেতর লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেননি। স্বয়ং জেনারেল এবং তার সহকারীরা ঢাকায় প্রেসিডেন্টের মিলিটারী সেক্রেটারীকে বারবার টেলিফোন করে পতেঙ্গা বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্টের সম্বর্ধনা কমিটি থেকে তাকে বাদ দেয়ার কারণ জানতে চাওয়া হচ্ছিলো। শেষে বিরক্ত হয়ে মেজর জেনারেল সাদিকুর রহমান চৌধুরী মঞ্জুরকে বলেন ঃ আপনি কি কিছুই বুঝতে পারছেন না? তিনি (জিয়া) যদি আপনাকে সেখানে দেখতে না চান, তাহলে 'আপনি কেন যেতে চাচ্ছেন?'

মেজর জেনারেল মহব্বত জান চৌধুরী তখন সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর মহাপরিচালক (ডিজিএফআই)। তিনি বারবার জেনারেল জিয়াকে অন্ততঃ ১লা জুন পর্যন্ত তাঁর চট্টগ্রাম সফর স্থগিত রাখার উপদেশ দেন। ঐ তারিখের মধ্যে জেনারেল মঞ্জুরকে ঢাকায় তার নতুন পদে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আমার জানা মতে এনএসআই (ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স) এবং সেনাবাহনীর গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালকও একই সুপারিশ করেছিলো। কিন্তু জিয়া তাদের সকল পরামর্শ উপেক্ষা করেন। তাঁর যাত্রার প্রাক্কালে ডিজিএফআই রাত্রিটি চট্টগ্রামে না কাটিয়ে তাকে ঢাকায় ফিরে আসতে অনুরোধ জানান। কিন্তু সে অনুরোধও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। সম্ভবতঃ জিয়া মনে করেছিলেন যে, তিনি জেনারেল মঞ্জুরকে বশ করতে পারবেন এবং তিনি হয়তো ঐ মেজর জেনারেলকে তাঁর জীবনের প্রতি হুমকি হতে পারেন বলে মনে করেননি। এতবেশী সতর্ক আর সন্দেহপরায়ণ প্রেসিডেন্টের জন্যে এটা ছিলো একটি মারাত্মক ভুল। জীবন দিয়ে তাকে তাঁর সে ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিলো।

জিয়া এবং মঞ্জুর অনেকদিন ধরেই সামরিক জীবনে পাশাপাশি কাজ করে এসেছেন। কিন্তু সম্মান আর সৌভাগ্য সব সময়ই জিয়াকে ঘিরে রেখেছিলো। অথচ, মঞ্জুরকে সব সময়ই তাঁর পেছনে থাকতে হয়েছে। মঞ্জুরের পিতা ছিলেন একজন স্বল্পবিত্ত কেরানী। তিনি তাঁর নিজ জেলা নোয়াখালী ছেড়ে ভারতে অবস্থিত পশ্চিবঙ্গের কৃষ্ণনগরে চলে আসেন। মঞ্জুর সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তার মা মারা যান। তাঁর উচ্চভিলাষী স্ত্রী, তাঁর উপর যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলো। জিয়া হত্যার ব্যাপারে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশন তদন্ত করে জানান যে, মঞ্জুরের ক্ষমতায় আরোহণের ব্যাপারে মিসেস মঞ্জুর 'চালিকা শক্তি' হিসেবে কাজ করেন।

মঞ্জুর সারগোদায় পাকিস্তান এয়ার ফোর্স কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করে কাবুলে অবস্থিত পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে যোগদান করেন। সামরিক বিদ্যায় সেখানে তিনি মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। মাত্র ২০ বছর বয়সে ১৯৬০ সালে তিনি সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হন। তার সামরিক 'ক্যারিয়ার'-এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্বের মাঝে কানাডার 'ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজে'-এ যোগদান ও কৃতিত্বের সঙ্গে বেরিয়ে আসা উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অন্যান্য অনেক বাঙ্গালী অফিসারের মতো জেনারেল মঞ্জুরও পশ্চিম পাকিস্তানে আটকা পড়ে যান। কিন্তু তিনি সৌভাগ্যক্রমে তখন শিয়ালকোটে অবস্থান করছিলেন। শিয়ালকোট ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমারেখার একেবারে কাছাকাছি অবস্থিত। মঞ্জুর তাঁর স্ত্রীর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে পালিয়ে যেতে চেষ্টা চালান। প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয়বারে মঞ্জুর তাঁর পরিবার-

পরিজন সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীর বর্ডার দিয়ে জম্মুতে এসে উপস্থিত হন। বাংলাদেশের ইতিহাসে যাদের নাম খোদিত হয়ে থাকবে, এমন দু'জন অফিসার তার সঙ্গে ছিলো। একজনের নাম লেঃ কর্নেল আবু তাহের। তিনি ১৯৭৫-এর নভেম্বরে সিপাহী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলেন। অন্যজনের নাম লেঃ কর্নেল জিয়াউদ্দিন। তিনি ছিলেন মাওবাদী সর্বহারা পার্টির কিংবদন্তীর নেতা। তিনজনের সকলেই তখন মেজর। মঞ্জুর তাদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উদ্ধত মেজাজের লোক ছিলেন। একজন ভারতীয় সরকারের অফিসার মঞ্জুর এবং তার সঙ্গীদেরকে জম্মুতে অভ্যর্থনা জানায় এবং ট্রেনে তুলে প্রহরার মাধ্যমে তাদেরকে প্রথমে নয়া দিল্লী এবং পরে কলকাতায় নিয়ে যান। ট্রেনে থালায় করে তাদেরকে খাবার পরিবেশন করা হলে, মঞ্জুর যে বদমেজাজের পরিচয় দেন, ঐ অফিসার তার বর্ণনা দেয়। ভারতীয় অফিসারের ভাষায়, দু'রকমের ডাল, কিছু সবজি আর কয়েকটা 'পুরি' সমেত 'নিরামিষ খানা' তাদের জন্যে পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হলো। খাবারগুলো থালায় করে আনা হয়েছিলো। মঞ্জুর থালাগুলো হাতে নিলেন এবং চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তিনি বললেন, "আমরা সামরিক অফিসার। ওসব আজেবাজে জিনিস না দিয়ে, উপযুক্ত খাবার পরিবেশন করতে হবে। আর, ঐ খাবারাদি ছুরি, কাঁটা চামচ ইত্যাদিসহ বাসনে দিতে হবে।" সুতরাং পরের স্টেশনে গাড়ী নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত থেমে থাকতে বাধ্য হয়। যাতে করে রেলওয়ে ক্যাটারার কিছু মুরগীর তরকারী, বাসনপত্র এবং কাটলারীর বন্দোবস্ত করে নেয়।

আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, আমি সে সময়ে মঞ্জুরের সঙ্গী আবু তাহের আর মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিনের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। তিন মেজর কলকাতায় পৌঁছালে, তাদেরকে মুজিবনগর সরকারের সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। মঞ্জুরকে দেয়া হয়েছিলো ৮ নং সেক্টরের (যশোর) দায়িত্ব। স্বাধীনতার পর অতি দ্রুতগতিতে পদোন্নতি পেয়ে মেজর থেকে ব্রিগেডিয়ার হলে, তাকে বাংলাদেশ হাই কমিশনারের সামরিক উপদেষ্টা করে নয়া দিল্লীতে পাঠানো হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের পর আবু তাহের গ্রেফতার হলে, মঞ্জুর খ্যাতিমান হয়ে উঠতে থাকেন। ১৯৭৫-এর নভেম্বরে চীফ অব জেনারেল স্টাফ হবার জন্যে জিয়া তাকে ঢাকায় ডেকে পাঠান। ঐ সময় তাঁদের দু'জনের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। জিয়া তাকে বিশ্বাসও করতেন অনেক বেশী। সেজন্যেই অত্যন্ত নাজুক পদটি দেয়ার জেন্যে জিয়া মঞ্জুরকে দিল্লী থেকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু এরপরও মঞ্জুর একটি উচ্চাভিলাষের বীজ তাঁর মনের এক কোণে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

১৯৭৭ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহের পরে, জেনারেল জিয়া সেনাবাহিনীতে বিরাট রদবদল/পুনর্গঠন করেন। চীফ অব জেনারেল স্টাফ হিসেবে মঞ্জুর

ঐ রদবদল/পুনর্গঠন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। কিন্তু তারপরে, উর্ধ্বতন সেনাবাহিনী কমান্ডে রদবদলের এ পর্যায়ে দেখতে পান যে, মঞ্জুর নিজেই অন্যত্র বদলি হয়ে গেছেন। তাকে চট্টগ্রামের এরিয়া কমান্ডার এবং চট্টগ্রামস্থ ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) করে বদলি করা হয়। তাঁর বুঝতে বাকী রইলো না যে, তাকে সেনাবাহিনীর ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। ঢাকাস্থ ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের কমান্ডান্ট করে তাকে ঢাকায় রাখার জন্যে তিনি জেনারেল জিয়াকে অনুরোধ করেন। কিন্তু জিয়া তাঁর অনুরোধ রাখেননি। তাতে মঞ্জুর খোলাখুলিভাবে জিয়ার প্রতি তার ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। জেনারেল জিয়া বিদায়ী চীফ অব জেনারেল স্টাফের সম্মানে এক বিদায়ী ভোজসভার আয়োজন করেন। ঐ ভোজসভায় মঞ্জুর ও তার স্ত্রী অনুপস্থিত থেকে তাঁর ক্ষোভের প্রকাশ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটান। (সাড়ে তিন বছর পরে জিয়া তাকে ঐ পদে নিয়োগ করলে, মঞ্জুর অত্যন্ত ক্ষেপে যান, যার ফলশ্রুতিতে জিয়ার মৃত্যু ঘটে।)

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার সুযোগ নিয়ে মঞ্জুর ঐ এলাকায় এক ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন নতুন ইউনিট গঠন, অধিকতর অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়করণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি ঐ এলাকায় ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর সবচেয়ে মেধাবী ও চৌকশ তরুণ অফিসারদের তাঁর অধীনে নিয়ে আসেন। এক সময়ে মঞ্জুর যুক্তিসঙ্গতভাবেই গর্ব করতে পারতেন যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশকে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ কমান্ডে রেখেছেন। তাছাড়া, ঐ সময়ে সেনাবাহিনীর সবচেয়ে সুদক্ষ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্রিগেড কমান্ডার আর স্টাফ অফিসারেরা তাঁর অধীনে ছিলো। তাদের মধ্যে মঞ্জুরের সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসভাজন অফিসার ছিলো দু'জন। একজন হচ্ছে লেঃ কর্ণেল মতিউর রহমান, জিএসও-১ বা, প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার। আর একজন হচ্ছে, লেঃ কর্ণেল মাহবুবুর রহমান। মাহবুব মঞ্জুরের ভাগ্নে এবং ২১তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার। ওরা প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং ঢাকার পদস্থ সামরিক অফিসারদের অত্যন্ত অপছন্দ করতো। ওরা আবার উভয়েই মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ওরা ৬ নম্বর সেক্টর থেকে যুদ্ধ করেছে। তাদের ধারণা প্রেসিডেন্ট জিয়া আর উচ্চপদস্থ সামরিক কর্তাব্যক্তিদের কারণেই দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির করুণ অবস্থা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে তারা জেনারেল মঞ্জুরকে শ্রদ্ধা করতো এবং তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বাস করতো। ফারুক আর রশিদ যেমন দেশ স্বাধীনের পর মনে করতো দেশের জন্যে একটা পরিবর্তন দরকার, ঠিক তেমনি মতি আর মাহবুবও দেশের স্বার্থে জিয়া এবং তাঁর অধীনস্থ সামরিক অফিসারদের অপসারণ কামনা করছিলো। তারা এ ব্যাপারে জেনারেল মঞ্জুরের কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন সমর্থনও পেয়েছিলো।

কখন তাদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিলো তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও, মতি আর মাহবুব স্পষ্টতঃই ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সক্রিয়ভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের আর এক সহযোদ্ধা, লেঃ কর্নেল দেলোয়ার হোসেন চট্টগ্রাম রেঞ্জে যোগ দিলে ষড়যন্ত্রটি আরো ত্বরান্বিত হয়। মাহবুব তখন দিঘীনালায়, মতি রাঙ্গামাটিতে এবং দেলোয়ার চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টস্থ অর্ডন্যান্স সার্ভিসের সহকারী পরিচালক। মতি চট্টগ্রামে দেলোয়ারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে একত্রে বসে 'লাঞ্চ' খাবার সময়ে দু'জনের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয়। মতি তার সাথে বিএনপি সরকারের ব্যর্থতা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, সামাজিক ন্যায় বিচারের অভাব, দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। মতি জানায়, এ সকল ব্যাপারাদি নিয়ে জেনারেল মঞ্জুরের সঙ্গেও তার কথা হয়েছে। জেনারেল তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন বলে জানানো হয়। মতি আরো জানায়, 'সমমনা অফিসারদের এক সমন্বিত প্রচেষ্টায় এ সকল সমস্যার চিরতরে সমাধান প্রয়োজন।' দেলোয়ার অর্ডন্যান্স অফিসার হিসেবে তার সীমাবদ্ধতার কথা জানালো, মতি রেগে গিয়ে বলে, এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আসল ব্যাপার হচ্ছে তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে।

মতি আর মাহবুব ৬৯ পদাতিক ব্রিগেড-এর ব্রিগেড মেজর এস, এম, খালিদকেও তাদের দলে ভিড়ায়। মঞ্জুরের পৃষ্ঠপোষকতায় এই চারজনেই বিদ্রোহের মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়, যার পরিণতিতে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হয়।

জুনিয়র অফিসারদের বুঝিয়ে দলে ভিড়ানোর জন্যে তারা প্রচারণা শুরু করে দেয়। মেজর থেকে আরম্ভ করে জেসিও এবং এনসিও পর্যন্ত অফিসারদের বুঝানোর দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর খালিদকে। মঞ্জুর, মতি আর মাহবুব নেন উপরস্থদের দায়িত্ব। মাহবুব লিফলেট ইত্যাদি প্রচারপত্র ছাপার জন্যে একটি ছোট প্রেস কেনার চিন্তা করে। কিন্তু দাম বেশী বলে সে তার ধারণাটি পরে বাদ দেয়। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি জেনারেল মঞ্জুরের সরকারী বাসভবন, ফ্ল্যাগ, স্টাফ হাউস সকল শ্রেণীর অফিসারের জন্যে খুলে দেন। বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু জুনিয়র অফিসার, এমনকি এনসিও পর্যন্ত আমন্ত্রণ পায়। ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল এবং কমান্ডিং অফিসারদের পক্ষকালের মধ্যে একবার করে তাস খেলা, চা খাওয়া কিংবা একটু-আধটু গল্প-সল্প করার জন্যে নিয়ে আসা হতো। এ ধরনের মাখামাখির উদ্দেশ্য ছিলো, যতদূর সম্ভব বেশী সংখ্যক অফিসারদেরকে প্রভাবান্বিত করে তাদের মতাদর্শ সকল দিকে ছড়িয়ে দিয়ে, বিপ্লবের মুহূর্তকে এগিয়ে নিয়ে আসা।

মঞ্জুর বেসামরিক লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে 'টেন্ড সেন্টারস্' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন। জিয়াউর রহমান নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন

ছাত্রকে দিয়ে এর গোড়াপত্তন করা হয়। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিলো জনগণকে 'শিক্ষিত করে তোলা' অর্থাৎ সমস্যাদির প্রতি তাদের চোখ খুলে দেয়া। জেনারেল মঞ্জুর হলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এ সবকিছুই সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার নজরে ছিলো। কিন্তু মঞ্জুরও কম গেলেন না। তিনি গোয়েন্দা সংস্থার চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল আবু লায়েস চৌধুরীকে ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ঢুকতে বারণ করে দেন। তিনি নীরবে সেখানকার ডিভিশনাল ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং এর কমান্ডিং অফিসারকে তাঁর দলে ভিড়াতে সক্ষম হন।

জিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রথম পরিকল্পনাটি করা হয় ১৯৮০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর। সেই দিন বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীতে একদল নতুন রিক্রুট অফিসারের 'পাসিং আউট প্যারেড' অনুষ্ঠিত হবে। জেনারেল জিয়াসহ বহু উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা এবং বেশ কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা। পরিকল্পনা অনুযায়ী, জেনারেল মঞ্জুর জিওসি হিসেবে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টার (ইবিআরসি) মেসে এক নৈশভোজে অতিথিদের আপ্যায়ন করবেন। সেখানেই তাদের সকলকে গ্রেফতার করা হবে। বিকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী, একটি দল সার্কিট হাউসে গিয়ে জেনারেল জিয়াকে গ্রেফতার করবে। আর একটি দল বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টার মেসে গিয়ে সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করবে। পরে তাদের সকলকে প্যাডের গ্রাউন্ডে এনে হত্যা করা হবে। এই পরিকল্পনার জন্যে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিলো। এই রেজিমেন্ট তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলো। মঞ্জুর এটিকে ১৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে চট্টগ্রামে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন। কিন্তু ঐ রেজিমেন্ট নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। কারণ ৬৫তম ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার, কর্নেল রশিদ এত অল্প সময়ের নোটিশে এর অপারেশনাল এরিয়া থেকে রেজিমেন্টকে উঠিয়ে নিতে রাজী হননি। সুতরাং, পুরো পরিকল্পনাটিই শেষে বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু নির্ধারিত নৈশভোজের সময় একটি ব্যাপার নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ব্রিগেড মেজরসহ আরো কয়েকজন অফিসার নৈশভোজে তাদের পিস্তলসহ যোগ দেয়। প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে এভাবে অস্ত্র বহন করা বেআইনী। এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা জানায় যে জিওসি'র নির্দেশে তারা অস্ত্রসহ অনুষ্ঠানে এসেছে। কারণ জিওসি মনে করেন, প্রেসিডেন্টের জীবনের উপর হামলা হতে পারে না। প্রটোকল ও নিরাপত্তা বিষয়ে এ ধরনের রীতি বহির্ভূত ও অমার্জনীয় কার্যকলাপে জিয়া খুব ক্ষেপে উঠেন। অবশ্য পরে তিনি অফিসারদের তাদের পিস্তল জমা রেখে নৈশভোজে যোগ দেয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ষড়যন্ত্রকারীরা দ্বিতীয়বার চেষ্টা চালায়। তখন 'এক্সারসাইজ আয়রণশিল্ড' নামে কক্সবাজারের জনপ্রিয় সমুদ্র সৈকতে একটি সামরিক

মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। সেই মহড়ায় জেনারেল জিয়াসহ তিন বাহিনীর প্রধান, সকল ফরমেশন কমান্ডার, প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসাররা এবং বেসামরিক দিক থেকে প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান ও কয়েকজন মন্ত্রীবর্গের উপস্থিত থাকার কথা। ২৭ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে এই মহড়া পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। সে সময়ে ২৪ পদাতিক ডিভিশনকেও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হবে। এই সুযোগে নিজেদের মারাত্মক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ষড়যন্ত্রকারীরাও নিজেদের অস্ত্র সঙ্গে রাখার মওকা পেয়ে যাবে। কর্নেল মতি, কর্নেল মাহবুব আর মেজর খালিদ অন্যান্যদেরকে তাদের পরিকল্পনার কথা ব্যাখ্যা করে বলে যে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জেনারেল জিয়া আর উপরস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণকে লাঞ্চের সময় আটক করে ৬ দফা দাবী পেশ করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঐ দাবীগুলো মেনে না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে জিম্মী হিসেবে আটক রাখা হবে। দাবীগুলো হচ্ছে ঃ (১) সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল এরশাদ, নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী, মেজর জেনারেল আমজাদ, মেজর জেনারেল আমিন এবং আরো কিছু উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারকে বরখাস্ত করতে হবে। (২) শাসনতন্ত্র বাতিল করে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করে দেশ চালাতে হবে। (৩) তিন বছর ধরে কোন নির্বাচন বা রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলতে দেয়া যাবে না। (৪) সামরিক উচ্চতর পদে প্রমোশনের একমাত্র মাপকাঠি হবে যোগ্যতা। (৫) আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন । (৬) সকলের জন্যে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার ও জোয়ানদের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা দূর করতে হবে।

. জেনারেল জিয়াকে হত্যার ব্যাপারে পরিকল্পনায় কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের ভেতরকার দলটির উদ্দেশ্য ছিলো প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং পদস্থ কর্তাব্যক্তিদেরকে হত্যা করা। আর তাঁর সঙ্গীদেরকে আটক করে দাবী আদায়ের ব্যাপারে সকলের সমর্থন থাকলেও তাঁদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে অনেক অফিসারই রাজী হয়নি। তারা সকলেই তখন জেনারেল মঞ্জুরের কাছ থেকে গুলি করার সংকেতের অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু জেনারেল তাদেরকে সে সংকেত প্রদান করেননি। সম্ভবতঃ তিনি শেষ মুহূর্তে তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে ফেলেন। কারণ, ঐ রকম একটা ব্যাপক হত্যাকান্ড চালানো হলে জনমত তাঁর বিরুদ্ধে চলে যাবে বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়া, এতে কোন কৃতিত্ব আছে বলে তিনি মনে করেননি।

জেনারেল জিয়াকে হত্যা করার তৃতীয় প্রচেষ্টাটি চালানো হয় ১০ই মে, ১৯৮১ সালে। অর্থাৎ তার মৃত্যুর মাত্র ২০ দিন আগে। মারকাস ফ্রান্ডার মতে, চট্টগ্রামে একটি 'ড্রাইডক' উদ্বোধনকালে যে সুইচ টিপে তিনি উদ্বোধনী ঘোষণা দেবেন তার ভেতরে বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া যায়। একজন উর্ধ্বতন সামরিক অফিসার এমন কিছু একটা

ঘটেছিলো বলে স্বীকার করলেও বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। কিংবা কাউকে সন্দেহ করা হয়েছিলো কি-না তাও জানানো হয়নি।

বিদেশে একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কোর্সে ইন্টারভিউ দেয়ার জন্যে কর্ণেল মতি ১৯৮১ সালের ২৫শে মে ঢাকায় আসে। দু'বছর ধরে মতি অন্যান্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকলেও পরপর কয়েকবার তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সে অনেকটা উদ্যমহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং এসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। চলে যাবার সম্ভাবনাও ছিলো তার অনেক বেশী। কিন্তু ভাগ্য আবারো জিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করলো। রাজধানীতে অবস্থানকালে মতি তার পুরনো বন্ধু লেঃ কর্নেল মাহফুজের সঙ্গে দেখা করতে যায়। মাহফুজ তখন জিয়ার প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার/সেক্রেটারী। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ওরা গাল-গল্পে মেতে উঠে। গাল-গল্পের এক পর্যায়ে মাহফুজ এমন এক গোপন তথ্য মতিকে জানিয়ে দেয় যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের ইতিহাসকে পাল্টে দেয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়া মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে চট্টগ্রাম থেকে বদলি করে সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের কমান্ডান্ট করে ঢাকায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এ ধরনের বদলির সংবাদ সাধারণতঃ তা কার্যকর করার পূর্ব পর্যন্ত গোপন রাখা হলেও মাহফুজ তা চুপিসারে মতির কানে তুলে দেয়। মাহফুজেরও খানিকটা ইচ্ছা ছিলো এ ব্যাপারে মঞ্জুরকে সতর্ক করার। খবরটি মতির মনে জেদ ধরিয়ে দেয় এবং কিছু একটা করার জন্যে সে মরিয়া হয়ে উঠে। যখন মাহফুজ মতিকে জানায় যে, ২৯ তারিখে জিয়া চট্টগ্রাম সফরে যাবেন বলে ঠিক করেছেন, ঠিক তখনই তাকে হত্যা করার তাঁর একটি পরিকল্পনা তার মাথায় চলে আসে।

পরে জিয়া হত্যা সংক্রান্ত সাক্ষ্য প্রমাণে জানা যায় যে, মতি আর মাহফুজ ঐ দিন জিয়া হত্যার পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করে। মাহফুজের সহায়তায় মতি ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গভবন পরিদর্শন করে এবং সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখে। বঙ্গভবনের ভেতরে হেলিকপ্টার অবতরণের 'হেলিপ্যাড' ও মতি পরিদর্শন করে। পরের দিন চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে মতি কর্নেল দেলোয়ার আর মেজর খালিদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। মতি তাদের জানায়, জেনারেল মঞ্জুরকে বদলি করা হয়েছে এবং জিয়া ২৯ তারিখে চট্টগ্রামে আসছে। মতি তাদেরকে বলে, জিয়া চট্টগ্রামে এলে তিনি এখানকার সার্কিট হাউসে উঠবেন। সার্কিট হাউসে হামলা চালিয়ে সেখান থেকে জিয়াকে গ্রেফতার করতে হবে। বন্দী অবস্থায় জিয়াকে হেলিকপ্টারে উঠিয়ে ঢাকায় বঙ্গভবনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এরশাদ, নবম ডিভিশনের জিওসি জেনারেল মীর শওকত আলী এবং অন্যান্য সকল প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ

অফিসারদের সেখানে হাজির করা হবে। তারপর তাদের সকলকে সেখানে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে অথবা তাদের সকলকে হত্যা করা হবে। মতি খালিদকে জানায়, এ কাজের জন্যে আমাদের মাত্র তিরিশ জন অফিসার প্রয়োজন। আমি বেশ ভাল করেই বঙ্গভবন দেখে এসেছি। আমি বলছি, এটা করা সম্ভব। এ কাজে সহযোগিতা করতে পারে এমন ২০ জন অফিসারের নাম খালিদ এক নিঃশ্বাসে তার আঙ্গুলের উপর গুণে ফেলে। কিন্তু পরক্ষণেই তারা এ পরিককল্পনা বাদ দেয়। সে অন্যান্যদের বলে, 'এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এভাবে এটা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়?'

তারা তিনজনে মিলে বিষয়টি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করে। তারা একটা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পারলেও অতি শিগগিরই কিছু একটা যে করতে হবে, সে ব্যাপারে তারা একমত পোষণ করে। তারা মনে করে, জেনারেল মঞ্জুর চট্টগ্রাম থেকে অন্যত্র বদলি হয়ে চলে গেলে, তাদের হাতে এ ধরনের সুযোগ আর নাও আসতে পারে। জিয়াকে হত্যা করতেই হবে। এবং ২৯ তারিখে জিয়া চট্টগ্রামে বেড়াতে এলেই তা সমাধা করতে হবে। আঘাত হানার ব্যাপারে ষড়যন্ত্রকারীদের একটা বড় সুযোগও ছিলো। তখন চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে নৈশকালীন প্রশিক্ষণ চলছে। কাজেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে হানাদার দল সার্কিট হাউসের দিকে গেলে তা কারুর নজরে পড়বে না। তখন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১, ৬, ১১ ও ২১-এ চারটি ব্যাটালিয়ন ঐ এলাকায় অবস্থানরত ছিলো।

এ ছাড়াও ৬ ইস্ট বেঙ্গলকে 'এক্সারসাইজ আয়রণশিল্ডে' অংশগ্রহণ করার জন্যে চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয়েছিলো। আরো একটা সুবিধে ছিলো এ কারণে যে, ২৪ পদাতিক ডিভিশনে দু'জনকে বাদ দিয়ে বাকী সবাই ছিলো মুক্তিযোদ্ধা। পদাতিক ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসারগণ আর তাদের সহকর্মীগণও ছিলো মুক্তিযোদ্ধা। ষড়যন্ত্রকারীদের ধারণা ছিলো, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সর্বাত্মক সহযোগিতা পাবে। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে এ পরিকল্পনায় জড়িত করার মানসে মতি চালাকি করে একটি গুজব রটিয়ে দেয়। গুজবে বলা হয়, মতি ঢাকায় গিয়ে জানতে পেরেছে যে, চট্টগ্রামের সকল মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বিরুদ্ধে একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্র চলছে। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বাছাই করে, একে একে সবাইকে খতম করে দেয়া হবে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ গুজবকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্যে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের একটি লিস্ট দেখানো হয়। ঐ লিস্টে তারকা চিহ্নিত অফিসারদের খতম করা হবে বলে সে জানায়। শ্রোতাদের একজন ছিলো, ৬৫ পদাতিক ডিভিশনের ব্রিগেড মেজর আবদুল কাইয়ুম খান। সে এসব শুনে এতই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করে সে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের আসন্ন চক্রান্তটি সম্বন্ধে জানিয়ে দেয়। ২৮ তারিখের মধ্যে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে গুজবটি সকলের মুখে মুখে উঠে যায়। জেনারেল মঞ্জুরকে ঢাকায় বদলি করা হয়েছে জেনে গুজবটি সকলের

মনে দাগ কাটে। এরপর তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অন্যান্যদেরকে তাদের দলে ভিড়াতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি।

সেদিন পতেঙ্গা বিমান বন্দরে জেনারেল জিয়ার আগমন উপলক্ষে জেনারেল মঞ্জুরকে উপস্থিত থাকতে নিষেধ করা হয়েছে জানতে পেরে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে এক সাংঘাতিক উত্তেজনা দেখা দেয়। মতি দেরি না করে ঢাকায় প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিবকে টেলিফোন করে। ঘটনা সত্যি বলে জানতে পেরে ষড়যন্ত্রকারীরা ঘাবড়ে যায়। তারা মনে করে যে, নিশ্চয়ই তাদের চক্রান্ত ইতিমধ্যেই ফাঁস হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের উপরে আঘাত আসার আগেই, তারা জিয়ার উপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়।

সম্ভবতঃ ২৯শে মে মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরের জীবনে সবচেয়ে বেশী যন্ত্রণার দিন ছিলো। সেদিন সকালে প্রেসিডেন্ট জিয়া ঢাকা থেকে পতেঙ্গা বিমান বন্দরে এসে অবতরণ করেছেন। বিমান বাহিনীর প্রধান চট্টগ্রামের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছেন। নৌবাহিনীর প্রধানও সেখানে আছেন। তিনি জিয়ার সঙ্গে একই বিমানে চড়ে এসেছেন। মঞ্জুরকে অভ্যর্থনা থেকে বাদ দিয়ে প্রকাশ্যভাবে কেবল অপমানই করা হয়নি, একই সঙ্গে তাকে অবিলম্বে ঢাকার কর্মস্থলে যোগদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্যেও নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। ১লা জুনের মধ্যেই তাকে ঢাকায় যোগদান করতে হবে। সেদিন থেকে তিনি একজন সম্মানিত কলেজ প্রিন্সিপ্যাল। তাছাড়া, আর কোন ক্ষমতাই তার হাতে থাকবে না। এই উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসারটির জন্যে এর চেয়ে বেশী অপমানজনক আর কী-ই বা হতে পারে?

জুম্মার নামাজ শেষে মঞ্জুর তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের তার অফিসে ডেকে পাঠান। লেঃ কর্নেল মাহবুব, লেঃ কর্নেল দেলোয়ার আর মেজর খালিদ হাজির হয়। ঘনিষ্ঠদের চতুর্থ সদস্য, লেঃ কর্নেল মতি বিশেষ কাজে রাঙ্গামাটি যাওয়ায় উপস্থিত হতে পারেনি। মঞ্জুর তার অনুপস্থিতিতে কিছুটা রাগান্বিত হয়ে উঠেন এবং বারবার তার অনুপস্থিতির ব্যাপারে জানতে চাইছিলেন। মতি খুব শিগগির ফিরে আসবে বলে জানানো হয়। নির্দেশব্যঞ্জক সুরে উপস্থিত সহযোগীদের মঞ্জুর বলেন, 'এখনই কাজটা সম্পন্ন করতে হবে। কিভাবে করবে, কি দিয়ে করবে, তা আমি জানি না। কোন সৈন্য-সামন্ত কাজে লাগানো যাবে না। তোমাদের নির্দিষ্ট কয়েকজন সার্কিট হাউসে গিয়ে জিয়াকে উঠিয়ে আনবে। সকালে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো এবং দুর্বল পয়েন্টগুলো পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে'।

এইভাবেই প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর আদেশ ঘোষিত হয়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জেনারেল জিয়ার ইহ জগতের শেষ দিনটি ছিলো একেবারে সাদামাটা। বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে জেনারেল জিয়া নৌবাহিনীর

প্রধান, রিয়ার এ্যাডমিরাল এম, এ, খান এবং বিএনপি'র কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য নিয়ে ঢাকা থেকে পতেঙ্গা এসে পৌছান। বিএনপি নেতাদের মধ্যে ডঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সৈয়দ মহিবুল হাসান, ডঃ আমিনা রহমান, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এবং রাজ্জাক চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। বিমান বন্দরে তাকে বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল ছদরুদ্দীন, নগরীর পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

ঔপনিবেশিক কায়দায় নির্মিত চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে পৌঁছালে জেনারেল জিয়াকে কিছু হাল্কা নাস্তা পরিবেশন করা হয়। নিরাপত্তা নিয়ম অনুযায়ী তাঁর নাস্তা প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত চিকিৎসক লেঃ কর্নেল মাহতাবুল ইসলাম খেয়ে পরীক্ষা করে এবং তারপর তাকে তা খেতে দেয়া হয়।

জেনারেল জিয়া প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে সার্কিট হাউসের বারান্দায় বিএনপি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালান। বেলা সাড়ে বারোটার দিকে জুম্মার নামাজের জন্যে আলোচনা বন্ধ রাখা হয়। জিয়া পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে চকবাজারের চন্দনপুরা মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে উপস্থিত মুসল্লী ও জনগণের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে কাটিয়ে সার্কিট হাউসে ফিরে যান। এখানে তিনি দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দুপুরের খাবার খান। তার খাবারের তালিকা ছিলো খুবই সাধারণ গোছের। কারণ, তিনি কখনো তৈলাক্ত ও বেশী মশলাযুক্ত খাবার পছন্দ করতেন না। খাবার শেষে তিনি ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম নেন। বিকেল ৫টায় উঠে চা পান করে তিনি নীচতলার বৈঠকখানায় চলে আসেন। সেখানে তাঁর জন্যে ৪৫ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি অপেক্ষা করছিলেন। এদের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কয়েকজন অধ্যাপক, বারের কিছু সদস্য, শহরের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লোক এবং কয়েকজন সাংবাদিক। তাদের সঙ্গে জিয়া প্রায় আড়াই ঘণ্টা কথাবার্তা বলেন। তারপরে তিনি তার আসল কাজে মনোনিবেশ করেন। স্থানীয় বিএনপি'র দুই বিবদমান অংশের বিরোধ নিরসনের জন্যে তিনি আলাদা আলাদাভাবে তাদের সঙ্গে রাত ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যান। এর মাঝে তিনি চট্টগ্রামের কমিশনার সাইফুদ্দিন আহমেদ এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বদিউজ্জামানের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তারা জানায়, অন্ততঃ ৪০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশের তৎপরতা চলছে। তাদের কেউ বেআইনী জমি দখল, বেআইনী অস্ত্রবহন আবার কেউবা শহরে সন্ত্রাস সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এদের সকলেই বিএনপি'র সদস্য বিধায় পুলিশ তাদের ধরতে চেয়েও থমকে দাঁড়াচ্ছে বলে তারা প্রেসিডেন্টকে জানান। জিয়া তাদেরকে তাঁর দল থেকে সরিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত ডাক্তার তাঁর খাবার পরখ করা শেষ করলে, রাত ১১টার একটু পরে তাকে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। জীবনের শেষ খানা সেবন করে জিয়া তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঢাকায় টেলিফোনে কথা বলেন। স্বামী-স্ত্রীর জীবনের শেষ কথোপকথন ১৫ মিনিট স্থায়ী হয়। জীবনের সব কাজ সাঙ্গ করে মধ্যরাতের খানিক পরে, জিয়া তাঁর জীবনের শেষ যামিনী যাপনের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। জীবন বাতি নিভে যাবার মাত্র পাঁচ ঘন্টা আগে জিয়া তাঁর নিজ হাতে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে ঘুমুতে গেলেন। বাইরে তখন তুমুল ঝড় আর বিদ্যুতের ঝলকানি। এর আগে অবশ্য তিনি সকাল পৌনে সাতটায় তাকে সকালের চা পরিবেশন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিশ্চিন্তে তিনি শুয়ে পড়লেন বিছানায়। অথচ, ঠিক সেই মুহূর্তেই জিয়াকে চিরনিদ্রায় শায়িত করার উদ্দেশ্যে চট্টলার ক্যান্টনমেন্টে ঘাতকের দল প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জেনারেল মঞ্জুরের সংকেত পেয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যেরা লেঃ কর্ণেল দেলোয়ার হোসেনের বাসভবনে 'অভিযান পরিকল্পনা' তৈরী করার জন্যে মিলিত হন। তখন বিকেল ৬টা। লেঃ কর্ণেল মতিও রাঙ্গামাটি থেকে ফিরে এসেছে। উপস্থিত অন্যান্যরা হচ্ছে, লেঃ কর্ণেল মাহবুব, লেঃ কর্ণেল ফজলে হোসেন, মেজর খালিদ, মেজর লতিফুল আলম চৌধুরী এবং মেজর রওশন ইয়াজদানী ভূঁইয়া। লেঃ কর্ণেল ফজলে হোসেনের মতে, তখন তারা দু'টি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে। প্রথমটি হচ্ছে, সার্কিট হাউস থেকে জেনারেল জিয়াকে উঠিয়ে আনা। তাকে ব্যবহার করে ভাইস প্রেসিডেন্ট সাত্তার, সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এরশাদ এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের এখানে এনে তাদেরকে হত্যা করা। বিকল্প হচ্ছে, যদি ঐটি ব্যর্থ হয়, তাহলে জেনারেল জিয়াকে হত্যা করা হবে। মতি, মাহবুব এবং খালিদ জেনারেল জিয়াকে হত্যা করার চাইতে জিম্মী করার পক্ষপাতি ছিলো। কারণ এতে তারা তাদের কাজের জন্যে জনসমর্থন আদায়ে সক্ষম হতে পারবে।

ভিন্ন ভিন্ন ঘাতকদলের নেতাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়। ১১২ সিগন্যাল কোম্পানীর কমান্ডিং অফিসার মেজর মারুফ পরে এলে তাকে পরদিন ভোরবেলা নাগাদ ঢাকার সঙ্গে সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। ষড়যন্ত্রকারী দল আগে থেকেই সার্কিট হাউসের ভেতর থেকে সহযোগিতা পাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। দিনের বেলায় মতি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রেসিডেন্টের প্রধান স্টাফ অফিসার লেঃ কর্ণেল মাহফুজের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সে তাকে জানায় যে, তারা আজ রাতেই প্রেসিডেন্টের জীবনের উপর হামলা চালাবে। তার পরিবর্তে মাহফুজও সম্ভব সকল প্রকার সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করে। নিয়ম অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের শয়নকক্ষে যে দু'জন গার্ড থাকে, মাহফুজ তাদের সরিয়ে দেয়। তাছাড়া, সে সরকারী প্রটোকল অফিসারের কাছ থেকে সার্কিট হাউসের কক্ষ বণ্টনের চার্টও সংগ্রহ করে এবং দিনের

বেলায় ফিল্ড ইন্টেলিজেন্সের মেজর মুজিবুর রহমান এলে, তার মাধ্যমে চার্টটি হানাদার বাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

জেনারেল মঞ্জুর আগে থেকেই কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যেন, এ কাজ কোন সৈন্য ব্যবহার না করা হয়। মঞ্জুরের এ নির্দেশ সত্ত্বেও আঘাত হানার জন্যে সৈন্য যোগাড় করতে মেজর খালিদকে বলা হয়। সে তখন ব্রিগেড মেজর। কিন্তু তা সত্ত্বেও সৈন্য যোগাড় করা তার পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর হয়ে পড়ে। রাত প্রায় ৯টায় সে ফাস্ট ইস্ট বেঙ্গলের সুবেদার আবুল হাশিমকে ডেকে পাঠিয়ে নির্দেশ দেয়, তাকে ঐ রাতেই কিছু অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য নিয়ে কালুরঘাটে যেতে হবে। খালিদ তাকে একটি টাকার তোড়া এগিয়ে দিয়ে সেগুলোকে সৈন্যদের বহন করার জন্যে ট্রাক ভাড়া করার কাজে ব্যবহার করতে বলে। সুবেদার হাশিম সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠে। টাকা নিতে অস্বীকার করে সে খালিদকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'আমি সৈনিকদের এ টাকার ব্যাপারে কি বলবো?' খালিদ ঃ তোমার যা খুশী একটা বলে দিও—কিংবা বলে দিও যে, "প্যারেডের সময়ে সিনেমা দেখার শাস্তি হিসেবে তাদেরকে এখন কালুরঘাট যেতে হচ্ছে।" এতে সুবেদার হাশিম আরো বেশী সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠে। খালিদ তার উপর চটে গেলে, হাশিম এমনভাবে বেরিয়ে যায় যেন সে মেজরের হুকুম তামিল করার জন্যেই ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু সে তার সৈন্যদের যার যার জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সোজা তার বাসায় গিয়ে পালিয়ে থাকে।

আধা ঘন্টা পরে মেজর খালিদ ৬৯ পদাতিক ব্রিগেডের মেজর মোহাম্মদ মোস্তফাকে কিছু সৈন্য সরবরাহের জন্যে অনুরোধ জানায়। মেজর মোস্তফা ঘটনাটি সঙ্গে সঙ্গে তার ব্রিগেড কমান্ডার, ব্রিগেডিয়ার মোহসিনউদ্দিন আহমদ-এর কানে তুলে এবং বলে, 'মেজর খালিদ সার্কিট হাউস থেকে প্রেসিডেন্টকে উঠিয়ে আনার জন্যে ফাস্ট ইস্ট বেঙ্গলের কিছু ট্রুপ চাচ্ছে।' ব্রিগেডিয়ার মোহসিনউদ্দিন বলে, 'খালিদ পাগল বনেছে নাকি? এক্ষণই তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।' ব্রিগেডিয়ার একজন সৈনিককেও ব্যারাক থেকে বেরুতে মানা করে। পরে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে বিগ্রেডিয়ার মোহসিনউদ্দিন জানায়, সে জিওসি, জেনারেল মঞ্জুরকে ব্যাপারটি জানাতে চাইলেও তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সে তখন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা স্টাফ কিংবা গোয়েন্দা সংস্থাকে না জানিয়েই চুপচাপ বসে থাকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পারে যে, এ কাজের জন্যে কোন সৈন্যই তারা পাচ্ছে না। আঘাত হানার জন্যে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবেই অফিসারদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। রাত দশটার দিকে লেঃ কর্নেল মাহবুব দু'জন অফিসারকে সার্কিট হাউসে পাঠিয়ে সেখানে কোন অস্বাভাবিক গতিবিধি চলছে কিনা তা রিপোর্ট করতে বলে। মেজর

শওকত আলী এবং মেজর লতিফুল আলম চৌধুরী চট্টগ্রাম ক্লাবের দেয়ালে তাদের সশস্ত্র অবস্থান নেয়। সেখান থেকে সার্কিট হাউস পরিষ্কার দেখা যায়। অভিযান পরিপূর্ণভাবে শেষ না হাওয়া পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করে।

রাত গড়িয়ে যাচ্ছে দেখে ষড়যন্ত্রকারীরা সব কাজ তড়িঘড়ি করে সেরে নিতে সচেষ্ট হয়। রাত সাড়ে এগারোটায় মতি আর মাহবুব ২৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ডের অফিসে ১১ এবং ২৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল অফিসারকে ডাকা হয়। তাদের মধ্যে ৬ জন সেখানে উপস্থিত হয়। তারা হচ্ছে—মেজর মোমিন, মেজর গিয়াসউদ্দিন, ক্যাপ্টেন মুনির, ক্যাপ্টেন জামিল, ক্যাপ্টেন মইনুল ইসলাম এবং ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন আহমেদ। মতি দরজা তালাবন্ধ করে একখানা পবিত্র কোরআন শরীফ নিয়ে আসে। সে সমবেত অফিসারদের উদ্দেশ্যে বলে, 'ভদ্রমন্ডলী, এইটি একখানা পবিত্র কোরআন শরীফ। আমরা যা কিছুই করতে যাচ্ছি, সবই আমাদের দেশ, জাতি আর ন্যায় বিচারের স্বার্থে করতে হচ্ছে। আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে আছেন, এই পবিত্র কোরআন শরীফ ছুঁয়ে পশপথ করতে হবে যে, এ জন্যে যা কিছু করণীয় সবই আপনারা করতে রাজী আছেন। যারা আমাদের সঙ্গে থাকতে নারাজ, তারা রুম থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। তবে, তাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে, আপনারা অন্য কারো কাছে এ কথাটি দয়া করে জানাবেন না।'

কেউ এতে নারাজী হয়নি। সকলেই একে একে শপথ গ্রহণ করে নেয়। তারপর অস্ত্র, পোশাক ইত্যাদি নিয়ে তারা সকলেই সমরসাজে সজ্জিত হয়। তাদের সঙ্গে ছিলো সাব-মেশিনগান (এসএমজি) আর প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ।

৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল ফজলে হোসেনও তার হেড কোয়ার্টারে একই নাটকের অবতারণা করে। ফজলে লেঃ রফিকুল হাসান খানকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে, "আমি যেখানে যেতে চাচ্ছি, তুমি কি আসার সঙ্গে সেখানে যাবে?" রফিকুল জাব দেয় ঃ স্যার, আপনার নির্দেশ পেলে অবশ্যই যাবো। তারপর ফজলে লাইনের অন্যান্য অফিসারদের ডেকে পাঠায়। তাদের মধ্যে উপস্থিত হয়, মেজর দোস্ত মোহাম্মদ, ক্যাপ্টেন ইলিয়াস, ক্যাপ্টেন আরেফীন এবং লেঃ মোসলেহউদ্দিন। ফজলে উপস্থিত অফিসারদের উদ্দেশ্যে বলে ঃ 'তোমরা জানো, দেশের অবস্থা খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে। সেনাবাহিনীকে বহুলাংশে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আজ এবং কাল এই দু'দিন প্রেসিডেন্ট এখানে আছেন। এ ব্যাপারে এরই মধ্যে আমাদের কিছু একটা করে নিতে হবে। আমরা মনস্থ করেছি, আজই আমরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে তাকে বিষয়টা অবগত করাবো। তোমরা কে কে আমার সঙ্গে যেতে রাজী আছো? একবাক্যে সকেলই রাজী হয়ে গেলে ফজলে একখানা পবিত্র কোরআন শরীফ এনে

তাদেরকে শপথ করিয়ে বলে, 'আমাদের মিশন পুরোপুরিভাবে স্বার্থক/সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের কেউ আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে পারবে না।'

৩০শে মে, রাত্র আড়াইটার দিকে 'ঘাতকদল' কালুরঘাটস্থ রেডিও ট্রান্সমিটারের কাছাকাছি তাদের নির্ধারিত মিলন স্থলে এসে হাজির হতে থাকে। এই সেই জায়গা যেখান থেকে ১৯৭১-এর মার্চ মাসে জেনারেল জিয়া খ্যাতির সিঁড়িতে পা রাখেন। তখন বিজলী, বজ্রপাতসহ প্রচন্ড বেগে বাতাস বইছিলো আর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিলো। তিনজন সঙ্গী নিয়ে লেঃ কর্নেল মাহবুব তার সাদা টয়োটা গাড়িতে চড়ে আসে। এক ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে ১৮ জন অফিসার আর দু'জন জেসিও এসে জড়ো হয়। ঐ সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ফার্স্ট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড, মেজর ফজলুল হক ৪০ জন সৈন্যের দু'টি প্লাটুন নিয়ে এসে হাজির হয়। মেজর খালিদ তাদের উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলে তারা তাদের সঙ্গে যোগ দিতে জোর গলায় অস্বীকার করে। তাদেরকে পরে লেঃ মতিউর রহমানের অধীনে কালুরঘাট ব্রীজের অপর পাড়ে বান্দরবন সড়কে রেখে আসার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

বিদ্রোহে যোগদানের ব্যাপারে সাধারণ সৈনিকদের অস্বীকৃতি জিয়া হত্যা ঘটনার একটি অসাধারণ দিক।

সৈনিকদের নৈশকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা থাকায় সশস্ত্র লোকদের ক্যান্টনমেন্টের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটি কারো নজরে পড়েনি। তাছাড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঐ সময়ে যথেষ্ট শিথিল ছিলো। চট্টগ্রামের স্থানীয় নিরাপত্তা ইউনিট তৎপর না থাকায় ব্যাপারটি সময় মতো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আসতে পারেনি। ঐ সময়েও জিয়ার ভাগ্য তাঁর বিপরীতে কাজ করছিলো।

ঘাতকদলের নেতৃত্ব দেয় লেঃ কর্নের মতিউর রহমান। তাদের সঙ্গে ছিলো ১১টি এসএমজি, তিনটি রকেট ল্যান্সার এবং তিনটি গ্রেনেড ফায়ারিং রাইফেল। সে ঐ সবগুলো অস্ত্রে সঠিকভাবে গোলাবারুদ ভর্তি করা হয়েছে কিনা এবং ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, পরীক্ষা করে নেয়। ১৬ জন অফিসারকে একটি পিকআপে গাদাগাদি করে উঠানো হয়। 'সার্কিট হাউস এবং থাকার ঘরের একটি নকশা দেখিয়ে মতি তাদেরকে পুরো অভিযান পরিকল্পনাটি বুঝিয়ে দেয়। তারপর সে একখানা পবিত্র কোরআন শরীফ দিয়ে তাদের সকলে শপথ নবায়ন করে নিয়ে সজোরে ঘোষণা করেঃ 'আমরা আজ প্রেসিডেন্টকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছি।'

ঘাতক বাহিনী তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ চালানোর কথা। পরিকল্পনা মতে, দু'টি দল সার্কিট হাউসে ঢুকে আক্রমণ পরিচালনা করবে এবং একটি দল সার্কিট হাউসের পেছনে আলমাস সিনেমা হলের কাছে অবস্থান নেবে। কেউ যদি সার্কিট হাউস থেকে

পালাতে চেষ্টা করে তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। প্রথম দলে কে কে থাকতে ইচ্ছুক জিজ্ঞেস করা হলে অনেকেই এতে ইচ্ছে প্রকাশ করে। কিন্তু মতি তাদের মধ্যে থেকে মাত্র ছ'জনকে বাছাই করে নেয়। এই ছ'জন ঃ মাহবুব, ফজলে, খালিদ, জামিল হক, আবদুস সাত্তার আর লেঃ রফিকুল হাসান খান। ফজলে এ দলের নেতৃত্ব দেবে এবং গাড়ী চালাবে মাহবুব। ৯ নম্বর কক্ষে প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপর আঘাত হানার দায়িত্ব দেয়া হয় ফজলে আর ক্যাপ্টেন সাত্তারকে।

লেঃ কর্নেল মতি নিজে থাকলো দ্বিতীয় দলে। তার সঙ্গে থাকলো মেজর মোমিন, মেজর মোজাফফর, ক্যাপ্টেন ইলিয়াস, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন আর লেঃ মোসলেহউদ্দিন। প্রথম দলটিকে দ্বিতীয় দলটি পেছন থেকে সহায়তা করে। মেজর গিয়াসউদ্দিন আর ফজলুল হক, ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন আর মুনিরকে নিয়ে গঠিত হয় তৃতীয় দলটি।

রাত্রি সাড়ে তিনটার সামান্য কিছু পরে দল তিনটি কালুরঘাট থেকে প্রচন্ড বৃষ্টির মাঝে আস্তে আস্তে গাড়ী চালিয়ে সামনে এগোতে শুরু করে। যুবক লেফটেন্যান্ট রফিক প্রথম দলের পিকআপে বসে কম্পিত স্বরে ফজলেকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'আপনারা কি প্রেসিডেন্টকে খুন করতে যাচ্ছেন? কর্নেল ফজলে তাকে জানায়, 'না' আমরা কেবলই তাকে তুলে আনতে যাচ্ছি।' কথা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, শেষ মুহূর্তেও দলের অনেক সদস্য বিশ্বাস করতো যে, তারা প্রেসিডেন্টকে তুলে নিয়ে এসে জিম্মী করে রাখতে যাচ্ছে।

ঘাতকদল দু'টি বিনা বাধায় সার্কিট হাউসে ঢুকে পড়ে। লোহার তৈরী বিরাট বড় সদর দরজাটি অজ্ঞাত কারণে সে রাতে খুলে রাখা হয়েছিলো। পাহারারত চারজন প্রহরী ঘাতক বাহিনীকে বিনা প্রশ্নে ভেতরে যেতে পথ করে দিলো। এ সময় লেঃ কর্নেল ফজলে হোসেন তার হাতের রকেট ল্যান্সার থেকে পরপর দু'টি ফায়ার করে। গোলা দু'টি জিয়ার শয়নকক্ষের ঠিক নীচের দিকে বিরাট দু'টি গর্ত সৃষ্টি করে। সার্কিট হাউসে অবস্থানরত সকলকে ভয় পাইয়ে দিতে এবং ঘাতকদের অন্যান্য দলকে সংকেত দেয়ার জন্যেই ঐ প্রাথমিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সঙ্গে সঙ্গেই বাকী দলীয় সহযোগীরা গ্রেনেড, রকেট আর মেশিন গান থেকে গুলি চালাতে শুরু করে। এতে করে সমানা্য দু'একজন প্রতিরোধ সৃষ্টিকারীকে একেবারে ধূলোয় মিলিয়ে দেয়া হয়। চট্টগ্রাম ক্লাবের দেয়ালে দর্শকের ভূমিকায় অবলোকনরত দুই মেজরের একজন পরে জানায়, সিনেমায় ছবিতে প্রদর্শিত কমান্ডো আক্রমণের মত সেদিনের হামলা পরিচালিত হয়েছিলো।

নিরাপত্তা রক্ষীদের মধ্যে পুলিশ কনস্টেবল দুলাল মিঞা পোর্টিকোতে প্রহরারত অবস্থায় মাথায় গুলি খেয়ে প্রথম প্রাণত্যাগ করে। পাহারারত বাকী ৪৪ সশস্ত্র পুলিশের কেউ কোন রকম প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেনি। তাদের কেউ কেউ ছুটে গিয়ে

নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালায়। ঘাতকদলের এলোপাথাড়ি গোলাগুলি আর ছোটাছুটির কারণে আরো ১২ জন পুলিশ আহত হয়।

ঐ সময় কর্তব্যরত প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের সৈন্যরাও তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলো। যে দু'জন সৈন্য প্রেসিডেন্টের কক্ষের সামনে পাহারারত থাকার কথা, তাদের একজনকে নীচতলায় মৃত এবং অন্যজনকে তার কোয়ার্টারে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। নীচতলার সৈন্যেরা সম্ভবতঃ প্রেসিডেন্টের কক্ষের দিকে যেতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু এর আগেই তাদেরকে খতম করে দেয়া হয়।

আশ্চর্যজনকভাবে সার্কিট হাউসের নিরাপত্তা প্রহরীদের গুলিতে হানাদার দলের কেউ নিহত বা আহত হয়নি। তাদের দু'জন নিজেদের লোকদের গুলিতেই আহত হয়েছিলো। এর মধ্যে লেঃ কর্ণেল ফজলে হোসেন পেছনের দলের বেপরোয়া গুলিতে ঘোরতর আহত হয়ে অভিযান থেকে সরে পড়ে। ক্যাপ্টেন জামিলও ঠিক সেভাবেই আহত হয়েছিলো। কিন্তু যেভাবেই হোক, আহত শরীরে জামিল সার্কিট হাউসের দু'তলায় বেয়ে উঠে এবং নায়েক রফিকুদ্দিনকে গুলি করে আহত করে। প্রেসিডেন্টের প্রধান নিরাপত্তা অফিসার লেঃ কর্ণেল মইনুল আহসান এবং ক্যাপ্টেন আশরাফুল খান তখন দু'তলায় প্রেসিডেন্টের পেছনের কক্ষে ঘুমুচ্ছিলো। রকেটের আওয়াজে তারা জেগে উঠে। সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাদের অস্ত্র হাতে প্রেসিডেন্টের জীবন রক্ষায় ছুটে আসছিল। তারা তাদের অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পাবার আগেই আক্রমণকারীদের গুলিতে নিবেদিত প্রাণ এই দুই অফিসারের নিষ্প্রাণ দেহ বারান্দায় লুটিয়ে পড়ে।

পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পেছনের ঘাতকদলটি কর্নেল মতিসহ এই সময়ে দু'তলায় অন্যান্য আক্রমণকারীদের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের ৯ নম্বর কক্ষ খুঁজতে শুরু করে। ক্যাপ্টেন সাত্তার লাথি মেরে ঐ কক্ষের দরজা ভেঙ্গে ফেলতেই সে দেখে ঘরে অবস্থানরত ডঃ আমিনা রহমান। ফলে প্রেসিডেন্টের খোঁজে ওরা একি ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন এ সময় উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'প্রেসিডেন্ট কোথায়? প্রেসিডেন্ট কোথায়?' কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা বুঝতে পারে যে, প্রেসিডেন্ট ৪ নম্বর রুমে অবস্থান করছেন। রুমটি সিঁড়ির গোড়ায়। রুমের একটি দরজা সিঁড়ির দিকে আর একটি দরজা বারান্দার দিকে। ক্যাপ্টেন সাত্তার লাথি মেরে বারান্দার দিকের দরজাটি ভাঙ্গতে চেষ্টা করে। হঠাৎ করে তাদের একজন চিৎকার করে বলতে থাকে ঃ'প্রেসিডেন্ট বেরিয়ে আসছেন।' এক মুহূর্ত পরেই আর একজন চিৎকার করে বলে উঠে ঃ 'এইতো প্রেসিডেন্ট।'

সাদা পায়জামা পরা উস্কখুস্ক চুলে প্রেসিডেন্ট অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসেন। তাঁর হাত দু'টি সামনের দিকে সামান্য উঁচিয়ে প্রেসিডেন্ট দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমরা কি চাও?'

প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে কাছে ছিলো মেজর মোজাফফর আর ক্যাপ্টেন মোসলেহউদ্দিন। মেজর মোজাফফর দৃশ্যতঃ ভয়ে কাঁপছিলো। মোসলেহউদ্দিন প্রেসিডেন্টকে আশ্বস্ত করতে চাইছিলো। সে বলছিলো। স্যার, আপনি ঘাবড়াবেন না। এখানে ভয়ের কিছুই নেই, কি আশ্চর্য! ঐ দু'জন অফিসার তখনও মনে করছে, তারা প্রেসিডেন্টকে উঠিয়ে নিতে এসেছে, হত্যা করতে নয়। লেঃ কর্নেল মতিও কাছাকাছিই ছিলো। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রতি তার বিন্দুমাত্রও দয়ামায়া ছিলো না। সে প্রেসিডেন্টকে একটুও সুযোগ দিলো না। মোসলেহউদ্দিনের ঠোঁট থেকে জিয়ার প্রতি তার আশ্বাসের বাণী মিলিয়ে যাবার আগেই মতি তার এসএমজি থেকে গুলি চালিয়ে দেয়। ঝাকে ঝাকে গুলি এসে জিয়ার শরীরের ডানদিক একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলে। দরজার কাছেই জিয়া মুখ-থুবড়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। রক্তের বন্যায় তার সমস্ত শরীর ভেসে যেতে থাকে। খুনের নেশায় ঘাতক মতি পাগল হয়ে উঠে। সে তার বন্দুকের নল দিয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রাণহীন দেহ উল্টিয়ে নেয়। তারপর জিয়ার মুখমন্ডল আর বুকের উপর তার এসএমজির ট্রিগার টিপে রেখে ম্যাগজিন খালি করে তার খুনের নেশা মিটিয়ে দেয়। গুলির আঘাতে জিয়ার মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আমি কল্পনাও করতে পারছি না, কি ধরনের ক্ষোভ কর্ণেল মতি তার মনের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিলো, যার বহিঃপ্রকাশ এতটা মর্মান্তিক আর নৃশংসরূপ নিয়েছিলো! জিয়াকে নৃশংসভাবে খুন করে খুনীরা ঝটপট সার্কিট হাউস ছেড়ে চলে যায়। দু'জন আহত সঙ্গীকেও তারা সঙ্গে নিয়ে যায়। পুরো নৃশংস হত্যাকান্ডটি ২০ মিনিটেরও কম সময়ে সম্পন্ন হয়েছিলো।

জীপে চড়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাবার পথে মেজর মোজাফফর ক্ষোভে আর দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে লেঃ মোসলেহউদ্দিনকে বলছিলো ঃ 'আমি জানতাম না, আমরা প্রেসিডেন্টকে খুন করতে যাচ্ছি। আমার ধারণা ছিলো, আমরা কেবলই প্রেসিডেন্টকে বের করে নিয়ে আসতে যাচ্ছি।'

জিয়ার ব্যক্তিগত ডাক্তার লেঃ কর্নেল মাহতাবুল ইসলাম গুলি থেমে গেলে তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। নিহত প্রেসিডেন্টের একটি পরিষ্কার বর্ণনা তার ভাষ্য থেকে ফুটে উঠে। তার ভাষায় ঃ আমি দরজার সামনে প্রেসিডেন্টের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখি। গুলির আঘাতে তাঁর সমস্ত শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তাঁর একটা চোখ সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেছে। ঘাড়ের মাংসগুলো কোথাও যেন উড়ে চলে গেছে। তাঁর বুকে, পেটে আর পায়ে অগণিত গুলির চিহ্ন ফুটে রয়েছে। গালিচাটি তাঁর শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা তাজা রক্তে ভেসে গেছে। তাঁর প্রিয় চশমা জোড়াটি অসহায়ভাবে সিঁড়ির কাছে পড়ে রয়েছে।

গোলাগুলি থেমে যাওয়া এবং আক্রমণকারীদের চলে যাওয়ার অনেক পরে ভীতসন্ত্রস্ত

খরগোশের ন্যায় দু'তলায় অবস্থানরত অন্যান্যরা তাদের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। সংকটময় মুহূর্তে জিয়াকে কেউ একটুখানি সাহায্য করতেও এগিয়ে আসেনি। তদন্তে নিয়োজিত বেসামরিক কমিশন বুঝতে পারে ঃ 'লেঃ কর্নেল মাহফুজ (প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী) এবং ক্যাপ্টেন মাজহার (এডিসি) তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেনি। ঘাতকের দল চলে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পরে ওয়্যারলেস অপারেটর নায়েক আবুল বাশার তাদের দরজায় আঘাত করলে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এই দুই অফিসার তাদের ঘরের ভেতরে টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত ছিলো এবং অনেকক্ষণ ধরে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তাও করছিলো না।'

জিয়ার পাশের রুমেই ছিলো এডিসি, মাজহার। ব্যক্তিগতভাবে সে প্রেসিডেন্টের কাছে যাবার চেষ্টাটুকুও করেনি। তার পরিবর্তে সে তার ঘর থেকে প্রেসিডেন্টের ঘরে টেলিফোন করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। জিয়া হত্যা তদন্ত কার্যে নিয়োজিত বেসামরিক তদন্ত কমিশন প্রেসিডেন্টের হত্যার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ দু'টি রুমের মাঝে একটি সংযোগকারী দরজা আছে। ঘটনার সময়ে ঐ দরজা দিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছানো সবচেয়ে সহজ ছিলো। হত্যাকারীরা যখন প্রেসিডেন্টের রুমর দরজায় ধাক্কাধাক্কি করছিলো, তখন প্রেসিডেন্ট এডিসি'র রুমের ভেতর দিয়ে সরে পড়তে পারতেন। ঐ সময় প্রেসিডেন্টকে তার রুমে নিয়ে যাবার জন্যে এডিসি খুব সহজেই ব্যবস্থা করতে পারতো। কিন্তু আমরা এডিসি'র কাছ থেকে যা শুনলাম, 'তাতে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। ঐ সংযোগকারী দরজা সম্বন্ধে নাকি তার জানাই ছিলো না।'

অন্যদিকে কর্নেল মাহফুজ এক নাটকীয় কাহিনীর অবতারণা করে। সে বলে যে, প্রেসিডেন্টের সাহায্যে এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে উর্দিপরা একজন সশস্ত্র লোক তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। তখন মাহফুজ সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়ে। গুলি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সে মেঝেতেই সটান হয়ে শুয়ে থাকে। তার কাহিনীর সমর্থনে সে তার শয়নকক্ষের দেয়ালে গুলির চিহ্নও দেখায়। কিন্তু বেশ কিছুদিন পর বিশেষজ্ঞরা ঐগুলির চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখতে পান যে, ঐ সকল গুলি রুমের বাইরে থেকে আসতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, মাহফুজ নিজেই তার বন্দুক থেকে গুলি করে ঐ চিহ্নগুলোর সৃষ্টি করে। এতে করেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে মাহফুজের জড়িত থাকার প্রথম সূত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে ভেঙ্গে পড়ে এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে তার জড়িত থাকার ঘটনা স্বীকার করে। পরে তাকে জিয়া হত্যার সঙ্গে জড়িত করে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়।

৬০ বৎসর বয়স্ক ডঃ আমিনা রহমান অল্পের জন্যে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। হত্যাকারীরা প্রেসিডেন্টের রুম ভেবে তার রুমের দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়েছিলো। পরে

তিনি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়ে মাত্র ৪৫ মিনিট পর তার রুম থাকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু অন্য একটি ভিআইপি রুমে অবস্থানরত ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং মহিবুল হাসান ভয়ে কাঁপতে থাকেন এবং অনেক পরে তাদের ঘর থেকে বাইরে আসেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার মরদেহ অনেকক্ষণ ধরে বারান্দার মেঝেতে যেভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো ঠিক সেভাবেই পড়ে থাকে। একটা লোকও তাঁর ধারে কাছে পর্যন্ত আসেনি। জিয়ার ব্যক্তিগত ডাক্তার লেঃ কর্নেল মাহতাবুল ইসলাম তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। কিন্তু মৃত দেহের সদগতির কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। ঐ সময় পর্যন্ত যারা সার্কিট হাউস পরিদর্শন করে, তারাও এ নিয়ে সামান্যতম মাথা ঘামানোর চেষ্টাটুকু করেনি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, দেশের প্রেসিডেন্টের মরদেহ একটি খাটের উপর উঠানোর সম্মানটুকুও দেখাতে চাইলো না। একটা অবাঞ্ছিত বস্তার মতই তাঁর লাশ মেঝের কোণে পড়ে রইলো।

বিএনপি নেতা, মিজানুর রহমান চৌধুরীই কেবল সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে তাঁর নিজের বিছানার সাদা চাদরটি এনে নিহত প্রেসিডেন্টের উপর সযত্নে বিছিয়ে দিলেন। নৌবাহিনীর প্রধান এ্যাডমিরাল এম, এ, খান ৫টা ৩০ মিনিটে সার্কিট হাউসে আসে। নীচের বারান্দায় সে অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলে। কয়েকজন কর্মকর্তা সে সময় তাকে দু'তলায় প্রেসিডেন্টের লাশ দেখার জন্যে অনুরোধ করলেও সে তা রক্ষা করেনি। পরবর্তীতে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরেও তার এ অপ্রত্যাশিত আচরণের হেতু পরিষ্কার করে জানা যায়নি।

চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাইফুদ্দিন আহমেদ ঐ সময় সেখানে উপস্থিত থাকলেও প্রেসিডেন্টের লাশের প্রতি তিনি উপযুক্ত সম্মান দেখাতে এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। স্পষ্টতঃই আমার প্রশ্নে সাইফুদ্দিন বিব্রতবোধ করতে থাকেন। তিনি বলেন ঃ 'পূর্বের ঘটনা নিয়ে আমি এখন কিছু বলতে চাই না।' যে কোন একটা জবাবের জন্যে তাকে চাপ দেয়া হলে, তিনি ছল-চাতুরির আশ্রয় নেয় এবং বলেন ঃ 'আমার কি করা উচিত, তা আমি তখন বুঝে উঠতে পারিনি। সার্কিট হাউসে আমি ঘণ্টা খানিকের মত ছিলাম। ঐ সময়ের উপস্থিতিতে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, সেনাবাহিনী এ হত্যাকান্ডটি ঘটিয়েছে। তারা প্রেসিডেন্টকে হত্যা করেছে এবং তাদের মর্জিমত পরের কাজগুলোও তারাই করবে বলে আমরা কিছু করতে সাহস পাইনি। আমরা অত্যন্ত অসহায় বোধ করছিলাম।

আমি আবারো জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'প্রেসিডেন্টের লাশটি উদ্ধার করা হয়নি কেন? সাইফুদ্দিন ঃ 'কি করতে হবে, আমি তা বুঝতে পারিনি। এটা নিতান্তই পুলিশের কাজ। আইন অনুযায়ী, তারা লাশের জন্যে দায়ী।'

অবিশ্বাসের চোখে আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলে, সাইফুদ্দিন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন ঃ 'লাশের উপর রাখা বিছানার চাদরটি উঠিয়ে প্রেসিডেন্টের মুখটি দেখার মত মানসিকতা আমার ছিলো না। ' চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের এ ছিলো যোগ্যতার বহর।

সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে সকল কর্মকর্তা আর নেতৃবৃন্দ সার্কিট হাউস ছেড়ে চলে যায়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার লাশ তখনও বারান্দার মেঝেতে একইভাবে পড়ে থাকে। সার্কিট হাউসে মাত্র দু'জন বেসামরিক অফিসারের তত্ত্বাবধানে প্রেসিডেন্টের লাশ রেখে তারা চলে যেতে পেরেছিলো। কমিশনার সাইফুদ্দিন যাবার সময়ে লেঃ কর্নেল মাহফুজ আর মাহতাব এবং এডিসি, ক্যাপ্টেন মাজহারকে তার সঙ্গে নিয়ে যায়। তার বাসায় নিয়ে তাদেরকে তার স্ত্রীর হাতে তৈরী করা নাস্তা পরিবেশন করে।

এক ঘণ্টা পরে তিজন বিদ্রোহী মেজর ১২ জন সিপাই নিয়ে সার্কিট হাউসে এসে পৌছায়। ঐ তিনজন হচ্ছে—মোজাফফর, শওকত আলী এবং রেজা। দু'টি জীপ আর একটি আর্মি ভ্যানে করে তারা পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এখানে আসে। গোপন কাগজপত্র এবং জিয়ার ব্যক্তিগত ডায়েরীটি খোঁজার জন্যে ওরা প্রেসিডেন্টের শয়নকক্ষ একেবারে তছনছ করে ফেলে। একটা পুরনো সুটকেসে বিদ্রোহীরা জিয়ার সকল ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ঢুকিয়ে নেয়। তারপর তারা তাঁর লাশ একটি সাদা বিছানার চাদরে মুড়ে ফেলে। কর্নেল আহসান আর ক্যাপ্টেন হাফিজের লাশও তারা একইভাবে মুড়ে তিনটি লাশ একত্র করে ভ্যানে উঠিয়ে কবর দেয়ার জন্যে নিয়ে চলে যায়। তখন সকাল ৯টা ৩০ মিনিট।

প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করার খবর যখন মঞ্জুরের কাছে পৌছায়, তখন ভোর ৪টা ৪৫মিনিট। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেসামরিক পোশাকে নিজে গাড়ি চালিয়ে ৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টারে চলে আসেন। এসেই তিনি কয়েকটি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে এবং বাইরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে জিয়ার প্রতি অনুগত সৈন্যেরা যাতে চট্টগ্রামের দিকে আসতে না পারে, সে জন্যে তিনি ঐ রেজিমেন্টের ২টি কোম্পানীকে শুভপুর ব্রীজের গোড়ায় প্রতিরোধমূলক অবস্থান নিতে পাঠিয়ে দেন।

তারপর মঞ্জুর গাড়ী চালিয়ে তার ২৪তম ডিভিশন হেড কোয়ার্টারে চলে আসেন। সেখানে এসে তিনি সকল ব্রিগেড কমান্ডার, ডিভিশনাল স্টাফ অফিসার এবং কমান্ডান্টদের ডেকে পাঠান। তাদের উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন, কয়েকজন তরুণ অফিসারের হাতে দেশের প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছেন। তিনিও তাদের সঙ্গে আছেন। তিনি বলেন, প্রশাসন দুর্নীতিতে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলো এবং সোনাবাহিনীতেও তা ঢুকে পড়েছিলো। জিয়াকে কয়েকবার এ নিয়ে সতর্ক করা হলেও তিনি কোন সংশোধনমূলক

ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তারপর মঞ্জুর ঘোষণা করেন যে, দুর্নীতি উচ্ছেদ এবং দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে একটি 'বিপ্লবী কাউন্সিল' গঠন করা হয়েছে। তিনি একখানা পবিত্র কোরআন শরীফ তুলে ধরে উপস্থিত সকলকে কোরআন শরীফ ছুঁয়ে তার প্রতি এবং বিপ্লবী কাউন্সিলের প্রতি সমর্থন এবং আনুগত্য জ্ঞাপনের শপথ নিতে নির্দেশ দেন।

জিয়া হত্যার উপর প্রকাশিত শ্বেতপত্রের মতে, উপস্থিত সকল অফিসারই কোরআন শরীফ ছুঁয়ে শপথ নিয়েছিলো। কিন্তু পরে মঞ্জুরের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে গেলে, তাদের অনেকেই সরকার পক্ষে যোগ দেয়।

শ্বেতপত্রটি থেকে আরো জানা যায় যে, ৩০শে মে সকাল বেলায় আরো অনেক পদস্থ বেসামরিক, সামরিক ও পুলিশ অফিসারকে জিওসির অফিসে নিয়ে আসা হয়। এবং কোরআন শরীফ ছুঁইয়ে তাদেরকে মঞ্জুর এবং বিপ্লবী পরিষদের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের শপথ গ্রহণ করানো হয়। অন্যান্যের মধ্যে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাইফুদ্দিন, ডেপুটি কমিশনার জিয়াউদ্দিন চৌধুরী, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বদিউজ্জামান, বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম, বিডিআর-এর সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্নেল আবদুল্লাহ আজাদ। মঞ্জুরের আর তার ঘোষিত বিপ্লবী পরিষদের উপর তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে।

এরপর মঞ্জুর চট্টগ্রাম রেডিও থেকে এক বেতার ভাষণে বিপ্লবের কারণ ব্যাখ্যা করে সেনাবাহিনীর সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা চালান। সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায়ে বেশ কিছু রদবদল ঘোষণার মাধ্যমে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীর সমর্থন লাভের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের বরখাস্তের কথাও উল্লেখ করা হয়। মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীকে সেনাবাহিনী প্রধানের স্থলাভিষিক্ত হবার কথা উল্লেখ করা হয়। মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী আর মেজর জেনারেল মঈনুল হোসেনকে মিলিটারী যোগাযোগ সিস্টেমের মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলা হয়। বার্তার মতে, যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হবে।

মঞ্জুর 'সিগন্যাল' পাঠিয়ে বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, ঢাকার ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড, কুমিল্লার ৩৩ পদাতিক ডিভিশন, যশোরের ৫৫ পদাতিক ডিভিশন এবং বাংলাদেশ রাইফেলসের সমর্থন লাভের আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, 'দেশের বৃহত্তর স্বার্থ আর সংহতির প্রয়োজনে তাঁদের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন।' মঞ্জুরের সব আবেদনই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

বিপ্লবী পরিষদের কথা ঘোষণা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে 'বিপ্লবী পরিষদ' গঠন করা

হয়নি। মেজর খালিদ পরে জানায়, ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিষদ গঠন করার কথা ছিলো। ঢাকার সমর্থন পাবার পরই তা আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করা হতো বলে খালিদ মত প্রকাশ করে।

দেশের সরকার, সেনাবাহিনী আর বিমান বাহিনীর কেন্দ্রস্থল ঢাকায় রেখে, দেশের এক দূর প্রান্তে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা চালানো, পাগলামি ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে। ঢাকায় কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজে মঞ্জুরের হঠাৎ বদলির খবর আর ঠিক ঐ মুহূর্তেই প্রেসিডেন্ট জিয়ার চট্টগ্রাম সফরের সুযোগ—এ দুটোই জিয়ার হত্যাকে ত্বরান্বিত করেছিলো। একটা হত্যা দিয়ে শুরু করে বিদ্রোহীরা একে অভ্যুত্থানে উন্নীত করতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার, তারা সেনাবাহিনীর মানসিকতা বুঝতে পারেনি।

এক ঘণ্টারও কিছু পরে প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার খবর ঢাকায় টেলিফোনে জানানো হয়। ঐ সময়ে দুই শহরের মধ্যে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অচল ছিলো। এডিসি, ক্যাপ্টেন মাজহার সম্ভবতঃ কিছুটা শোকাহত হয়ে পড়েছিলো। জরুরী যোগাযোগের জন্যে প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের 'রোভার' ওয়্যারলেসটি সে তখন ব্যবহার করতে পারতো। অথচ তা না করে, সে কল বুক করে ঢাকার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা চালায়। ৫টা ৩০ মিনিটের সময় সে প্রেসিডেন্টের মিলিটারী সেক্রেটারী, মেজর জেনারেল সাদিকুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে সক্ষম হয়। প্রেসিডেন্টের মিলিটারী সেক্রেটারী জেনারেল সাদিক লেঃ কর্নেল মাহফুজের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে, পাশের রুম থেকে মাহফুজকে ডাকা হয়। মাহফুজ আসতে আসতে টেলিফোন লাইনটি কেটে যায়।

সঙ্গে সঙ্গেই মিলিটারী সেক্রেটারী বঙ্গভবন থেকে সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ করেন। দশ মিনিট পর চীফ অব জেনারেল স্টাফ, মেজর জেনারেল নূর উদ্দিন খানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ঘটনাটি বলেন। তিনিও মুহূর্তের মধ্যে সেনাবাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ, এম, এরশাদকে ঘটনাটি জানিয়ে দেন। ৬টা ২০ মিনিটের মধ্যে সমস্ত সেনা সদর প্রকম্পিত হয়ে উঠে। জেনারেল এরশাদ সকল সিনিয়র অফিসারকে সেনা সদরে ডেকে পাঠান। বিদ্রোহে কে জড়িত? বিদ্রোহ কতটা ছড়িয়ে পড়েছে? অন্যান্য সেনানিবাসে বিদ্রোহীদের সমর্থন রয়েছে কি? ইত্যাদি খবরাদি তখনো তাদের কাছে জানা ছিলো না।

সন্দেহের মাত্রা আরো বেড়ে যায় যখন লেঃ কর্নেল মাহফুজ প্রেসিডেন্টের ওয়্যারলেসে মিলিটারী অপারেশনকে প্রেসিডেন্টের লাশ নিয়ে যাবার জন্যে হেলিকপ্টার পাঠাতে বলে। মাহফুজ যখন কথা বলে, তখন সময় সকাল ৭টা। মাহফুজ, প্রেসিডেন্টের লাশ নেয়ার জন্যে সেনাবাহিনীর প্রধান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের মিলিটারী সেক্রেটারীকে হেলিকপ্টারে আসতে বলে হেলিকপ্টারকে সার্কিট হাউসে অবতরণ করতে জানিয়ে দেয়।

আসলে, ২৫শে মে, কর্নেল মতির সঙ্গে ঢাকায় মাহফুজের যে আলোচনা হয়েছিলো সেই আলোচনা মাফিক তাদেরকে চটটগ্রামে এনে জিম্মী করার চেষ্টা চালিয়েছিলো সে। কিন্তু, সেনাসদর তা আঁচ করতে পেরে মাহফুজের ঐ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

৩০শে মে, জেনারেল এরশাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া মেনে চলার ব্যবস্থা তিনি নিশ্চিত করেন। প্রেসিডেন্টে তো নিহত হয়েছেন। এখন সংবিধান অনুযায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। শাসনতন্ত্রকে মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে জেনারেলএরশাদ, সেনাবাহিনী এবং দেশকে তাদের কর্তব্যের প্রতি একটা পরিষ্কার দিক নির্দেশ করলেন। সর্বত্রই তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাদৃত হয়। চট্টগ্রাম এলাকাতে ভুল পথে পরিচারিলত সৈন্য এবং অফিসাররাও তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাদের বিদ্রোহের যবনিকা টানে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার-এর কাছে যখন প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার খবর জানানো হয়, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে শায়িত আছেন। জেনারেল এরশাদ ঐ অবস্থায়ই তাকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। বিচারপতি সাত্তার তাঁর বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার কারণ দর্শিয়ে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। বিচারপতির ঐ ধরনের অস্বীকৃতি খুব সহজেই অনুমেয়। কারণ, হত্যা করেছে সেনাবাহিনী এবং স্পষ্টতঃই তা ক্ষমতায় আরোহণের জন্যে। সুতরাং এই সকল স্পর্শকাতর বিষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাওয়া, একজন বিচারপতির জন্যে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর যুক্তিকে খন্ডন করে জেনারেল এরশাদ তাঁর পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়ে নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিচারপতি সাত্তারকে প্রহরা দিয়ে বঙ্গভবনে নিয়ে আসেন এবং প্রধান বিচারপতিকে দিয়ে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

প্রথমেই সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন লাভের জন্যে প্রেসিডেন্ট সাত্তার ৯০ সেকেন্ডের একট বেতার ভাষণ প্রদান করেন। জিয়ার শাহাদত বরণ-এর কথা ঘোষণা করে নূতন প্রেসিডেন্ট দেশবাসীর প্রতি শান্তি, শৃঙ্খলা আর দেশপ্রেমের আহবান জানান। তিনি বলেন, সরকারী দপ্তর এবং মন্ত্রী পরিষদ স্বাভাবিকভাবেই কাজ করছে। নিহত প্রেসিডেন্টের জন্যে তিনি সারাদেশে ৪০ দিনব্যাপী শোক দিবস পালনের সরকারী সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। প্রতিবেশী দেশ ভারতের সান্ত্বনার জন্যে, 'বাংলাদেশ তার সকল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তিমালা মেনে চলবে বলে প্রেসিডেন্ট সাত্তার পুনরায় দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা দেন। তারপর তিনি বলেন, সরকারের তরফ থেকে শীঘ্রই আপনাদেরকে পরিস্থিতির পূর্ণ বিবরণ জানানো হবে।'

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক আহবান করা হয়। দেশে মার্শাল ল

জারি করতে হবে—এ ধরনের সম্ভাবনা শীঘ্রই মানুষের মন থেকে উঠে যেতে থাকে। সশস্ত্র বাহিনীকে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া মেনে চলতে দেখে বেসামরিক প্রশাসন আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ে। সরকার ঐ অবস্থায় দেশে মার্শাল ল জারি না করে দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। জনসভা, মিছিল ইত্যাদি রহিত ঘোষণা করা হয়। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট তিন বাহিনীর প্রধানকে বিদ্রোহ দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। বিদ্রোহীদের অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশও দেয়া হয়।

বেসামরিক সরকার নব উদ্যম ও ক্ষমতার আস্থা নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে শুরু করে। অবশ্য সেনাবাহিনীর প্রধান, জেনারেল এরশাদ প্রকৃতপক্ষে বেশীরভাগ কাজই চালিয়ে নিচ্ছিলেন। চট্টগ্রাম ছাড়া, দেশের অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতেই রয়ে গিয়েছিলো। ঐ সময়ে জেনারেল এরশাদ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে একটা শক্তিশালী বাহিনী চট্টগ্রামের দিকে পাঠিয়ে দেন, যাতে করে ঐ দিক থেকে কোন আক্রমণ পরিচালিত হলে, ওরা তা প্রতিহত করে দিতে পারে। তখনও সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে বিদ্রোহ নিয়ে যথেষ্ট দ্বিধা কাজ করছিলো। এমন সময় অর্থাৎ প্রায় দুপুরের দিকে, জেনারেল মঞ্জুর, সেনা সদর দফতরে মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীকে টেলিফোন করেন। মঞ্জুর, জেনারেল শওকতকে বিপ্লবী পরিষদ এবং তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য পরিবেশন করেন। তিনি চট্টগ্রামের দিকে কোন সৈন্য পাঠাতেও তাকে বারণ করেন।

চট্টগ্রাম থেকে মঞ্জুরের টেলিফোন পেয়ে জেনারেল এরশাদ তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য হাতে পেয়ে যান। তিনি বিদ্রোহের রূপরেখা আঁচ করতে পেরে জেনারেল এরশাদ রেডিও এবং টেলিভিশনে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং একটা ক্ষুদ্র দুষ্কৃতকারী দলের প্ররোচনায়, সৈন্যদেরকে ভুলপথে পা বাড়াতে সাবধান করে দেন। ঐ দুষ্কৃতকারী দলের লোকেরা দেশের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানকে খুন করেছে বলে তিনি জানান। সেনাবাহিনীর প্রধান অনুগত সৈন্যদেরকে শুভপুর ব্রীজের কাছে সরকার পক্ষে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। ৩১শে মে, রোজ রোববার দুপুর পর্যন্ত সময় দিয়ে ঘোষণা করেন যে, যারা ঐ সময়ের মধ্যে সরকার পক্ষে যোগ দেবে তাদেরকে 'সাধারণ ক্ষমার' আওতায় ফেলা হবে। জেনারেল এরশাদ ইতিমধ্যেই মেজর জেনারেল মঞ্জুর এবং তার দলকে বিলম্ব না করে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। অন্যথায়, তাদেরকে মারাত্মক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

জেনারেল এরশাদের নির্দেশ ঢাকা রেডিও থেকে প্রথম দিন আধা ঘণ্টা পর পর এবং পরের দিন এক ঘণ্টা পর পর প্রচারিত হতে থাকে। এই প্রচারের ফলে, চট্টগ্রামে অবস্থিত সেনাবাহিনীতে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, তারা

দেশের এক কোণে পড়ে আছে এবং দেশের সরকার স্বাভাবিক কাজ-কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি, একটা আসন্ন আক্রমণের ভয়েও তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পরের দিন আর্মি চীফ, চট্টগ্রামে জেনারেল মঞ্জুরের উপর আরো চাপের সৃষ্টি করেন। প্রচুর পরিমাণে সৈন্য শুভপুর ব্রীজ অতিক্রম করে সরকার পক্ষে যোগদান করতে থাকলে, জেনারেল এরশাদ আত্মসমর্পণের সময়সীমা আরো কয়েক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেন। ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের পরিস্থিতির সাংঘাতিক অবনতি ঘটে।

মঞ্জুর শনিবারের পুরো বিকেল এবং রোববারের সকাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে তার প্রতি সমর্থনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। তিনি চট্টগ্রামে অবস্থিত সেনাবাহিনীর প্রতিটি ইউনিট পরিদর্শন করে বিভিন্ন রকম গালভরা বুলি ছড়িয়ে তাদের সমর্থন লাভের প্রাণপণ চেষ্টা চালান। কিন্তু ইতিমধ্যেই জেনারেল এরশাদের বেতার ভাষণ শুনে মঞ্জুরের প্রতি তাদের মোহমুক্তি ঘটে যায়। মঞ্জুর তা বুঝতে পেরে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে পদস্থ বেসামরিক অফিসার, ব্যাংক ম্যানেজার, সংবাদপত্রের সম্পাদক, বন্দর কমিশনার এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের এক বৈঠক আহবান করেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি দেড়ঘণ্টা ধরে বিপ্লব নিয়ে বক্তব্য রাখেন। পরে মঞ্জুর কুমিল্লাস্থ ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি, মেজর জেনারেল সামাদকে হাতে লিখে একটি চিঠি পাঠান। চিঠিতে তিনি গৃহযুদ্ধ এড়ানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করে দু-একটি ফাঁকা কথা বলার চেষ্টা করেন। এতে জেনারেল সামাদ অনুপ্রাণিত হতে না পেরে, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তার ঐ চিঠিটি ঢাকায় সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে জেনারেল মঞ্জুর উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের পরামর্শ গ্রহণের জন্যে তার অফিসে এক বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীর কমান্ডাণ্ট, ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ্ একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্যে ঢাকার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর পরামর্শ দেয়। উপস্থিত অধিকাংশ অফিসারই এ প্রস্তাবে রাজী হয়। কিন্তু মতি আর দেলোয়ার তা মানতে রাজী হয়নি। দেলোয়ার চিৎকার করে বলে উঠে ঃ কিসের আলাপ-আলোচনা ? চলুন ঢাকার দিকে মার্চ করে এগিয়ে যাই।

মঞ্জুর নিজেই ব্রিগেডিয়ারের পরামর্শে একমত পোষণ করেন এবং ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ্কেই সেনা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আলোচনা চালানোর কাজে নিয়োগ করেন। ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ্ নির্দেশমত মেজর জেনারেল নূর উদ্দিন খানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে জেনারেল মঞ্জুরের একটি বাণী পাঠ করে শুনায়।

দু'ঘণ্টা পরে হান্নান শাহ্ জেনারেল নূর উদ্দিনের সঙ্গে আবারো যোগাযোগ স্থাপন করে এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে মঞ্জুরের ৪ দফা দাবী পেশ করে। ঐ দাবীগুলো হচ্ছে ঃ (১) দেশে মার্শাল ল জারি করতে হবে; (২) প্রধান বিচারপতিকে দেশের প্রেসিডেন্ট

নিয়োগ করতে হবে; (৩) জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করতে হবে; (৪) বিপ্লবী পরিষদকে স্বীকৃতি দিতে হবে। মেজর জেনারেল নূর উদ্দিন খান অন্যদিক থেকে জানিয়ে ছিলেন যে, সরকার বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করতে রাজী নহেন। বিপ্লবী বিরোধী প্রচারণাও চলতে থাকবে বলে তিনি জানিয়ে দেন। লেঃ কর্নেল মতি এতে ক্ষেপে যায় এবং সরকারী সৈন্যের উপর গুলি চালাতে চেষ্টা করে। মঞ্জুর তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে বুঝিয়ে ঠান্ডা করেন।

মধ্যরাত পর্যন্ত টেলিফোনে আলোচনা চলতে থাকে। তখনও চীফ অব জেনারেল স্টাফ, মেজর জেনারেল নূর উদ্দিন খান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের জন্যে বিদ্রোহীদের উপর চাপ দিতে থাকেন।

পরিশেষে, রাত একটায় (সোমবার) মঞ্জুর ব্যক্তিগতভাবে জেনারেল নূর উদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। কথোপকথন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু এতে কি বেরিয়ে আসে, তা জানা না গেলেও টেলিফোনে আলাপরত অবস্থায় মঞ্জুরকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত দেখায়। তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে অফিসারদেরকে তাদের ব্রিগেডে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন। তারপর মেজর মোজাফফর আর রেজাকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহের নেতা তার গাড়ীতে ওঠেন এবং বাসার দিকে রওনা দেন। তিনি অচিরেই অফিসে ফিরে আসছেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কোনদিনও তার আর ফিরে আসা হয়নি। সোমবার ভোর দু'টার মধ্যে (জিয়া হত্যার ৩৬ ঘণ্টা পর) বিদ্রোহের অবসান ঘটে এবং বিদ্রোহীরা পালিয়ে যেতে শুরু করে।

১লা জুন, সোমবারে দলে দলে মঞ্জুরের সাথীরা চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালাতে শুরু করে। যাবার আগে মঞ্জুর মেজর খালিদকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমরা কি তোমার ভাবীকে সঙ্গে নিয়ে যাবো?' খালিদ কর্কশ স্বরে উত্তর দেয় ঃ 'আমরা তো আমাদের জীবন নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি মেয়েলোক আর ছেলেমেয়েরা আমাদের পলায়নের বাধার সৃষ্টি করবে।' কিন্তু মঞ্জুরের স্ত্রী তার সঙ্গে যেতে জেদ ধরলে সে তার বেগম, দুই ছেলে আর দুই মেয়ে এবং বেগম মঞ্জুরের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মিসেস দেলোয়ার আর তার তিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্জুর অজানার সন্ধানে ছুটে চলে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, পলায়নকারী দলের সঙ্গে লেঃ কর্নেল দেলোয়ার যোগদান করেনি।

তারা উত্তরদিকে গাড়ী চালিয়ে হাটহাজারী থেকে ফটিকছড়ির দিকে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ১১ জন অফিসার, দু'জন মহিলা আর ৭ জন ছেলেমেয়ে তাদের দলে যোগ দেয়। তিনটি জীপ আর একটি সামরিক পিকআপে করে তারা এগিয়ে চলে। পলায়নকারী অফিসাররা হচ্ছেন—জেনারেল মঞ্জুর, লেঃ কর্নেল মতি, মাহবুব, ফজলে, মেজর মোজাফফর, গিয়াস, রেজা, ইয়াজদানী,খালেদ, ক্যাপ্টেন মুনীর আর জামিল। মেজর রেজা, জেনারেল মঞ্জুরকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'স্যার আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

মঞ্জুর ঃ 'গুইমারায় অবস্থানরত ২১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে।' আসলে,মঞ্জুর কোনমতেই সেনাবাহিনীর ধারে-কাছেও যেতে চাচ্ছিলেন না। তিনি যাচ্ছিলেন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ডারের কাছে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা গাড়ী চালালেই ভারতের সীমান্তে পৌঁছা যেতো। ইতিমধ্যে অবশ্য ওরা পার্বত্য অঞ্চলের, গভীর জঙ্গলে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতেও পারতো। কিন্তু তা আর হলো না।

আগের গাড়ীতে করে জেনারেল মঞ্জুর ও অন্যান্যরা দ্রুত বেগে ফটিকছড়ি থেকে মানিকছড়ির দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। পরের গাড়ীতে ছিলো মতি আর মাহবুব। দুর্বাগ্যবশতঃ ওরা ১২ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নের একটি কলামের কাছে এসে পৌঁছায়। ঐটিতে মেজর মান্নান নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। ওরা তাদেরকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে, মেজর মান্নান তাদেরকে আটকে ফেলে। কথা বলাবলির এক পর্যায়ে কর্নেল মতি একটি স্টেনগান হাতে নিয়ে একেবারে কাছে থেকে মান্নানকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয়। মেজর মান্নান অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেও নায়েক সুবেদার শামছুল আলম সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ান পাল্টা গুলি চালিয়ে দিলে মতি ও মাহবুব সেখানে নিহত হয়। ক্যাপ্টেন মুনীর বন্দী হয় এবং মেজর মোজাফফর যেভাবেই হোক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে জেনারেল মঞ্জুর তাঁর গাড়ীর গতি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। মাইল দু'-এক যাবার পরই মঞ্জুর গাড়ী থেকে নেমে তার স্ত্রী ও সন্তানাদি, দেলোয়ারের স্ত্রী ও সন্তানাদি এবং মেজর গিয়াস আর রেজাকে সঙ্গে নিয়ে খামার উপজাতীয় এলাকার গ্রামের পথ ধরে পায়ে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকেন। প্রচন্ড খরা রোদের মধ্য দিয়ে সারা সকাল ও দুপুর পর্যন্ত তারা পায়ে হেঁটে চলতে থাকেন। মাঝেমধ্যে পানির জন্যে এবং একটুখানি বিশ্রামের জন্যে এখানে সেখানে তারা যাত্রা বিরতি করেন।

এশিয়া টি গার্ডেনে পৌঁছাতে বিকেল আড়াইটা বেজে যায়। তখন তারা অত্যন্ত ক্লান্ত এবং অবসন্ন। চা বাগানের এক কুলি, মনু মিঞার ঘরে মঞ্জুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। সকলেই তখন পেটের ক্ষুধায় অস্থির। ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্যে জেনারেলসহ সকলেই ঐ কুলির ঘরে সামান্য কিছু খেয়ে নিতে বসে পড়েন। কিন্তু বিধি তাদের বাম। খাওয়া আর হলো না। বাড়ীর চতুর্দিক সশস্ত্র পুলিশ ঘিরে ফেলে। মঞ্জুরের হাতে তখনো একটি এসএমজি ছিলো। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে যুদ্ধ ছাড়াই জেনারেল মঞ্জুর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

পুলিশ জেনারেলের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাকে ক্যাপ্টেন এমদাদের হাতে সোপর্দ করে। ক্যাপ্টেন এমদাদ মঞ্জুরের হাত, পা আর চোখ বেঁধে তাকে ধাক্কিয়ে নিয়ে তার জীপে

তুলে। সরকারী শ্বেতপত্রের মতে, ক্যাপ্টেন এমদাদ ভিআইপি হাউসের দিকে মঞ্জুরকে নিয়ে যাবার সময় একদল সশস্ত্র সৈন্য জেনারেলকে জোর করে গাড়ী থেকে নামিয়ে ফেলে এবং খুনী খুনী বলে চিৎকার করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের মধ্য থেকে একজনের মাত্র একটি গুলির আঘাতে জেনারেলের মাথায় এক বিরাট ছিদ্র হয়ে যায়। মঞ্জুরের দেহ হুমড়ি খেয়ে একটি ড্রেনে যেয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিহত হন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, জেনারেল মঞ্জুর আর তার ভাগ্নে কর্নেল মাহবুবরে লাশ কেউ দাবী করেনি। সৈনিকদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে চট্টগ্রামে ক্যান্টনমেন্ট কবরস্থানের দু'টি চিহ্নবিহীন কবরে সমাহিত করা হয়।

১লা জুন, সোমবার সকালের মধ্যেই বিদ্রোহের অবসান ঘটে। তারপর থেকেই বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্ট জিয়ার লাশ হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করে।

প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং তাঁর দুই সহকারী লেঃ কর্নেল আহসান আর ক্যাপ্টেন হাফিজের লাশ সার্কিট হাউস থেকে উঠিয়ে দু'দিন আগে মেজর মোজাফফ আর শওকত আলীর নেতৃত্বে কবর দেয়ার জন্যে নিয়ে যেতে দেখা যায়। চট্টগ্রাম থেকে ১৭ মাইল দূরে রাঙ্গুনিয়াস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আশপাশে কোথাও তাদের কবর দেয়া হয়েছে বলে আন্দাজ করা হয়। কারণ, লাশসহ আর্মির গাড়িগুলো কাপ্তাই রোড ধরে ওদিকেই যেতে দেখা গেছে।

৩০শে মে, দেড়টার দিকে লাশ তিনটি নিয়ে কলেজের এলাকা দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় মোহাম্মদ বশিরী নামে একজন ছাত্র দেখতে পায়। সেনাবাহিনীর গাড়ী যেতে দেখে তার সন্দেহ জাগে সে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন। পাশের একটি বাজার থেকে তিনজন দিনমজুর নিয়ে নিকটবর্তী পাথরঘাটা গ্রামের দিকে যেতে দেখে। গ্রামের কাছে ছোট পাহাড়ের নীচে মজুরদেরকে দিয়ে তারা একটি গর্ত খুঁড়তে শুরু করে। বশিরী কাছে গিয়ে ব্যাপারটি ভাল করে দেখতে চেষ্টা করলে, সৈন্যেরা তাকে সেখান থেকে দূরে তাড়িয়ে দেয়। বশিরী পাশের একটা পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সবকিছু অবলোকন করে।

বশিরীর মতে, কবর খুঁড়ে সৈন্যেরা তিনটি লাশ একত্রে গাদাগাদি করে কবরের পাশে রাখে। তারপর নিহতদের জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্যে পাশের এক দরগা থেকে একজন ইমাম ডেকে নিয়ে আসে। প্রচারিত নিয়ম-কানুন পালন না করেই লাশগুলোকে তড়িঘড়ি করে কবরস্থ করে তারা। বশিরী দু'দিন ধরে এ সত্যটি গোপন রাখে। তারপর ১লা জুন যখন সে বিদ্রোহ দমনের খবর পায়, সে তখন দৌড়ে গিয়ে রাঙ্গুনিয়া পুলিশ স্টেশনে খবরটি জানিয়ে দেয়। বশিরী একজন সাব-ইন্সপেক্টর-এর নেতৃত্বে একদল পুলিশ নিয়ে সেখানে যায়। এবং কবর খুঁড়তে শুরু করে। তারা কবর খুঁড়ে

আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে, মাত্র একটি সাদা বিছানার চাদরে মোড়া তিনটি লাশ কবরে পড়ে আছে। তাদেরই একজন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান।

এর মধ্যেই মিলিটারী অফিসাররা সেখানে পৌঁছে যায়। তারা লাশগুলাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, চট্টগ্রামে পাঠানোর বন্দোবস্ত করে।

জিয়ার লাশ ঢাকায় পাঠানোর জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়। জিয়ার লাশের উপর ফর্মালিন, ইউক্যালিপটাশ, সিডার অয়েল আর আতর ঢালা হয়। তারপর কফিনের ভেতর তাজা চা পাতা দিয়ে লাশটি এর মধ্যে ঢুকানো হয়। জাতীয় পতাকা দিয়ে কফিনটি একটি হেলিকপ্টারে উঠিয়ে দেয়। কিন্তু ঝড়ো হাওয়ার জন্যে ফেনী থেকে হেলিকপ্টারটি ফিরে চট্টগ্রামে চলে আসে। তারপর বিমান বাহিনীর একটি পরিবহন বিমানে করে লাশটি ঢাকায় পাঠানো হয়। পরের দিন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জিয়ার লাশ চির শয়নে শায়িত করা হয়। সেদিন তার শেষকৃত্যে দশ লক্ষাধিক লোক শরীক হয়।

মরণকালে জিয়া তার স্ত্রী এবং দু'টি অল্প বয়সের ছেলে রেখে যান। জিয়া তাঁর সারাজীবনে কোনদিনও অসদুপায়ে টাকা-কড়ি বানানোর চিন্তা করেননি। কাজেই, তাঁর অকাল মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী ও দু'টি ছোট ছেলে আর্থিক অনটনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। এই দিকগুলো চিন্তা করে ১৯৮১ সালের ১২ই জুন, এক মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে বিচারপতি সাত্তারের সরকার নিহত প্রেসিডেন্টের বিধবা স্ত্রী, খালেদা জিয়া এবং তাঁর পরিবারকে নিম্নে প্রদত্ত আর্থিক ও বৈষয়িক সুবিধাদি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেন ঃ

১। জরুরী ভিত্তিতে ১০ লক্ষ টাকার নগদ মঞ্জুরী।

২। এক টাকা নাম মাত্র মূল্যে ঢাকার অভিজাত এলাকায় একটি বিরাট আধুনিক বাংলো পূর্ণ মালিকানাসহ বরাদ্দ।

৩। ২৫ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দু'টি ছেলের দেশের ভেতরে এবং বাইরে লেখাপড়ার সকল খরচ সরকার বহন করবেন। এইসময়ে অবশ্য তারা মাসিক মাথাপিছু ১৫০০ টাকা করে ভাতা পেতে থাকবে।

৪। সরকার বেগম খালেদা জিয়া এবং তার পরিবারের সদস্যদের দেশের ভেতরে এবং বাইরে সকল প্রকার চিকিৎসার পূর্ণ খরচ বহন করবেন।

৫। সরকার তাদের ব্যবহারের জন্যে একটি গাড়ী দেবেন এবং ঐ গাড়ীর জন্যে প্রয়োজনীয় একজন ড্রাইভার প্রদান করবেন এবং সমুদয় পেট্রোল খরচ বহন করবেন।

৬। তাদেরকে সরকার একটি টেলিফোন প্রদান করবেন, যার খরচ তাদেরকে বহন করতে হবে না।

৭। খালেদা জিয়ার বাড়ীতে গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং পানি খরচ সরকার বহন করবেন। তার বাড়ীতে গার্ড প্রদানের ব্যবস্থাও সরকার গ্রহণ করবেন।

৮। খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত সেক্রেটারী এবং পাঁচজন গৃহভৃত্যের খরচ সরকার বহন করবেন।

সে যাই হোক সন্দেহ, শৃঙ্খলহীনতা বা খারাপ অফিসার এই ধরনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে অন্ততঃ ৬০ জন সিনিয়র আর্মি অফিসারকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। পূর্বের নজিরকে উপেক্ষা করে জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সকল অফিসারকে বিচারের সম্মুখীন করেন। ঐ রকম ৩০ জন অফিসারকে সামরিক আদালতে বিচার করা হয়। মেজর জেনারেল আব্দুর রহমান এবং আরো ৬ জন সিনিয়র অফিসার ঐ কোর্ট মার্শাল পরিচালনা করেন। এতে ১৩ জনকে ফাঁসি, ৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড, ৬ জনকে সাত থেকে দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ৪ জনকে সসম্মানে খালাস দেয়া হয়।

এরপরে জিয়া হত্যার উপর বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া যায় ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, ঐ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। এর পেছনে কিছু কারণ থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবে, এ রিপোর্ট প্রকাশিত না হবার কারণে বেশ কিছু সন্দেহজনক গুজব বাতাসে উড়ে বেড়াতে সক্ষম হয়। আর ঐসব গুজব ক্ষমতার সিঁড়িতে সম্ভাব্য নির্দোষ প্রতিযোগিদের সুখ্যাতিকে ম্লান করতে পেরেছিলো, এতে কোন সন্দেহ নেই। সব কথার পরেও আর একটা কথা থেকে যায়—তা হচ্ছে, দুরভিসন্ধির কথা। দুরভিসন্ধি আর হত্যা বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসছে। এক হত্যা আর এক হত্যাকে ত্বরান্বিত করেছে—দেশটাকে আবদ্ধ করেছে এক রক্তের ঋণে।

মুক্তি সংগ্রামের শুরু এবং তার আগে থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে অ্যান্থনী মাসকারেণহাসের নিবিড় যোগাযোগ। পাকিস্তানে বসবাসকারী দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাংবাদিক হিসাবে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দীন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ দেশের অন্যান্য প্রতিটি উল্লেখযোগ্য নেতার সঙ্গেই ছিল তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ১৯৭১ সালে অ্যান্থনী মাসকারেণহাসই প্রথম সাংবাদিক যিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে গিয়ে লন্ডনের দি সানডে টাইমস পত্রিকায় তখনকার বাংলাদেশ ভূখণ্ডে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নির্মম স্বজন হত্যার কাহিনী সবিস্তারে লিখে বিশ্ব জনমতের সামনে তুলে ধরে। তার সেই নিবন্ধ এবং পরবর্তী রচনাগ্রন্থ দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী শুধু তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেনি, ব্যাপক স্বীকৃতিও লাভ করেছিল। এমন কি পাকিস্তানেও। যার ফলে বাংলাদেশের অনুকূলে আর্ন্তজাতিক/ বিশ্ব জনমতের জোয়ার ঘোরাতেও সাহায্য করেছিল। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্বজন হত্যার সত্যনিষ্ঠ প্রতিবেদনের জন্য অ্যান্থনী মাসকারেণহাসগ্রানাডা টিভি সংস্থার জেরাল্ড বেরি পুরস্কার এবং ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং কোম্পানীর বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। লন্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকায় সুদীর্ঘ ১৪ বছর সক্রিয় কর্মজীবনের শেষে বর্তমানে তিনি ফ্রি ল্যান্স লেখক হিসাবে কাজ করছেন

অ্যান্থনী মাসকারেণহাস বাংলাদেশের মানুষদের জন্য অসীম ভালবাসা এবং গভীর অর্ন্তদৃষ্টি সহকারে একটা বিশেষ কর্তৃত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে লেখেন। সুপ্রতিষ্ঠিত কর্মজীবন, ঘরবাড়ী, স্ত্রী, পাঁচ ছেলেমেয়ে এমন কি নিজের সোনালী ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বজন হত্যা বিষয়ে প্রকৃত সত্যকে উদঘাটন করার জন্য। আর এই কারণেই এই বইয়ে গভীর দুঃখের সঙ্গে লেখা হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। অ্যান্থনী মাসকারেণহাসের আত্মকথন-যিনি আমাদের প্রতিটি বাঙ্গালীর সঙ্গেই আমাদের সাধের সোনার বাংলার স্বপ্নভঙ্গের একজন অংশীদার। ১৯৯৬সালের ৬ই ডিসেম্বর অ্যান্থনী মাসকারেণহাস হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লন্ডনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।